এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ এর উপস্থাপিত বিষয়

১৯৯১ সালের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাঃ দায়িত্বশীল সরকার হিসাবে এর ভূমিকা ও কার্যাবলীর মূল্যায়ন ।

গবেষক

কাজী খালেদা ইয়াসমীন

400108

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. এম. নজরুল ইসলাম

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
400108

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ

২০০১

M.

M.Phil.

GIFT

400168

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ সালের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাঃ দায়িত্বশীল সরকার হিসাবে এর ভূমিকা ও কার্যাবলীর মূল্যায়ন ।

কাজী খালেদা ইয়াসমীন

400168

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০১

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

ছেলে ও মেয়ে
কাজী অণিকা শর্মিলা
কাজী তানভীর আহমেদ গালিবকে

400108

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "১৯৯১ সালের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাঃ দায়িত্বশীলসরকার হিসাবে এর ভূমিকা ও কার্যাবলীর মূল্যায়ন" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম । আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি । এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি ।

৩১ মে, ২০০৯

ঢাকা

কাজী খালেদা ইয়াসমীন

এম. ফিল. গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

থিসিস্ টি সম্পন্ন করতে যিনি সার্বিক সহযোগীতা দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ডঃ নজরুল ইসলাম। এছাড়া পি.এইচ.ডি. গবেষক অরুন কুমার গোস্বামী আমাকে এই কাজে আন্তরিক ভাবে সহযোগীতা করেছেন। শ্রদ্ধেয় বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় শিক্ষক মন্ডলী বিভিন্ন সময় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে অনুপ্রানীত করেছেন।

যাদের সহযোগীতায় ও অনুপ্রেরনায় আমার থিসিসের কাজ সম্পন্ন হয়েছে তাদের সকলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাজী খালেদা ইয়াসমীন

Dr. M. Nazrul Islam
B. A. (Hons.), M.A. (Dhaka), Ph. D. (Australia)
Professor

Dhaka University Institutional Repository

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH

Dated .....

Certificate of the Supervisor

With regard to the thesis entitled "১৯৯১ সালের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাঃ দায়িত্বশীল সরকার হিসাবে এর ভূমিকা ও কার্যবিলীর মূল্যায়ন" submitted by Kazi Khaleda Yasmin for the M.Phil degree in Political Science, at the University of Dhaka.

I certify that Khaleda Yasmin carried out the research work under my direct supervision and guidance and that the manuscript of the thesis has been scrutinised by me.

The entire thesis comprises the candidates own work and it is her own personal achievement. It has not previously formed the basis for the award of any degree, diploma or other similar title of recognition.

She has completed her research work to my satisfaction; and the final type copy of the thesis, which is being submitted of the University office, has been carefully read by me for its material and language and is to my entire satisfaction. The thesis is worthy of consideration for the award of M.Phil degree.

Islam

Dated, the 9th May 2001

Dr. M. Nazrul Islam.

Phone : (Off.) 9661900-59/4470 (Res.) 866718 Fax No. 880-2-865583 E-mail : duregstr @ bangla.net

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ সূচনা ১ - ১৪

১.১ গবেষনার যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য ১ - ৬
১.২ গবেষনা পদ্ধতি ৭
১.৩ সংশ্লিষ্ট ধারনা সমূহের সংজ্ঞা ৮ - ১৩
১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পটভূমি ১৫ - ২৮
২.১. সংসদীয় সরকারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (ব্রিটিশ আমল) ১৫-১৬
২.২ পাকিস্তান শাসনামলে সংসদীয় ব্যবস্থা(১৯৪৭-৭১) ১৭-১৯
২.৩ বাংলাদেশে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা (১৯৭২-৯০) ২০-২৮

তৃতীয় অধ্যায়ঃ সংসদীয় সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন (১৯৮২-৯০) ২৯-৪০

চতুর্থ অধ্যায়ঃ সংসদীয় সরকারের কার্যকারিতা(১৯৯১-৯৬) ৪১ - ৮৬
৪.১ অধিবেশন সমূহের আলোচনা ৪১-৬১
৪.২ কমিটি ব্যবস্থা ও কার্যক্রম ৬২-৬৯
৪.৩ জরীপের ফলাফল বিশ্লেষণ ৭০-৮৬

পঞ্চম অধ্যায়ঃ আর্থ সামাজিক চ্যালেঞ্জ ৮৭-১১২
৫.১ কৃষি ব্যবস্থা ৮৮-৯১
৫.২ শিল্প ব্যবস্থা ৯২-১০২
৫.৩ দারিদ্র দূরীকরণ ১০৩-১১০
৫.৪ শিক্ষা ব্যবস্থা ১১১-১১২

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ১১৩-১৮৫
৬.১ গোলাম আযম প্রসঙ্গ ১১৪-১১৮
৬.২ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ১১৯-১২৯
৬.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ ১৩০-১৩৯
৬.৪ আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ১৪০-১৫৭
৬.৫ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গঃ আন্দোলনের গতিধারা ও প্রকৃতি ১৫৮-১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়ঃ উপসংহার ১৮৬-২১৪

সার্বিক মূল্যায়ন ও সুপারিশসমূহ

গ্রন্থপঞ্জী ২১৫-২২২

তথ্য পঞ্জী । ২২৩-২২৬

পরিশিষ্ট-১ দ্বাদশ সংশোধনীর পূর্ণ বিবরণ i-xiii

পরিশিষ্ট-২ ত্রয়োদশ সংশোধনীর পূর্ণ বিবরণ xiv-xx

Dhaka University Institutional Repository

সূচনা

১.১ গবেষণার যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য ঃ-

গনতন্ত্র ও বাঙ্গালীর আন্দোলন শব্দ দুটি একই মুদ্রার এপিট ওপিট । বাঙ্গালীর প্রতিটি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে, গনতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গনঅভ্যুত্থান, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এবং সর্বশেষ ৯০এর গনঅভ্যুত্থানের অন্যতম আদর্শিক ভিত্তি ছিল গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা । এই গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান স্বরূপ হলো সংসদীয় ব্যবস্থা যার প্রতি বাংলাদেশীদের দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে সর্বদাই । বিশেষজ্ঞদের মতে সংসদীয় সরকারের প্রতি দুর্বলতার প্রধান দুটি কারণ হলোঃ (১) সংসদীয় ব্যবস্থা সরকারের স্বৈরাচারী প্রবনতা রোধ করবে (২) সংসদীয় ব্যবস্থা সামরিক শাসন প্রতিহত করবে । রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থায় বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান হওয়ায় জনমনে উক্ত ধারনার সৃষ্টি হয়েছে যে সংসদীয় ব্যবস্থার সাথে যেহেতু দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার সম্পর্ক আছে সেহেতু এই ব্যবস্থায় কোন স্বৈরাচারের আবির্ভাব সম্ভব নয় । তবে বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বলা যায় সংসদীয় ব্যবস্থা এখানে আজও কার্যকারিতার দিক থেকে দায়িত্বশীল সরকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি । ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মাত্র দু' বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান নায়ক শেখ মুজিব নিজেই সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতিক সরকারের নামে প্রবর্তন করেন দায়িত্বহীন একদলীয় শাসন ব্যবস্থা । তারপরও যদি কেউ বলেন, সংসদীয় ব্যবস্থা স্বৈরাচার রোধ করবে, তাহলে সে বক্তব্য আবেগের, জেদের, যুক্তিভিত্তিক বা তথ্যভিত্তিক নয় । কেউ কেউ বলেন বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে সামরিক অভ্যুত্থানের পথ রুদ্ধ হবে । এ বক্তব্যও তথ্য নির্ভর নয় । সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল সরকারের বিশেষ রূপের উপর নির্ভরশীল নয় । নির্ভরশীল নয় সংবিধানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর । সামরিক অভ্যুত্থানের রয়েছে সুনির্দিষ্ট কারণ ।[১]

১. এমাজউদ্দিন আহমেদ , "বাংলাদেশে গনতান্ত্রিক সরকারের স্বরূপ", গনতন্ত্র, সম্পাদনা, মোজাফফর আহমদ, প্রকাশক, আহমেদ মাহমুদুল হক, মওলা ব্রাদার্স ,৩৯ বাংলা বাজার, ঢাকা-১০০০, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

দেশ স্বাধীন হয়েছে আজকে ৩০ বছর হলো। এই দীর্ঘ সময় পরিক্রমায় বাংলাদেশ একটি গনতান্ত্রিক ও উন্নত রাষ্ট্রের মডেল হিসেবে বিশ্বে স্থান করে নিতে পারেনি। কারণ জাতি ও রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া এখানে ক্রিয়াশীল থাকলেও এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি, বজায় থাকেনি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ। সরকার গঠিত হয়েছে, সেই সরকারের পরিবর্তন হয়ে আর এক সরকার এসেছে । এভাবে ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে মাত্র। শাসক শ্রেণীর পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, স্বৈরতান্ত্রিক সরকাবকে হটিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় এসেছে, আবার একই প্রক্রিয়ায় গনতান্ত্রিক সবকারকে হটিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার এসেছে। এই যে, গণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এর পার্থক্য কেবল শাব্দিক অর্থে, চরিত্রগত ভাবে সকল সরকারই সমান। সবাই মুৎসুদ্দি, বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে বলে, প্রেসিডেন্সিয়াল বা সংসদীয় যে ধরণেরই সরকার গঠিত হোক না কেন কোন আমলেই রাষ্ট্রের অবকাঠামোগত বা আমূল কোন পরিবর্তন হয়নি। উপরিকাঠামোগত কিছু উন্নয়ন দেখানো হয়েছে মাত্র। "যাই হোক বর্তমান প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেই এদেশে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকার কারন বাংলাদেশে যে শ্রেণী এখন ক্ষমতায় আছে তাদের পক্ষে স্বৈরতন্ত্র ছাড়া নিজেদের অবস্থান ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব না- সে স্বৈরতন্ত্র প্রেসিডেন্সিয়াল অথবা সংসদীয় যে পদ্ধতির মাধ্যমেই কার্যকার থাকুক ।[২]

২. বদরুদ্দিন উমর, বাংলাদেশে গনতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র, প্রকাশক-আহমেদুল মাহমুদুল হক, মওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ১৯৯৪ পৃষ্ঠা-১২।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ১ম সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায (৭২-৭৫) কোন শক্তিশালী বিরোধী দল ছিল না বিধায় সংসদে সরকারী দলের সিদ্ধান্তকেই প্রাধান্য দেওয়া হতো । মাত্র ২ বৎসরের মাথায় এই সরকার ব্যবস্থার পতন হয় । এর প্রত্যক্ষ কারন হিসাবে কাজ করেছিল ১৯৭৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী আঃলীগ সরকার কতৃকদ্ধারীকৃত চতুর্থ সংশোধনী । এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর উক্তি প্রনিধান যোগ্য। "The amendment which charged the pattern of the government from a parliamentary to presidential system was the constitutional (Fourth Amendment) Act 1975. It took less then 30 minutes to get the Fourth Amendment bill passed by the members of parliament. The Fourth Amendment of the constitution not only altered the government but also brought about drastic changes in the political process of the country."৩

৩. Dr. Nazrul Islam, Parliamentary Democracy in Bangladesh: An Assessment, *Perspective in Social Science review*. Volume - 5, 1998 October , P-5

Dhaka University Institutional Repository

এই চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় ব্যবস্থার বাতিল করে একদলীয় ব্যবস্থা বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ প্রতিষ্ঠা করা হয় (বাকশাল)। এছাড়া নাগরিকের মৌলিক অধিকার, মত প্রকাশ প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। এভাবে ১৯৭২ সালের সংবিধান এবং ৭৩ সালের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সংসদীয় পদ্ধতির আওতায় একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও মেয়াদ পূর্তির আগেই এর বিলুপ্তি হয়।

১ম সংসদীয় সরকার সমাপ্তির পর দীর্ঘ ১৬ বৎসর এখানে সংসদীয় সরকারের কোন অস্তিত্ব ছিলনা। এই সময় সামরিক শাসন এবং প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির নামে স্বৈরতন্ত্র ক্রিয়াশীল ছিল। ১৯৯০ এর ৪ ঠা ডিসেম্বর গনঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতন হলে ১৯৯১ এর ৫ই এপ্রিল পুনরায় সংসদীয় সরকার যাত্রা শুরু করে এবং ১৯৯৫ এর ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকে । এই সময় কালে ২২ টি অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল ১০০টি। এদিক দিয়ে ৫ম সংসদ , ১ম সংসদ এর তুলনায় পরিমানগত দিক থেকে সফল ছিল। তবে ১৯৯৪ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর ১৪৭ জন বিরোধী সদস্যদের পদত্যাগে সংসদ ভেঙ্গে না গেলেও কার্যত বৈধ্যতা ছিল না বলে বিজ্ঞজনরা মন্তব্য করেন। তাই বলা যায় যে ২য় সংসদীয় সরকারের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে ১৯৯৬তে , তথাপি বিরোধীদের পদত্যাগের পর থেকেই ৫ম সংসদের সমাপ্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১ম সংসদীয় সরকারের ব্যর্থতার পিছনে যে কারণ গুলি বিদ্যমান ছিল ২য় সংসদীয় সরকারের ক্ষেত্রে সেই কারণ গুলি ক্রিয়াশীল ছিল না বরং ভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল উভয় ক্ষেত্রেই। ১ম সংসদীয় সরকার গঠিত হয় স্বতস্ফুর্ত ভাবে । এখানে বিতর্কের কোন অবকাশ ছিলনা। কিন্তু এর পরিনতি ছিল করুণ । অন্যদিকে ২য় সংসদীয় সরকার গঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে । এই সংসদ ১ম সংসদের তুলনায় ভালভাবে কাজ করলেও জনগনের প্রশ্যাশিত আকাংখা পূরনে ব্যর্থ হয় । ২য় সংসদীয় সরকারের করুণ পরিনতি না হলেও যতদিন কার্যকর ছিল ততদিন হরতাল অবরোধ ভাংচুর প্রভৃতির মাধ্যমে এক অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছিল।। উভয় সরকারই সংসদীয় সরকারের মডেল অনুযায়ী কাজ করতে পারে নাই।

Dhaka University Institutional Repository

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত সংসদীয় সরকারের মডেলে পরিনত হয়েছে, যেখান থেকে এদেশের রাজনীতিবিদের অনেক কিছু শিক্ষনীয় আছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, সেখানে বর্তমানে সংসদীয় সরকারের ভিত নড়বড়ে । কারণ ঘন ঘন সরকারের পরিবর্তনে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে। কংগ্রেস শাসনামলের পর থেকেই এটি শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ভাষা ও কৃষ্টি সংস্কৃতির দেশ ভারতে সর্বভারতীয় ইমেজ , সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দলের অভাব এবং অনেক গুলি শক্তিশালী আঞ্চলিক দলের আত্মপ্রকাশে কোয়ালিশন সরকার ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। কিন্তু এদের দৃঢ় রাজনৈতিক ভিত না থাকায় দীর্ঘ স্থায়ী হতে পারছে না। আবার এর ভালদিক এটি যে সরকার যখন আস্থা ভোটে পরাজিত হয়েছে তখনই ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে । অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত এখানে গুরুত্ব পেয়েছে এবং রাজনীতিকে সংসদীয় ফ্রেমে ধারণ করা হয়েছে। সরকারী ও বিরোধী উভয় দলের মধ্যে আছে ভাল সমঝোতা, বোঝাপরা এবং মতামতের প্রতি সহনশীলতা । তাদের কাছে ক্ষমতা বা দল নয় বরং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নই হলো সকলের উর্ধে।

আন্দোলনের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকছে না কেন বা গনতন্ত্র আজও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারেনি কেন এটি একটি বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে যদি একটি গনতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে সরকার অগনতান্ত্রিক হতে পারে না । কিন্তু তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক নয় বলে মনে হয় এই কারনে যে বাংলাদেশের ১ম তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে পুনরায় বহু কাংখিত সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় । এই সরকার কতটুকু গনতান্ত্রিক বা প্রতিনিধিত্বশীল হয়ে উঠতে পেরেছিল সেটি বিশ্লেষনের মাধ্যমেই বেড়িয়ে আসবে।

Dhaka University Institutional Repository

এই সরকারের উপর গবেষনা করা জরুরী হয়ে পড়ে এ কারণে যে এটি ছিল দীর্ঘ ১৬ বৎসর পর একটি সফল অভ্যুথানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচিত সরকার।

উপরোক্ত বিবরের প্রেক্ষিতে এই গবেষনার উদ্দেশ্য গুলি হলো:-

(১) ১৯৯১ -৯৬সালে সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রত্যার্বতনের প্রেক্ষাপট আলোচনা।

(২) ১৯৯১-৯৬ সালে সংসদীয় সরকারের কার্যক্রম পর্যালোচনা।

Dhaka University Institutional Repository

১.২। গবেষনার পদ্ধতি

গবেষনার বিষয়টি যথাযথ ভাবে বিশ্লেষনের জন্য বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস সমূহ থেকে তথ্য ও উপাত্ত সমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে । মাধ্যমিক উৎস সমূহের মধ্যে আছে বিভিন্ন গবেষকের গবেষনা কর্ম, ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্ত সমূহ । প্রাথমিক উৎস হিসাবে একটি জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়েছে। ক্ষেত্র পর্যায়ের লক্ষ্য ও নমুনা জনগোষ্ঠি ছিলেন ছাত্র, শিক্ষিক ও বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণীর ১০০ জন মানুষ। এদের মতামত জরিপের জন্য প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছিল। * প্রশ্নমালা অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত সমূহ সমন্বিত করা হয়েছে এবং তা প্রয়োজনী স্থানে যথাযথ ভাবে সংযোজিত করা হয়েছে ।

* প্রশ্নমালা এ্যাপেনডিকস- ১ এ সংযোজিত করা হলো ।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ সংশ্লিষ্ট ধারণা সমূহের সংজ্ঞা

বিশ্বে সমাজতন্ত্র যখন বিলীন হতে চলেছে এবং রাজতন্ত্র বিলীন হয়ে গেছে তখন প্রতিটি রাষ্ট্রই আকৃষ্ট হচ্ছে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি । গনতন্ত্রের জন্য আন্দোলন হয়নি এমন রাষ্ট্রের সংখ্যা খুবই কম। "গনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যত লংঘন করতে গেলে পশ্চিমা দেশগুলি সাহায্য বন্ধ করে নানা রকম হুমকি দেয় এবং প্রয়োজনে সৈন্য পাঠাতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

কমিউনিজমের পতনের আগে পশ্চিমা দেশগুলো যে ভাবে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতো এখন তার বদলে গনতান্ত্রিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে তাদের অনুসৃত সমাজ ব্যবস্থাটি টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় তৎপর রয়েছে"।[৪] গনতন্ত্র মূলত মধ্যবিত্তের দ্বারা উদ্ভাবিত একটি শাসন ব্যবস্থা । ইউরোপের শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে প্রভাবশালী রাজতন্ত্রের অবসান হলে সেখানকার মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রমাগত সামাজিক আন্দোলনে ধীরে ধীরে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজের চালিকা শক্তি হয়ে দাড়ায়। "Democracy is not a form of government, democracy is a way of life.... Democracy grows into its being".[৫] "Democracy is that form of government in which the mass of the population possess the right to share in the exercise of sovereign power. It emphasizes the ideas of rule by the majority and of law as conforming to general public opinion. It has confidence in the capacity of the people to govern themselves and bases authority on the concept of the governed" [৬]

৪. আহম্মদ হুদা , বাংলাদেশে গনতান্ত্রিক সেচ্ছাচার, গনতন্ত্র, সম্পাদনা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর,১৯৯৮, পৃষ্ঠা - ১০৬।
৫. R.M. Maciver - *The Mordern Stat*, London Oxford University Press. 1964, Page-399
৬ R.G. Gettle - *Political Science*, World Press Calcutta. 1950, Page 199.

Dhaka University Institutional Repository

উন্নত দেশগুলিতে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত আর উন্নয়নশীল বিশ্বে গনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আজও সেখানে আন্দোলন চলছে। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক গবেষনা সংস্থা freedom house ১৯৯০ সালের রির্পোটে প্রকাশ করেছে যে ১৭৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৬১টি গনতান্ত্রিক এবং এর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধির দিকে । জবাবদিহি মূলক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা জনগনের মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সহ সকল মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে যার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হতে পারে দু রকম (১) জনগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির শাসন, (২) জনগনের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সার্বভৌম সংসদের নিকট জবাবদিহিকারী সংসদীয় বা মন্ত্রি পরিষদ শাসিত সরকার । উভয় ব্যবস্থাতেই জবাবদিহিমূলক সরকার কার্যকর রয়েছে । তবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ও গনতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকী করনের জন্য সংসদীয় ব্যবস্থা বেশী কার্যকর । যার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলোতে এই ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকরী ও গনমুখী । এই ব্যবস্থায় সংসদ বা আইনসভা সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু । এখানে জনপ্রতিনিধিরা তাদের সকল কর্মকান্ডের জন্য দায়ী থাকে বলে স্বেচ্ছাচারিতার কোন অবকাশ থাকে না, It is a form of constitutional democracy in which executive authority emerges from and is responsible to, legislative authority.[৭]

সরকারী নীতি ও শাসন পরিচালনায় আইনসভা বা পার্লামেন্টের কাছে নির্বাহী বিভাগের এই দায়িত্বশীলতা সংসদীয় ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এর জন্যই এই সরকারকে দায়িত্বশীল সরকারও বলা হয়ে থাকে । অর্থাৎ সরকারের দায়িত্ব শীলতা অধিকতর নিশ্চিত করাই সংসদীয় পদ্ধতির লক্ষ্য। এ পদ্ধতিতে সরকারের দৈনন্দিন কাজ কর্ম পরিচালনায় সংসদ কেবল যে খবরদারি করে, তাই নয় বরং সংসদের আস্থা-অনাস্থার উপর সরকারের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। সংসদীয় গনতন্ত্র নিজেই কোন লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হাসিলের উপায় বা মাধ্যম বিশেষ । লক্ষ্য হলো সরকারের দায়িত্বশীলতা বা দায় বদ্ধতা সুনিশ্চিত করণ।[৮]

৭ Leon D - Epstein - Parliamentary Governmet In David L Sills,Ed. *International Encyclopedia Of Social Science*, New York, Macmillan & Free Press, 1968, Page - 419.

৮. মাহবুবুর রহমান, " *সংসদীয় গনতন্ত্র ও সরকারের দায়িত্বশীলতা*" *গনতন্ত্র*, সম্পাদনা, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, প্রকাশক-আবদেদুল হক, মওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

Anthony H. Birch দায়িত্বশীল সরকার বলতে তিনটি বৈশিষ্ট্যকে বুঝিয়েছেন (১) সরকার দায়িত্ব হীন ভাবে কাজ করেনা (২) সরকার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে অনুসরণ করবে এবং (৩) সরকার তার কাজ কর্মের জন্য সংসদের কাছে দায়িত্বশীল থাকবে।[৯] উক্ত সংজ্ঞা থেকে কয়েকটি বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায় -

প্রথমত ঃ সরকার শাসিতের অর্থাৎ জনগনের নানাবিধ ন্যায় সঙ্গত দাবীদাওয়া এবং প্রয়োজন পূরনের ব্যাপারে থাকবে সংবেদনশীল "Government which are responsive follow as a matter of convention, the idea that they ought to listen to, and take note of the views of different groups with in society before devining and implementing policies."[১০]

দ্বিতীয়তঃ সরকার দায়িত্বহীন আচরণ ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকে। নৈতিক বাধ্যবাধকতার অনুভূতি কাজ করে সরকারের সমস্ত কাজের পিছনে । অর্থাৎ সরকারী ক্ষমতাকে পবিত্র আমানত হিসাবে গন্য করা হয়েছে । "It is the expectation that individualy who hold the trust of the people carry out their work wisely and with integrity"[১১]

তৃতীয়তঃ সরকারের প্রধান দায়িত্ব রাজনীতিকে সংসদীয় কার্যক্রমে পুরাপুরি ধারণ করা জাতীয় সর্বস্তরে নীতিনির্ধারণ, আলোচনা সমালোচনা এবং সকল দিক নির্দেশনা ও সমস্যার সমাধান আসতে হবে সংসদ থেকে, রাজপথ থেকে নয়। তবে শুধু মাত্র সরকারের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয় । এ জন্য প্রয়োজন বিরোধী দলের সার্বিক সহযোগিতা । কেননা এই ব্যবস্থায় সার্বিক রূপের প্রকাশ ঘটে সরকারী ও বিরোধী দলের সমন্বয়ে "The opposition is at once the alternative to the government and a focus to the diescontent of the people"[১২] সংসদীয় সরকারের মাতৃস্থানীয় দেশ বৃটেনে বিরোধী দলকে "His majesties opposition" বলা হয়। সরকারী দলের যেমন থাকে মন্ত্রি পরিষদ বা কেবিনেট, তেমনি বিরোধী দলের থাকে ছায়া কেবিনেট। একে বিকল্প সরকারও বলা হয় ।

৯. Anthony H. Birch , *The British System of Government* , Allen Unwin. London, 1986.

১০. Allan Ranwick and Lan Swinburn; *Basic Political Concepts*, Hufichin Son and Co, 1983, Page-96.

১১. Ibid, p-96

১২. Anthony H. Birch. Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থতঃ দলীয় ব্যবস্থার জন্য সরকার দায়িত্বহীন ভাবে কোন কাজ করতে পারে না । মন্ত্রি সভার বিরুদ্ধে আইন সভা অনাস্থা জ্ঞাপন করলে মন্ত্রিসভার তথা সরকারের পতন ঘটে । তাই মন্ত্রিরা দায়িত্বহীন ভাবে কোন কাজ করলে সমগ্র মন্ত্রিসভার পতন হবে। মন্ত্রিদের এই দায়িত্ব শীলতা কার্যকরী হয় দু ভাবে (১) ব্যক্তিগত দায়িত্ব (২) যৌথ দায়িত্ব । " The accountability of the government is said to be ensured by two constitutional conventions; the convention that ministers are responsible to parliament for the policy of the government as a whole and a convention that each minister is individually responsible to parliament for the work of his department". ১৩

(১) ব্যক্তিগত দায়িত্ব : মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রীরা ব্যক্তিগত ভাবে যে কোন একটি মন্ত্রনালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। এই ব্যক্তিগত কাজের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। যদিও অনেক সময় মন্ত্রনালয়ের কার্যক্রমের অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ভার স্থায়ী কর্মকর্তা বা আমলাদের উপর দেওয়া হয় তথাপি সংসদের নিজ বিভাগের সম্পাদিত কাজ কর্মের ভুলত্রুটির দায়দায়িত্ব মন্ত্রী সরকারী কর্মচারীদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে অব্যাহতি পেতে পারেন না । নিজস্ব বিভাগের কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিকেই দায়িত্বশীল থাকতে হয় । সংসদে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রিকেই দিতে হয়। এছাড়া নিজস্ব কর্মের জন্য মন্ত্রিকে আইনগত ভাবেও দায়িত্ব বহন করতে হয়।

(২) যৌথ দায়িত্ব: মন্ত্রি পরিষদের সকল মন্ত্রিই যখন যৌথ ভাবে সরকারের নীতি সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য আইন পরিষদের কাছে দায়ী থাকে তখন একে যৌথ দায়িত্ব বলা হয় ।সংসদীয় রীতি অনুযায়ী মন্ত্রিদের কেবিনেট বা মন্ত্রি সভার যে কোন সিদ্ধান্তের দায় দায়িত্ব বহন করতে হয় । সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময় মন্ত্রিদের মত পার্থক্য থাকতে পারে অথবা কোন সদস্য উপস্থিত নাও থাকতে পারে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার পর এজন্য সকলকেই সমভাবে দায়িত্বশীল থাকতে হয় । মন্ত্রিরা কোন অজুহাতেই এই দায়িত্ব থেকে নিস্কৃতি পেতে পারেন না। "The cabinets stands or fall together. Where the policy of particular minister is under attack , it is the government as a whole is being attack. thus the defeat of minister on any major issue represents a defeat of the government".১৪

১৩. Ivor Jenning, *Cabinet Government*, Combridge University Press, 1961, P-16.
১৪. Harvey and Bather, *The British Constitution*

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় ব্যবস্থায় শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য সংসদ বা আইনসভা কিছু পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। যেমন :

(১) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা: প্রশ্ন এবং অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে সাংসদগন মন্ত্রিদের কাছে সন্তোষ জনক বিবৃতি করতে পারেন । এই কাজটি সাধারণত বিরোধী দলের সদস্যরা করে থাকেন ।

(২) সংসদের সমালোচনা: সাংসদগন বক্তৃতা ও সমালোচনার মাধ্যমে অভিযোগ উথাপন করে মন্ত্রি সভাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারেন।

(৩) ছাটাই প্রস্তাব: আইন সভা সরকারী বিলের অর্থ মঞ্জুরীর কোন প্রস্তাবকে প্রত্যাখান বা তার পরিমানকে হ্রাস করতে পারে। এক্ষেত্রে আইন সভার সমর্থন না পেলে মন্ত্রি সভাকে পদত্যাগ করতে হয় নতুবা নির্বাচন দিতে হয়।

(৪) অনাস্থা প্রস্তাব: মন্ত্রিদের দায়িত্বশীলতা কার্যকর করার সবচেয়ে শক্তিশালী পদ্ধতি হলো অনাস্থা প্রস্তাব । মন্ত্রিসভার যে কোন সদস্য বা সমগ্র মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যায়। বিরোধী সদস্যরাই এই কাজটি করেন । অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

(৫) সংসদীয় কমিটির ভূমিকা: সংসদের আইন প্রনয়নের জন্য কমিটি ব্যবস্থা অপরিহার্য। এরা সরকারের কার্যবলী পালনে সহায়ক ভূমিকা পারন করে।

সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার জন্য উপরোক্ত পদ্ধতি গুলি তত্ত্বগত আলোচনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে। বাস্তবে আইন সভা মন্ত্রিসভার উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারেনা দলীয় কঠোরতার জন্য । সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোড়ে শাসন বিভাগ সংসদে যে কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সমর্থন আদায় করে নিতে পারে। কার্যক্ষেত্রে মন্ত্রি সভার সিদ্ধান্ত সংসদে প্রধান্য পায়। তবে সত্যিকারে জনপ্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থায় বিরোধী দলের গঠন মূলক সমালোচনায় , প্রশ্ন জিজ্ঞাসা প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে বাধ্য করে। এর ফলে সংসদীয় সরকার প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকারে পরিনত হয়।

সংসদীয় সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গুলি হলো (১) আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (২) প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা (৩) মানবাধিকার মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি (৪) প্রতিরোধক মূলক ব্যবস্থা এবং

Dhaka University Institutional Repository

(৫) পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব , তবে সংসদের সার্বভৌমত্ব, জনগনের সার্বভৌমত্বের উপর নির্ভরশীল, তা নাহলে প্রকৃত গনতন্ত্র হতে পারে না। লোকায়ত সার্বভৌমত্বই গনতন্ত্রের ভিত্তি ।১৫

সংসদীয় সরকরের উপরোক্ত সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষন করে যে মূল বিষয়টি পাওয়া যায় তা হলো এই সরকারই সত্যিকারের জনগনের সরকার। কারণ এই ব্যবস্থার সাথে জবাবদিহির প্রক্রিয়া ও দায়িত্বশীলতার বিষয়টির ওতপ্রোত ভাবে জড়িত । প্রতিটি মূহুর্ত সংসদ এই দায়বদ্ধতার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয় সাংসদগনকে , এখানে জনকল্যাণ বিরোধী কোন কাজ হতে পারবে না। শাসক দল ও বিরোধী দলকে সর্বদা এইবিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে ।

বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের সংসদীয় সরকার উপরোক্ত মানদন্ডের বিচারের কতটুকু লক্ষ্যের দিকে পৌছতে পেরেছে বা সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বশীল সরকারে ভূমিকা পালন করতে পেরেছে কিনা সেটিই এই গবেষনার মূল বিষয় বস্তু ।

১৫. হাসানুউজ্জামান , *নবপ্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার* , প্রকাশক, সৈয়দ করেজুল রহমান, অক্ষর , স্যার নিউ সার্কুলার রোড , ঢাকা - ১২১৭, ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গবেষনার সীমাবদ্ধতা

মূলত: এম ফিল অভিসন্দর্ভের জন্য এই গবেষনা পরিচালিত হয়। সংক্ষিপ্ত সময়, সীমিত আয়োজন, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, কারিগরি ও অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা গবেষনা কার্যক্রমকে প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত করে তোলে। এছাড়াও বিভিন্ন স্তরের মাত্র সতের জনের মধ্যে পরিচালিত নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে গৃহীত সাক্ষাৎকার দৃশ্যত: গবেষনার শিরোনাম" ১৯৯১ সালের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা: দায়িত্বশীল সরকার হিসাবে এর ভূমিকা ও কার্যাবলীর মূল্যায়নের" জন্য যথেষ্ট পরিমান প্রতিনিধিত্বশীল না হওয়াটাই স্বাভাবিক । যা হোক সাক্ষাৎকার দাতাগনের সাথে প্রশ্নমালার মাধ্যমে আহরিত মতামত নি:সন্দেহে দেশের বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়েছে, যা নির্দিষ্ট অধ্যায়ের মধ্যে পাওয়া যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়:পটভূমি

২.১ সংসদীয় সরকারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (বৃটিশ আমল)

সংসদীয় গনতন্ত্র এবং বাঙ্গালীর আন্দোলন শব্দ দুটি একই সূত্রে গাথা। যার জন্য সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বাঙ্গালীর রাজনৈতিক কৃষ্টির এক অপরিহার্য অংশে পরিনত হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর কালে দেশ সংসদীয় সরকার দিয়ে যাত্রা শুরু করে । কিন্তু এ ব্যবস্থা দীর্ঘ দিন টিকে থাকেনি বা বিকাশ লাভ করতে পারেনি । ১৯৭৫ সালেই এর পরিসমাপ্তি হয়। ১৯৭৫- ১৯৯০ এই দীর্ঘ ১৬ বছর রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা চালু ছিল। এর পর ১৯৯১ সালে সফল গনঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় এবং তারা একটি সুষ্ঠ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে । এই নির্বাচনের মাধ্যমেই দেশে পুনরায় সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় বিএনপি সরকারের নেতৃত্বে। বর্তমানে এই সরকার ব্যবস্থাই কার্যকর রয়েছে।

বাংলাদেশের জনগনকে এই সংসদীয় গনতন্ত্রের জন্য এভাবে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। করতে হয়েছে আন্দোলন । বাঙ্গালী সর্ব প্রথম সংসদীয় গনতন্ত্রের সাথে পরিচিতি লাভ করে বৃটিশ উপনিবেশ আমলে । এই শাষনামলে দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির সূত্রপাত হয় । উপমহাদেশের জনগনের প্রতিনিধিদের শাষন কার্যে অংশ গ্রহনের ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যে দিয়েই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই উদ্দেন্য বেশ কটিন সংস্কার মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় । যেমন (১) বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক আইন প্রনয়ন (২) প্রশাসনিক কাঠামো প্রনয়ন(৩) রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা (৪) বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা (৫) সংবাদ মাধ্যমে কাজের সূত্র পাত প্রভৃতি ছিল অন্যতম।

বৃটিশ ভারতে ১৭৭৩ সালের আগষ্ট মাসে সর্ব প্রথম ভারতে বৃটিশ কোম্পানী শাসন নিয়ন্ত্রন করার জন্য লর্ডনর্থর সময় বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক রেগুলেটিং এ্যাকট নিয়ামক আইন পাশ করা হয় । এই আইনের মাধ্যমেই ভারতের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ রচনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৩৩ সাল পর্যন্ত শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগ একত্রিত ছিল। ১৮৩৩ সালে চার্টার এ্যাকট কার্যকর হলে এই আইনের মাধ্যমে গর্ভনর জেনারেল পরিষদের শাসন সংক্রান্ত এবং আইন প্রনয়ন ব্যাপারে পরিষদকে সাহায্য করার জন্য একজন আইন সচিব নিযুক্ত করা হয় । ১৮৫৩ সালে চার্টার এ্যাকট দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং অপর একজন বিচারপতি , বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশ হতে দরজন প্রতিনিধি এবং গর্ভনর জেনারেল কর্তৃক আরও ছয় জন মনোনীত সরকারী সদস্য, মোট বার জন সরকারী সদস্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম আইন সভা গঠন করা হয় ।

ভারতের শাসনব্যবস্থা কে প্রতিনিধিত্ব মূলক করার জন্য ১৯০৯ সালের মর্লি মিন্টু সংস্কার আইনে নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় । এর পর ১৯১৯ সালের আইনে সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিতে দায়িত্বশীল সরকারের সূচনা করা হয় । এই আইনে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য ১৯৩৫ সালে আর একটি আইন পাশ করা হয়। এই আইনে একটি সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন কায়েম করা হয় । ভারত উপমহাদেশে এই ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের আইনে সীমিত ভাবে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু করা হয় । কিন্তু এই আইন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় গর্ভনর জেনারেল ও প্রাদেশিক গর্ভনরদের এত বিশেষ ক্ষমতা আইন অর্পন করে ছিল যে একে দায়িত্বশীল সরকার বলা যায় না। চূড়ান্ত ক্ষমতা ভাইসরয় এর হাতে ছিল বলে এটি ভাইসরিগ্যাল শাসন ব্যবস্থায় পরিনত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ পাকিস্তান শাসন আমলে সংসদীয় ব্যবস্থা (১৯৪৭-৭১)

১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট বৃটিশ শাসনের অবসান হলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে । বৃটিশ শাসনের ধারাবাহিকতা ক্রমে পাকিস্তানও সংসদীয় পদ্ধতির সরকার দিয়ে যাত্রা শুরু করে । ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত চার জন গর্ভনর এর অধীনে ৭টি মন্ত্রি পরিষদ ছিল । তথাপি সংসদীয় সরকারের নীতি গুলি যেমন আইন পরিষদের প্রাধান্য, প্রধানমন্ত্রীর সর্বোচ্চ ক্ষমতা, নামে মাত্র সরকার প্রধান প্রভৃতি থাকলেও বাস্তবে তা কাজ করতে পারে নাই কেন্দ্রীয় শাষনে গর্ভনরদের অহেতুক হস্তক্ষেপের জন্য ফলে পাকিস্তানের প্রথম দশকের সংসদীয় রাজনীতি ভাইসরিগ্যাল ব্যবস্থায় পরিনত হয় ।

"The administrative political poticies pursued during the first decade were centralized by extreme centralization, this led to the establishment of an administrative polical system which has seen termed viceregal" [১] প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী , পাকিস্তানের প্রথম গর্ভনরজেনারেল, জিন্নাহর নির্দেশেই চলতেন। তিনিই মন্ত্রিদের নিয়োগ ও পদোন্নতি দিতেন।" Jinnah not Liaqat was central to the formation of the cabinet, central to his life and central to his death ." [২]

জিন্নহর পর আরও তিনজন গর্ভনর জেনারেল আসেন। তারাও একই ভাবে শাসন ব্যবস্থায় চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। এভাবে পাকিস্তান সৃষ্টির দীর্ঘ নয় বৎসর অথাৎ ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে অস্থায়ী সংবিধান হিসাবে গৃহীত হওয়ায় একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ।

১. K.B. Syeed - *The Political System Of Pakistan*, Boston Houghton Miffin Co. 1967, Page - 12.

২. K.B.Syeed, *Pakistan: The Formative Phase*, 1957- 1948, London , Oxford University Press, 1968, P-207.

Dhaka University Institutional Repository

এর পর ১৯৫৬ সালের সংবিধানে কেন্দ্র ও পূর্ব বাংলায় প্রথম বারের মত সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয় । ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত অর্থাৎ মাত্র ২ বৎসর এই মন্ত্রিসভা বহাল থাকে। উক্ত তারিখে পাকিস্তানের শেষ গর্ভনর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক শাসন জারী করে সংবিধান বাতিল এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে সাংবিধানিক অগ্রগতির ধারাকে স্তব্ধ করে দেয়। একই সাথে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বিলুপ্তি ঘটে।

২৭ শে অক্টোবর সেনাবাহিনীর প্রধান আইয়ুব খান নিজে প্রেসিডেন্ট হয়ে ইস্কান্দার মীর্জাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন। সামরিক শাসনের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার বাতিল করা হলে যে দুবৎসর এ ব্যবস্থা স্থায়ী ছিল ততদিনও ঠিক মত কাজ করতে পারে নাই। পদে পদে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। এর প্রধান কারণ ছিল যোগ্য রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের অভাব । দলীয় কোন্দল, ক্ষমতারমোহ ছিল দলগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য, যেটি সংবিধান প্রনয়নের পরই দেখা যায়। আড়াই বৎসরে চার বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পরিবর্তন করা হয়। রাজনৈতিক দূর্বলতার সুযোগে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় আসে। "To say that parliamentary pattern of democracy failed in Pakistan would be too hasty a verict because the continuation was not given a fair trial..... It is the action of late Mr: Golam MD. and his successors more than anybody else which caused damaged to the parliamentary system and did not allow to function properly." [৩]

৩. Kumer Satish, Problems of Federal Politics in Pakistan: Pakistan society and Politics, *South Asian Studies Series*, 6 . Ed. By Pandab Nayak. New Delhi: South Asian Publishers Pvt Ltd. 1984. P – 26

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৮ থেকে ৬৯ পর্যন্ত এই দশ বৎসর সামরিক শাসন ও রাষ্ট্রপতির শাসন চালু থাকে। আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সরকারের নামে এক ব্যক্তির শাসন চালু করেন। এই স্বৈরাচারী সরকারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নির্যাতন ও কারাবরন করতে হয়েছে গনতান্ত্রিক সমাজ ও সংসদীয় সরকারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোরওয়ার্দী, ফজলুল হক ও শেখ মুজিব সহ তৎকালীন বহু নেতাও ছাত্র কর্মীকে ,এই আমলেই প্রনীত হয় শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক দয় দফা এবং ছাত্রদের এগার দফা দাবী এবং সংঘটিত হয় ৬৯ এর সফল গনঅভ্যুত্থান। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের একমাত্র সাধারণ নির্বাচনে আ:লীগ সহ পূর্ব বাংলার সকল দল সংসদীয় গনতান্ত্রের পক্ষে জোড়ালো দাবী তোলে এবং এই লক্ষ্যে তাদের নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালায়। এই নির্বাচনে আ:লীগ বিপুল ভোটে জয় লাভ করে। এভাবে দেখা যায় যে বাংগালীর প্রতিটি আন্দোলন যেমন ৫৪এর যুক্তফ্রন্ট, ৬৬ এর ৬ দফা, ৬৯ এর গনঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচন এবং ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় সংসদীয় সরকারের পক্ষে। আর এভাবেই সংসদীয় ব্যবস্থা বাংগালীর রাজনৈতিক কৃষ্টির অপরিহার্য অংশে পরিনত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ বাংলাদেশে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা (১৯৭২-৯০)

স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল আ:লীগ ও ক্যারিজমেটিক নেতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে । আর এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সত্যিকারের গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা । ১৯৭০ এর নির্বাচনে বিজিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আ: লীগ এর নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে ১৯৭১ এর ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের নিকটবর্তী (পরবর্তীতে মুজিবনগর রাখা হয় ।) স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকার গঠন করা হয় । শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম কে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয় ।১৯৭১ সালের ১০ ই জানুয়ারী শেখ মুজিব কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে আসেন এবং ১১ জানুয়ারী এক অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ জারী করেন সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য । ১২ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন ।

১৯৭০ সালে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গনপরিষদ গঠন করা হয় দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রনয়নের জন্য । উক্ত গনপরিষদ মাত্র ১ বৎসরের মাথায় (৪ঠা ডিসেম্বর) একটি সংবিধান রচনা করে যেটি পাকিস্তানে দীর্ঘ নয় বৎসরে প্রনয়ন করা সম্ভব হয়নি । ১৯৭২ এর ১৬ ডিসেম্বর থেকে এটি কার্যকর করা হয় ।"One of the great achievement of the AL regime in its first twelve months in power was the sussessful compleion of the task of constitution making ." [৪]

১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈধতাদান ও সংসদীয় সরকারকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি দেবার জন্য আ:লীগ এর নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । এতে আ:লীগ ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৯২ টি আসন পেয়ে সংসদে শক্তিশালী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে । তাই একে একদলের প্রাধান্যশীল সংসদীয় ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন বিশ্লেষকরা । কারণ এতে বিরোধী দল

৪. Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics Problems And Issues* , Dhaka University Press Ltd , 1980, P- 67 .

Dhaka University Institutional Repository

বলতে কেবল জাসদ ছিল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিল। এভাবে স্বাধীনতা উত্তরকালে সংসদীয় পদ্ধতির আওতায় একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা হলেও মেয়াদ পূর্তির আগেই এর সমাপ্তি হয় । এর পতনের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে কাজ করেছিল ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারী আঃ লীগ সরকার কর্তৃক আরীকৃত চতুর্থ সংশোধনী বিল। "The Fourth Amendment of the constitution not only altered the form of the government but also brought about drastic changes in the political processes of the country. It abandoned competetive party policies and introduced single party system named as Bangladesh Krishak Sramik Awami League, curbed, fundamantal rights of the citizens, controlled the freedom of the press and publications, and finally restricted the powers of the judiciary, the last remnant of a constitutional government. Under this amendment, Mujib became once again president, the most power ful figure in the country." [৫]

৫. Dr. Nazrul Islam ; *Parlimentary Democracy in Bangladesh, An Assessment*, Perspective in Social Science Review . Vol - 9, 1997, P-5

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ চতুর্থ সংশোধনী কেবল সরকার ব্যবস্থাই পরিবর্তন করেনি বরং এর মাধ্যমে একদলীয় কৃষক শ্রমিক আঃ লীগ (বাকশাল) গঠন করা হয় । নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়। মত প্রকাশ ও প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রন করা হয় এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। সংসদীয় সরকার ব্যর্থতার পরোক্ষ কারণ হিসাবে কাজ করেছিল (১) সুসংগঠিত বিরোধী দল গুলির অভাব (২)অনভিজ্ঞ সংসদ সদস্য (৩) বিরোধী দলগুলির চাপ (৪) অভ্যন্তরীন দলীয় চাপ, দলীয় সদসদের দূর্নীতিও স্বজন প্রীতি। অর্থনৈতিক সংকট আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি এবং মুজিবের ক্যারিজমা রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান গঠনে বাধা হয়ে দাড়ায়। "The leader was considered by his party faction as an institution in himself which did not help the process of routinization, instead it widened the division with in the party.[৬]

১৯৭২ -৭৫ সময় কালে বিদ্যমান রাজনৈতিক দল গুলির অধিকাংশ সংসদীয় গনতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল না। তৎকালীনবাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পর্টি ও ন্যাপ সংসদয়ি পদ্ধতির প্রতি সমর্থন জ্ঞপন করলেও তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, কিন্তু জাসদ ন্যাপ (ভাসানী) বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (লেনিনবাদী) বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি, শ্রমিক, কৃষক, সমাজবাদী দল প্রভৃতি প্রকাশ্য বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুতের কৌশল হিসাবে তারা নির্বাচন বা সংসদীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করে এবং একই সঙ্গে সহিংস আন্দোলনের পন্থা অনুসরন করে।[৭]

৬. Zillur Rahman, *Leadership Crisis in Bangladesh*, D U P L . Redcross Building, Matijhlle Commercial Area, 1982, P- 767.

৭. আবুলফজল হক, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের কিছু সমস্যা সম্ভবনা, *বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর*, সম্পাদনা , তারেক সামছুর রেহমান, মওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৩০

Dhaka University Institutional Repository

এর ফলে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয় । এ থেকে মুক্তি পাবার জন্যই শেখ মজিব সংসদীয় ব্যবস্থা বাতিল করে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা চালু করে এবং একে দ্বিতীয় বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেন।" Power which was means to an end with the nationalist elite before independence became an end in itself after independence. The elite rejected parliamentary democracy and turned to an alternative model which promised it to a longer stay in power." [৮].

১৯৭৫-৮১ শাসনামলঃ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে সেনাবাহিনীর কতিপয় অফিসার তারই মন্ত্রিসভার সদস্য খন্দকার মোশতাক দেশে সামরিক আইন জারী করেন। কিন্তু সংবিধান ও সংসদ বহাল রাখেন এবং ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সংসদীয় গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন।[৯]

৮. K. Ali – *Bangladesh A New Nation*

৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ অক্টোবর , ১৯৭৫

Dhaka University Institutional Repository

৩ রা নভেম্বর এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ ক্ষমতা দখল করে প্রধান বিচারপতি এস এম সায়েমকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন এবং সংসদ ভেঙ্গে দেন। তবে ৭ ই নভেম্বর আর এক পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় আসেন। বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতির পদে বহাল রাখেন । জিয়া ১৯৭৭ সালের ৩০শে নভেম্বর সায়েম এর স্থানে নিজে রাষ্ট্রপতি এবং একই সাথে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদে বহাল থাকেন। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে তিনি মিশ্র রাজনীতিক প্রক্রিয়া শুরু করেন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। "Zia was to be credited for reaching through the process of democratisation. He withdraw the Martiallaw, civilized the government set in motion a parliament, allows open political activities and become himself a civilian. The whole parapheralia was, however democratic inform but authoritarian in content." [৮] অর্থাৎ নিজে সামরিক ব্যক্তি হয়েও অবাধ রাজনীতির প্রক্রিয়া শুরু করেন রাজনীতিতে নিজেকে সিভিলাইজড করার জন্য। ১৯৭৭ সালে গণভোট করা হয় রাজনীতিতে নিজেকে বৈধ করার জন্য। ঐসময় রাজনৈতিক যে শূন্যতা বিরাজ করছিল সেটি দূর করার জন্য ১৯৭৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী জাগদল নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন, যদিও প্রথমে তিনি এতে অংশ গ্রহণ করেন নি। "JAGODOLS motto was Bangladeshi nationalism opposed to the Bengali nationalism upheld by the AL. JAGADOL also favoured a presidential form of Gouvernment. Though party activities remained indoors the formation of JAGODOL spurred oppositional political parties to organazational work" [৯]

---

[৮] Shamsul Huda Harun, *Bangladesh Voiting Behaviour, A Psephological Study 1973*, University press Ltd April 1986, P-82

[৯] Talukder Moniruzzaman, Bangladesh in 1977 - *Asian Survey* Vol. X VII, No-2 , February 1978

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহনের মধ্যে দিয়ে শেখ মুজিব কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার অবসান ঘটে। জিয়া ২য় প্রোক্লেমেশন আদেশ নম্বর ৪ এর মাধ্যমে চতুর্থ সংশোধনীতে পরিবর্তন আনেন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুনগত পরিবর্তন সূচিত হয়, প্রবর্তিত হয় বহুদলীয় ব্যবস্থার অধীনে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার । যদিও চতুর্থ সংশোধনীতে প্রবর্তিত নির্বাহী ও আইন বিভাগের মধ্যকার সম্পর্ককে পরিবর্তন করা হয় তথাপি বেশিরভাগ নির্বাহী ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা হয় । এভাবে পূর্বেকার আমলের ডিটেনশন, বিশেষ ক্ষমতা, জরুরী ক্ষমতা, ইত্যাদি বলবৎ থেকে যায়। রাষ্ট্রপতি একাধারে প্রধান নির্বাহী, সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং সংসদে ভাষনদান সহ সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকারী হন। জিয়ার রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থায় পার্লামেন্ট ও কেবিনেট-এর উপস্থিতি থাকলেও যৌথ দায়িত্বশীলতা ছিলনা। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এভাবে বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে একব্যক্তির রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগত কারণে BNP এর ঘোষণা পত্র গঠনতন্ত্র ও ঘোষিত নীতিমালায় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার অঙ্গীকার করে। জিয়া নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়েও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারাকে বাতিল করে রাজনীতিকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করেন এবং দক্ষিনপন্থিদের রাজনীতি করার সুযোগ করে দেন। যার জন্য '৭২ সালের সংবিধান পরিবর্তন করে বিসমিল্লাহ সংযুক্ত করেন। দলের ভিতর ডান-বাম মিশ্র ছিল বলে এবং কোন আদর্শের চেয়ে জিয়ার ইমেজের উপর গড়ে উঠায় দলের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বাধার সৃষ্টি হয়। জিয়া সামরিক ব্যক্তি হলেও তার ব্যক্তিগত ব্যবহারে ও আচার আচরণে মানুষ মুগ্ধ ছিল। যার জন্য তিনি মুজিবের মতো সম্পূর্ণ ক্যারিজমেটিক নেতা না হলেও আংশিক ক্যারিজমেটিক নেতায় পরিনত হয়েছিলেন। এটি ছিল BNP এর গণতান্ত্রয়নে প্রধান বাধা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের সংগ্রামকে দলের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়। বিএনপি সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা এবং প্রেসিডেন্ট জিয়ার ১৯দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে খালকাটা বিপ্লবের দ্বারা দেশকে স্বনির্ভরতার দিকে যাওয়া। "The 19th points program was not an ideological document, It was a pragmatic statement of the regimes committment to achieve certain socioeconomic objectives. It was also the basis of Zia's party platform." [১২]

৮১ সালে জিয়ার মৃত্যু হলে তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট হন। কিন্তু ৮২ সালে আরেক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতা হারালে পরস্পর বিরোধী স্বার্থ গ্রুপ গুলিকে ধরে রাখার জন্য একজন সর্বজন গৃহীত চেয়ার পার্সনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। দলের ভিতর জিয়ার ইমেজকে টিকিয়ে রাখার জন্য তার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর পর দেশের অন্য দলগুলির সংগে যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে থাকে।

এরশাদের শাসনামল (১৯৮১-৯০)ঃ ১৯৮১ সালের ৩০শে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে সেনাবাহিনীর একাংশের বিদ্রোহে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হলে দলের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার। পরবর্তীতে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হন।

কিন্তু ১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন সেনাপ্রধান এরশাদ, সাত্তার তথা বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। সারাদেশে সামরিক আইন জারী করে রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতার উপর বিধিনিষেধ জারী করা হয়। পরে ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং বিরোধীদলকে মোকাবিলার জন্য রাজনৈতিকদল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। এরজন্য রাজনৈতিকদলগুলির তৎপরতার উপর বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হয়। বিএনপির একাংশ, জাতীয় লীগ,

[১২] মোঃ সামসুল আলম, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের ক্রমবিকাশ,১৯৭২-৯৬, সম্পাদিত, আতাউর সামসুর রেহমান, বাংলাদেশ রাজনীতির পঁচিশ বছর, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা, ৭৩-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

ডেমোক্রেটিক লীগ, শামোয়াজ্জেম গ্রুপ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি(নাসের), ইউপিপি (কাজীজাফর), গনতান্ত্রিক পার্টি(জাহিদ) গ্রুপ এর সমন্বয়ে গঠিত জনদল পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টি নামে আত্মপ্রকাশ করে। [১৩]

এই দলের চেয়ারম্যান হন প্রেসিডেন্ট এরশাদ নিজেই। ক্ষমতা লিপ্সু ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে জাতীয় পার্টি। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও ভোট জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয় এবং রাষ্ট্রপতির প্রয়োজনে সংসদের ব্যবহারের অভিযোগ করা হয়েছে। জিয়ার উত্তরসূরী হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন শক্তিশালী এবং ক্ষমতাধর নির্বাহী বিভাগ। তার সময়ে দেশ আরও অরাজক পরিস্থিতি এবং একব্যক্তির শাসনাধীনে চলে যায়। "Ershad failed to conquer the minds of the people. So he followed the same path adopted by his predecessors Ayub Khan, Yahya Khan & General Ziaur Rahman. Ershad went one step ahead and decided to declare Islam as State Religion". [১৪]

13. M.A. Hakim, *Bangladesh Politics The Shahabuddin Interregnum*, UPL, Dhaka, 1993, Page-11.

[১৪] Sirajuddin Ahmed, *Sheikh Hasina Prime Minister Of Bangladesh*, Golam Mostafa, Hakkani Publishers, 1999, Page-132.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সংসদীয় সরকার পুণঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন (১৯৮২-৯০)

১৯৭৫ সালে সংসদীয় সরকার বাতিল হবার পর দীর্ঘ ১৬ বছর অর্থাৎ ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দেশের সংসদীয় সরকার কার্যকরী ছিল না। এই সময় জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে সামরিক ও রাষ্ট্রপতির শাসন চালু ছিল। এই রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার অধিনে মূলত একব্যাক্তির স্বৈরাচার কায়েম ছিল। জনগন এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদী হয়ে উঠে এরশাদ আমল থেকে এবং ঐ সময় থেকে তারা গণতন্ত্র তথা সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। দীর্ঘ নয় বছর এরশাদ ও তার দল জাতীয় পার্টি তাদের একনায়ক সুলভ কর্তৃত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন ।" Following Zia, Ershad did the same job. Like many other dictators in the world he did not allow any body who could succeed him. He held the office of the president while his wife was the first lady; he was the chairman of Jajiyo party, head of the state and government and chief of the armed forces - the bastion of power" [১]

এই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে আন্দোলন সংগঠিত করা হয় । তবে এই আন্দোলন গুলি গনরুপ নিতে পারেনি বিধায় স্বৈরশাসনের ভিত নড়াতে পারেনি । ১৯৮৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী এরশাদের বেআইনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং সামরিক আইন জারীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ মিছিল করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে। ১লা এপ্রিল সামারিক সরকার ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দিলে আঃ লীগ এর নেতৃত্বে গঠিত হয় ১৫ দলীয় ঐক্যজোট, যারা ৭২

১. *Parliamentary Democracy In Bangladesh*; *From Cricis To Crisis* - Zaglul Haider - J. Asiat, Soc. Bangladesh. Hum . Vol. 42, No-1, June, 1997.

Dhaka University Institutional Repository

সালের সংবিধান পুনঃ প্রবর্তন ও জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন দাবী করে । বিএনপির নেতৃত্বে গঠিত হয় ৭ দলীয় ছাত্র ঐক্যজোট যাদের প্রধান দাবী ছিল এরশাদের পদত্যাগ ও রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন । ওয়ার্কাস পার্টির নেতৃত্বে গঠিত হয় ১৫ দলীয় ঐক্য জোট যারা সংসদীয় সরকারের পক্ষে মত দেয় ।

১৯৮৭ এর অক্টোবরে জোটগুলি ঢাকা অবরোধ নামে এক যৌথ কর্মসূচী ঘোষণা দেয় । কিন্তু এরশাদ তার চতুর কৌশলে বড় দল দুটির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে আন্দোলন ব্যর্থ করে দেয়। ৮৭-র ঐ অবরোধ সফল হলে এরশাদের পতন ছিল অনিবার্য । এভাবে জোট গুলি বিভিন্ন সময়ে স্বৈরাচারের পতনের জন্য উদ্যোগ নিলেও ৯০ এর অক্টোবর পর্যন্ত কোন উল্লেখ যোগ্য আন্দোলন যৌথ ভাবে সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয় । কারণ বড় দল দুটির যেমন মতাদর্শগত পার্থক্য ছিল, তেমনি ছিল পারস্পরিক অবিশ্বাস, যেটিকে কাজে লাগিয়েছিল স্বৈরাচারী এরশাদ। " The AL and the BNP could not meet on the same platform. They fought seperately for a common target-the ousting *general election and election under the caretaker government*" [২] THE DAILY STAR, DECEMBER, 1990.এই পটভূমিতে ১৯৯০ এর ১০ ই অক্টোবর ৩ জোট সচিবালয়ের সামনে অবরোধ, ধর্মঘটের কর্মসূচী নেয় । আঃ লীগ এর নেতৃত্বে আট দলের সমাবেশ হয় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে। বিএনপির সমাবেশ বাইতুল মোকারমের উত্তর গেটে এবং পাঁচ দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় জিপিও এর সামনে। ঐদিনের মূল উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বি এন পির সমাবেশে, এখানে সারে এগারটায় এরশাদের একটি কুশপুত্তলিকা দাহ করার মধ্যে দিয়ে জনগন তাদের বিক্ষোভের সূচনা করে । ঐসময় বিএনপির মহাসচিব সালাম তালুকদার সমাবেশ থেকে পুলিশ ব্যারিকেড তুলে নেবার আহবান জানালে পুলিশ হঠাৎ বেপরোয়া লাঠি চার্জ শুরু করে । এতে বেগম খালেদা জিয়া সহ নেতৃবৃন্দ লাঠির আঘাতে মাটিতে পড়ে যান । এক পর্যায়ে আল্লওয়ালা ভবনের মহানগরী জাতীয়পার্টির অফিস আক্রমন হলে সেখানে পুলিশও জাতীয় পার্টির সসস্ত্র গুন্ডাদের গুলিতে পাঁচ জন মারা যায় ।[৩]

২.The Daily Star, Dacember, 1990

[৩] দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই অক্টোবর, ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

এই লাশ নিয়ে ছাত্র এবং পুলিশ এর মধ্যে টানাহ্যাচরার এক পর্যায়ে ছাত্ররা জেহাদ নামে এক ছাত্রের লাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিয়ে আসে এবং এতে তাদের মধ্যে এবং বিক্ষুব্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয় । তখন ছাত্র সংগঠন গুলো তাদের নিজেদের সমস্ত মতাপার্থক্য আপাতত স্থগিত রেখে এরশাদ পদত্যাগের আন্দোলনে ঐক্য বদ্ধ হয় । ঐদিনই একমাত্র জামাতে ইসলামী ছাত্র সংগঠন বাদে ২২টি ছাত্র সংগঠন সর্ব দলীয় ছাত্র ঐক্য গঠন করে ।

ছাত্র দলগুলি এই প্রথম নিজেদের মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে ও দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে ঐক্যবদ্ধ হয়, যেটি স্বাধীনতার পর ছাত্র আন্দোলনের লুপ্ত গৌরব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয় এবং এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের নতুন গতি সঞ্চার করে। এই সময় রাজনৈতিক দলগুলির নির্দেশে ছাত্র ফ্রন্ট গুলি চলেনি বরং তাদের নির্দেশেই রাজনৈতিক দল গুলি পরিচালিত হয় । সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য রাজনৈতিক দল গুলিকে মতবিরোধ ভুলে গিয়ে এক দফার আন্দোলনে আহবান জানায় । এ প্রেক্ষিতে আট, সাত ও পাঁচ দলীয় ঐক্য জোট ছাত্রদের আহবানে সাড়া দিয়ে সরকার পতনের রূপ রেখা ঘোষণা করে । " On November 1990, the three alliances issued a joint statemant , the declaration stated that Ershed would be forced to appoint (under Article 51 of the constitution) a new vice president acceptable to the three alliances and that Erahad himself must resign and handover power to the vice presidentl (under Article 55 of the constitution). So that the vice president could not act as the acting president. The acting president would then form a neutral govornment to hold free and fair election. [৫]

[৫] Haliday, November 23, 1990.

Dhaka University Institutional Repository

"In contrast with the mass upsurge of 1987 , the pressure of the people was now so great that Sheikh Hasina did not dare to go against the movement. Besides it was reported by VOA and BBC during the movement that Japan and Great Britain made it clear to Ershad that they would stop all aid if the emergency which he had declared was continued." [৫] জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক ভাবে এরশাদকে হটানোর জন্য চাপসৃষ্টি করা হলেও এরশাদ নতজানু না হয়ে বরং আরো স্বৈরাচারী হয়ে উঠে। তবে এই অবাধ শক্তির পেছনে ছিল আমলা ও সামরিক বাহিনীর হাত। এরশাদ এই সময় সিএসপি- দের নিয়ে জি-১০ গঠন করেন। এতে আমলা ও সামরিক সদস্যরা যোগ দেন। The G-10 used to advise the president to run the Country. Similarly, a group of Army officers cooperaed with him to strengthen the dictatorial rule in the country. Both civil and military officers assisted him to win the election through rigging". [৬]

[৫]The Fall of Ershad Regime : "The Last Episode" , *HOLIDAY*, December, 1990.

[৬]Sirajuddin. op.cit.page-135.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ এর ২৭শে নভেম্বর বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সহকারী সেক্রেটারী ডঃ মিলন সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হলে আন্দোলনের নতুন মাত্রা যোগ হয় এবং তিব্রতা বৃদ্ধি পায়। পূর্বের মত এরশাদ আবারও রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলির মাঝে ভাংগন সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এবং জরুরী অবস্থা জারী, ১৪৪ধারা ও সান্ধ্য আইন জারী করে। কিন্তু জনসাধারন বিশেষ করে বিভিন্ন ছাত্র দলগুলি কার্ফিউ ভঙ্গ করে রাস্তায় চলে আসে। এই সময় আওয়ামীলীগ নেত্রী হাসিনা কাওরান বাজার আওয়ামীলীগ অফিসে যাওয়ার পথে পুলিশ তাকে আটক করে এবং তার ধানমন্ডির বাসায় গৃহবন্দী করে। তার এই আটকাদেশে জনগন আরও বিক্ষুব্ধ ও সংগ্রামী হয়ে উঠে। গনঅভ্যুত্থানের ইতিহাসে এই ২৭শে নভেম্বর অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ন এই জন্য যে, ঐদিন থেকেই অলিখিত ভাবে এরশাদ শাসনের অবসান হয়। দেশের শাসনভার মূলত বিরোধীদের হাতে চলে যায়। এছাড়া সরকারী চাকুরীজীবি এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারী এ আন্দোলনে যোগ দেয়।

এভাবে যখন সমগ্র রাজনৈতিক দল ছাত্র সংগঠন পেশাজীবী , বুদ্ধিজীবী এবং দাতা দেশ গুলো ও বিভিন্ন এজেন্সী সমূহ এক দফা এক দাবীতে একত্রিত হয়, সেই প্রেক্ষিতে ৯০ এর ৪ঠা ডিসেম্বর এরশাদ পদত্যাগ করে । " তিন জোট মনোনীত ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থিত প্রধান বিচার পতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ৯০এর ৬ই ডিসেম্বর অন্তরবর্তীকালীন তত্বাবধায়ক সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নেন । এটা অনেকটা বিপ্লব তুল্য । অনেকের মতে ১৯৭১ সালে প্রথম বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর এটা ছিল দ্বিতীয় বিপ্লব..... ৭০এর শেষ পর্যায়ে ইরানে এবং ৮০ দশকের মাঝামাঝি ফিলিপাইনের পর বিশ্বের খুব কম দেশেই এমন বৈশিষ্টা মন্ডিত ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে। [৭]

[৭] অধ্যাপক এ.কে.এম. শহিদুল্লাহ, *বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচন, ১৯৯১*, সম্পাদনাঃ অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ, *বাংলাদেশে সংসদীয় গনতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা*, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ১৫-১৬, ।

Dhaka University Institutional Repository

Ershad thus had no other alternative but to handover power to the chief justice of the Supreme Court, Justice Shahabuddin Ahmed (a consensus – candidate of all political parties) on December 6, 1990. Justice Ahmed was given a mandate by all opposition parties to hold free and fair elections of the Jatiyo Sangsad, within 3 months of his assuming office. Thus the civil society prevaild over the armed sector of the state." [৮]

১৯৯১ এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মডেল হিসাবে দেশের ভিতরে ও বাইরে প্রশংসা অর্জন করে । এই নির্বাচনে ৩০০টি আসনে ৪২৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ ৭৬টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহন করে এবং এই সংখ্যা পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। তবে এর মধ্যে কেবল ১২টি রাজনৈতিক দল বিভিন্ন আসন পায়। এতে বি এন পি সর্বাধিক ১৪১টি আসন, আওয়ামী লীগ ২য় সর্বাধিক ৮৮টি, জাতীয় পার্টি ৩৫টি এবং জামাতে ইসলামি ১৮টি আসন পায়। অন্য ৮টি দল মোট ১৮টি আসন পায় [৯]।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ কারী রাজনৈতিক দলের মাঝে দুটি চিন্তধারা প্রবাহমান ছিল । একদিকে ছিল ১৯৭৫ পূর্ব নীতি, মতাদর্শ ও কর্মসূচী যার প্রধান মুখপত্র ছিল আওয়ামী লীগ। অপর দিকে ১৯৭৫ পরবর্তী কর্মসূচী,মতাদর্শ ও মতবাদ যার প্রবক্তা ছিল বিএনপি । আওয়ামী লীগ ও বিএনপি মর্তাদর্শের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে বাংলাদেশকি ১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রদর্শিত শেখ মুজিবের উত্তরাধিকারে (Legacies) সাথে সংশ্লিষ্ট আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত কাঠামোর ফিরে যাবে নাকি ১৯৭৫এর পট পরিবর্তন উত্তর জিয়াউর রহমান সৃষ্ট আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শ গত ধারাকে তুলে ধরবে |

[৮]. Tahukder Moniruzzaman, *Politics And Security Of Bangladesh*, UPL, 1994, Page – 143.

[৯] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

Dhaka University Institutional Repository

ফলাফলে দেখা যায় যে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পায় এবং জামাতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে । অপর দিকে আওলীগ দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট এবং প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। জাতীয় পার্টি তৃতীয় এবং জামাতে ইসলামী চতুর্থ স্থান লাভ করে ।

১৯৯১ এর ২০ শে মার্চ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ খালেদা জিয়া কে প্রধানমন্ত্রী, ২০ জনকে পূর্ণ মন্ত্রী এবং ২০ জনকে প্রতি মন্ত্রী হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করান এবং নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন । মন্ত্রি পরিষদ গঠনের এই বৈঠকে বিরোধী দলের কোন সদস্যই উপস্থিত ছিলেন না । ১৯শে নভেম্বরের যৌথ ঘোষনায় সরকার পদ্ধতির স্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও বিএনপি প্রথমে রাষ্ট্রপতি সরকারের পক্ষে মত দেয়। আওয়ামীলীগ ও বিএনপির মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। " নির্বাচনের রায় অনুসারে বিএনপি সরকার ক্ষমতাসীন হলে এই উত্তরন প্রক্রিয়ায় প্রথম স্তর অতিক্রান্ত হয়। কিন্তু তিন জোটের রূপরেখা অনুসারে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিএনপি সরকারের প্রাথমিক অনীহার কারনে এই উত্তরন প্রক্রিয়া শুরুতেই জটিলতার সম্মুখীন হয়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রচন্ড শক্তিশালী জনমতের চাপেই দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়" [১০]

সরকারী দল সংসদীয় সরকারের পক্ষে মত দেয় প্রধানত ৩টি কারণে (১) তিন জোটের কাছেদেওয়া অঙ্গীকার রক্ষার জন্য (২) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিপুল ব্যয়ভার এড়ানোর জন্য (৩) সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি মানুষের ইতি বাচক সড়ার জন্য । A supporter of presidential form of government Khaleda Zia dragged her feet on the issue, but ultimately decided for a parliamentery system" [11]

১০ Weekly Holiday, January 11, 1991.

১১ Moudud Ahmed, Crisis of Democracy in Bangladesh, *HOLIDAY*, Dhaka, October 18, 1991, Page 3.

Dhaka University Institutional Repository

সংসদের প্রথম অধিবেশনেই প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সংসদীয় ব্যবস্থা পুণপ্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান সংশোধন বিলের নোটিশ দেয় । অপর দিকে সরকারী দল দ্বিতীয় অধিবেশনে (৩০শে জুলাই ১৯৯১) সংবিধান সংশোধান সম্পর্কিত আরও ২টি বিলের নোটিশ দেয়। ৪ঠা জুলাই ১৯৯১ তারিখে ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন আরও চারটি সংবিধান সংশোধনী বিল আনেন । ৯ই জুলাই ১৯৯১ তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে ৭টি বিল প্রেরিত হয় ১৫ সদস্যর এক বাছাই কমিটিতে যার সভাপতি ছিলেন আইনমন্ত্রী মীর্যা গোলাম হাফিজ এবং উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন সরকারী দলের বদরুদোজা চৌধরী, আওয়ামী লীগ এর আবদুস সামাদ আজাদ এবং ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন । এই বাছাই কমিটি ২৪শে জুলাই ১৯৯১ তারিখে সর্বসম্মতি ক্রমে তাদের রির্পোট প্রদান করে ২৯টি বৈঠকে প্রায় ১০০ ঘন্টা আলোচনা পর্যালোচনার পর। [১২] ৬ই আগষ্ট ১৯৯১ তারিখে মধ্যরাতে অভূতপূর্ব সমঝোতা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে শেখ রাজ্জাকআলীর সভাপতিত্বে(তৎকালীন ডেপুটি স্পীকার) ২৭৮-০ বিভক্তি ভোটে সংবিধানের একাদশ সংশোধনী বিল (বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ পূর্ব পদে গমন) এবং ৩০৭-০ বিভক্তি ভোটে দ্বাদশ সংশোধনী বিল (সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত) পাস হয় । এই দুটি বিল পাশের মধ্যে দিয়ে ৫ম সংসদের প্রথম সফলতার বীজ বপন করা হয় । "The passage of the 12th constitutional amendment bill was the culmination of protracted and painstaking movement for restoration of democracy". [১৩]

[১২] - গোলামুজ্জামান, *নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার*, ১৯৯২, পৃষ্ঠা - ২৭।

[১৩] Mohammad A.Hakim, *The Shahabuddin Interregnum*, UPL, Dhaka, 1993.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ সংশোধনী বিলে সংবিধানের ৪৮, ৫৬, ৫৮, ৯২ ক ধারার কোন কোন বিধান সংশোধন হয়েছে বলে এ ব্যাপারে সাংবিধানিক গনভোটের প্রয়োজন দেখা দেয় । নিয়মানুযায়ী দ্বাদশ সংশোধনীর চেয়ে পাসকৃত বিলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দেবেন কি না তা জানার উদ্দেশ্যে ৭দিনের মধ্যে গনভোটের তারিখ ঘোষণার জন্য নির্বাচন কমিশনকে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ প্রদান করেন । ভোটার গন দ্বাদশ সংশোধনী বিলের পক্ষে রায় দিলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ বিলটি অনুমোদন করবেন বিধায় ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১ তারিখে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সারা দেশে গনভোটের দিন নির্দিষ্ট হয়। এই সাংবিধানিক গনভোট হাঁ সূচক ভোট পরে শতকরা ৮৪.৪২ ভাগ এবং না সূচক ভোট পড়ে শতকরা ১৪.৪৮ ভাগ ।[১৪] ১৯৯১এর ৮ই সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ভোট দেন সাংসদরা। বিএনপির আব্দুর রহমান বিশ্বাস ১৭২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। ৯ই অক্টোবর সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ, আব্দুর রহমানকে প্রেসিডেন্টের পদে বসিয়ে নিজে পূর্বের পদে (সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি) ফিরে যান।

১৯৯০ এর গন অভ্যুত্থান এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে তত্বধায়াক সরকার গঠন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রে পুনরায় সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বলতর অধ্যায় সংযোজন করেছে । এই ঐতিহাসিক অধ্যায়ের পটভূমি তৈরী করেছিল আর একটি অধ্যায় বা ঘটনা তা হলো তিন জোটের রূপ রেখা যেটি ১৯৯০ এর ১৯শে নভেম্বর ৩জোট (৫,৭,ও ৮ দলীয় ঐক্যজোট ঐক্য বদ্ধ ভাবে ঘোষণা দেয় ; "বাংলাদেশে সরকার পদ্ধতি গ্রহণ সম্পর্কিত বির্তকে জনগন ও তাদের সচেতন অংশের আকাংখা ও দাবী সমস্যাটির ন্যায়ানুগ ও সর্বোচ্চ কল্যাণ প্রসূত মীমাংসা অর্জনের জন্য সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে বাছাই করেছে । আর এজন্যই মৌলিক এবং সর্বাদিক জনসমর্থন লাভকারী ডকুমেন্ট বা দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়েছে ১৯শে নভেম্বর ১৯৯০ এর ৩ জোটের অভিন্ন যৌথ ঘোষণা । কেননা এই ঘোষণায় সংসদের কাছে দায়বদ্ধ সরকারের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে ।

[১৪] নির্বাচন কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

তাই সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ৫ম জাতীয় সংসদ গঠন এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক খালেদা জিয়াকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করার পর যখন সংসদের ভেতরে ও বাইরে বিএনপির নেতৃস্থানীয় মুখপত্রদের কেউকেউ সুবিধাবাদী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যৌথ ঘোষণা ছিল আন্দোলনের কর্মসূচী এবং এর কোন সাংবিধানিক মূল্য নাই, তখন জনগনের বিভিন্ন অংশ হতেও পত্র পত্রিকায় তীব্রপ্রতিবাদের ঝড় উঠেছে । আবার সংসদের আলোচনাও যখন সরকার পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ককালে বিএনপির এক জন নেতৃত্ব স্থানীয় সদস্য এমন মন্তব্য করেছেন ,যে ১৯শে নভেম্বরের যৌথ ঘোষনা এখন শুধুই জলছবি তখনও এসব যুক্তিকে প্রতারনার সামিল ধরে নিয়ে সংসদের ভিতরে ও বাইরে তীব্র আপত্তি উঠেছে, প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।" [১৫] কারণ ১৯শে নভেম্বরের যৌথ ঘোষণা বা ৩জোটের রূপরেখা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন মূল্যবোধ ও দিক নির্দেশণা দেয় । দেশে আজকে রাজনৈতিক অঙ্গনে সকল ক্ষেত্রেই এক অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছে । এর মধ্যেই যতটুকু ভাল কাজ করছে নেতা নেতৃরা ও রাজনীতিবিদরা সেটুকু এই যৌথ ঘোষণার প্রতি তাদের অঙ্গিকার ও অবিচল আস্থার জন্য সম্ভব হচ্ছে । তাই এই যৌথ ঘোষণার মূল নীতি বা দাবী গুলি কি কি ছিল সেটি জানা সকলের জন্য আবশ্যক ।

নিম্নে যৌথ ঘোষণার বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :-

(১) অসাংবিধানিক ধারায় অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের দুঃশাসনের কবল থেকে মুক্তির জন্য এ গন আন্দোলন ও সংগ্রাম ;

(২) এরশাদ সরকারের অপসারনের দাবী এবং দেশে একটি স্থায়ী গনতান্ত্রিক ধারা ও জীবন পদ্ধতি কায়েম এবং মুক্তি যুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ;

(৩) একটি প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ;

[১৫] ১৯শে নভেম্বরের যৌথ ঘোষণাও সংসদীয় সরকার । *আজকের কাগজ*, ঢাকা, ১২ই মে, ১৯৯১ ।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) দেশবাসী বুকের রক্ত দিয়ে যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো হত্যা, ক্যু প্রভৃতি অসাংবিধানিক পন্থায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হাত বদল ও হস্তান্তর নিশ্চিত করা । এজন্য আমাদের সংগ্রামের দাবী কেন্দ্র ও বিষয়বস্তু হলো একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠা করা ।

(৫) হত্যা ক্যু চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ধারায় প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী এরশাদ ও তার সরকারের শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করা ;

(৬) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের নিকট অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং এই সংসদের নিকট সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে ;

(৭) ক) জনগনের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে দেশে সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরংকুশ ও অব্যাহত রাখা হবে এবং অসাংবিধানিক যে কোন পন্থায় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা হবে । নির্বাচন ব্যাতীত অসাংবিধানিক বা সংবিধান বর্হিভূত কোন পন্থায় , কোন অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না ।

(খ)জনগনেব মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে ।

(গ) মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল আইন বাতিল করা হবে ।*

* হাসানুজ্জামান, *নবপ্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা*, ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ২৪, ।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের যৌথ ঘোষণার মূল বক্তব্যই ছিল ১৬ বৎসরের প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির নামে যে এক ব্যক্তির শাসন দেশে চালু আছে সেটি অবিলম্বে বাতিল করে একটি সত্যিকারের গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে একটি সফল অভ্যুত্থান ও জনগনের সংগ্রাম পারিচালিত হয়েছে । ঘোষণায় সরকার পরিবর্তনের জন্য সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে হত্যার রাজনীতি ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চিরতরে বন্ধকরার কথা বলা হয়েছে । এই রূপরেখায় সংসদীয় সরকারের কথা সরাসরি বলা না হলেও স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌম সংসদ এবং প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থার কথা বল হয়েছে যেটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। গনতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরনের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আইনের শাসন মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কালাকানুন বাতিলের দাবীও করা হয়েছে । সব চেয়ে বড় কথা হলো এই ঘোষণা কোন একক দল বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দেওয়া হয় নাই বরং সকল দলমত ও ছাত্র সংগঠন সম্মিলিত ভাবে এই রূপরেখায় সম্মতি জানায় যেটি ইতিহাসে একটি স্বর্ণ অধ্যায় সৃষ্টি করেছে । আর এই অধ্যায় আর একটি ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে তা হলো "জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধনী) বিল ১৯৯১ গন ভোটের মাধ্যমে জনগনের সুস্পষ্ট রায় নিয়ে ১৮ই সেপ্টম্বর নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ফল ঘোষণার প্রেক্ষিতে সংবিধানের ১৪২ ধারায় (১/গ ও দফা বলে ২রা আশ্বিন ১৩৯৮ এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে বলে গন্য হয় । ওই দিন থেকে বাংলাদেশে বহু কাংখিত সংসদীয় সরকার কার্যকর " । [১৯]

[১৯] আজকের কাগজ, ঢাকা, ২০ শে নভেম্বর, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সংসদীয় সরকারের কার্যকারীতা (১৯৯১- ৯৬)।

বৃটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশের প্রকৃত উত্তরাধিকার। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের সংবিধানেও সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল । কিন্তু ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারী মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে এব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তিত হয়। সংবিধানের এই সংশোধনী ১৯৯১ সালের ১৫ ই সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত গনভোটের দ্বারা গৃহীত হয়। উল্লেখ্য সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনঃপ্রবর্তিত সংসদীয় পদ্ধতির ব্যাপারে দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যাপক ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায় ।

সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তিত হবার পর থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিশেষত সংসদে যে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব ছিল তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে এমনকি জাতীয় গুরুত্বপূর্ন বিষয়েও ব্যাপকমত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এই মত বিরোধ গঠন মূলক ভাবে পরিচারিত হবার মাধ্যমে সংসদকে দেশের সকল কর্মকান্ডের মূল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার পরিবর্তে একে মূলত অকার্যকর করে তুলে । নিম্নে ১৯৯১-৯৬ সময়ে সংসদীয় কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১ অধিবেশন সমূহের আলোচনাঃ

৫ম জাতীয় সংসদে ৫ বছরের কার্যকালে ২২ টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। একটি বাস্তব অগ্রসরমান সংসদীয় গনতন্ত্রের জন্য এই কার্যক্রম বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অর্ন্তিসন্দভের এই অধ্যায়ের অংশে এই বিষয়ে বস্তুনিষ্ট আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমেই সংসদে অধিবেশন সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন করা হলো। বিএনপি সরকারের ৫ বছরের শাসন আমলে সংসদের ২২টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এর সার্বিক বিশ্লেষনের মাধ্যমে সংসদের কার্য্যকারীতা ও জবাবদিহীতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে অধিবেশন গুলি দেখানো হলো ।

Dhaka University Institutional Repository

৫ম সংসদ (১৯৯১-৯৬)

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট কার্যদিবস
১ম	৫-৪-৯১	১৫-৫-৯১	৪১	২২
২য়	১১-৬-৯১	১৪-৮-৯১	৬৫	৪৩
৩য়	১২-১০-৯১	৫-১১-৯১	২৫	১৪
৪র্থ	৪-১-৯২	১৮-২-৯২	৪৬	২৭
৫ম	১২-৪-৯২	১৯-৪-৯৩	৮	৬
ষষ্ঠ	১২-৬-৯২	২০-৭-৯২	২০	৫১৭
সপ্তম	১০-৮-৯২	২৮-৮-৯২	১৯	১০
অষ্টম	২০-৯-৯২	২৬-১১-৯২	৩৭	২৮
নবম	২৫-১-৯৩	৪-৩-৯৩	৪০	২০
দশম	৫-৬-৯৩	২২-৬-৯৩	১৮	১৪
এগার	২৭-৯-৯৩	১৫-৩-৯৩	১৮	১৬
বারো	২-১০-৯৩	১৯-১০-৯৩	২১	১৯
তেরো	৮-১-৯৪	৩-২-৯৪	২৭	১৮
চৌদ্দ	৪-৫-৯৪	৩০-৫-৯৪	২৬	১৯
পনের	৬-৪-৯৪	১১-৭-৯৪	৩৫	২৭
ষোল	৩০-৮-৯৪	১৩-৯-৯৪	৪২	২২
সতেরো	৮-১১-৯৪	৩০-১১-৯৪	২২	১৮
আঠারো	২৩-১-৯৫	২৮-২-৯৫	২৬	১৬
উনিশ	২০-৩-৯৫	২৭-৪-৯৫	৩৮	২০
বিশ	২৭-৬-৯৫	২৮-৭-৯৫	৩১	১৭
একুশ	৬-৯-৯৪	২-১০-৯৫	২৬	২৪
বাইশ	১৪-১১-৯৫	২৪-১১-৯৫	১১	৮
মোট কার্যদিবস				৩৯৬

সূত্রঃ জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারী শব্দ কোষ, প্রকাশক গোলাম মঈন উদ্দিন, পাঠ্য পুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধিবেশনঃ ১ম অধিবেশনে স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় (৫ই এপ্রিল)। আবদুর রহমান বিশ্বাসকে স্পীকার এবং শেখ রাজ্জাক আলীকে ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করা হয়। এরা দু'জনই BNP এর দলীয় সদস্য ছিল। বিরোধী দলের বিরোধীতা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তাদের নির্বাচিত করা হয়) বৃটেনে দেখা গেছে যে, উক্ত পদ দু'টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে স্বীয় দলের লোককে নির্বাচনের সুযোগ থাকলেও সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সকল দলের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হয়। একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আব্দুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি হয়ে যাবার পর শেখ রাজ্জাক আলী স্পীকার ও হুমায়ুন খান পন্নী ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। আব্দুর রহমান বিশ্বাস এর এই স্পীকার ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া দু'টিই ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংসদীয় রীতি বিরোধী। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন বরিশাল শাখার শান্তিকমিটির সহ-সভাপতি, একজন রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তি কখনই সংসদ বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিতে পারেনা। অপরদিকে হুমায়ুন খান পন্নীও স্বাধীন দেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন '৭৭ সাল পর্যন্ত। কাজেই ৫ম জাতীয় সংসদের সূচনা হয়েছে জনপ্রতিনিধিত্বের প্রকৃত দায়কে ভুলুণ্ঠিত করে। ১৯শে নভেম্বরের ঘোষণাকে বিস্মৃত করে, নির্বাচনী ঘোষণাকে পায়ে দলে এবং সর্বোপরি সংসদীয় গণতন্ত্রের সত্যিকার স্পিরিটকে বানচাল করে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উল্লেখিত ভ্রান্তি, সংসদীয় রীতির সাথে অসঙ্গতপূর্ণ আচরণের ধরণ ভবিষ্যতে দেশে সংসদীয় সংস্কৃতির বিকাশকে নেতিবাচক অর্থেই প্রভাবিত করবে বলে মনে হয়।[১]

[১] আসানুজ্জামান, *নবপ্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা,* ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৫৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ ২য় অধিবেশনে সর্ব সম্মতিক্রমে (৬ই আগষ্ট) সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল দু'টি অনুমোদিত হয়। একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের পূর্ব পদে প্রত্যাবর্তন সম্পন্ন হয় এবং রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর কার্যকলাপ বৈধতা পায়। দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দীর্ঘ ১৬ বৎসর পর রাষ্ট্র পুনরায় সংসদীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। যে সমঝোতা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই বিল দু'টি পাশ হয়েছিল তা ছিল সংসদীয় সরকারের সফলতার পূর্ব শর্ত। কিন্তু এ ধারা পরবর্তীতে আর টিকে থাকেনি।

তৃতীয় অধিবেশনঃ ৩য় অধিবেশনই (১২ই অক্টোবর ৯১) হলো সংসদীয় সরকার প্রবর্তনের পর প্রথম অধিবেশন। ২৫দিন ব্যাপী এই অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল ১৪ দিন। এতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, ৩৪টি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় কিন্তু কোরামের অভাবে সেগুলির মূলতবী ঘোষনা করা হয়। এই অধিবেশনে সদস্যদের অনুপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান মাত্র ১দিন এবং প্রধান মন্ত্রী মাত্র ৩দিন উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের শেষ দিন জামায়াতের সংসদীয় নেতা মতিউর রহমান নিজামী এই বিষয়টি জোড়ালোভাবে উত্থাপন করে বলেন যে সংসদ কার্যকারীতায় বহুলাংশে নির্ভর করে সংসদ নেতা বা নেত্রীর উপস্থিতির উপর। সরকারী দলের উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী এই মতের সাথে একমত না হয়ে বরং সংসদ সঠিকভাবে কার্যপরিচালনা করছে বলে দাবী করে। স্পীকারও এই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে পক্ষপাতিত্ব করেন। অথচ সংসদীয় রীতি অনুযায়ী উচিৎ ছিল সকল সদস্যই ভুল বা অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া, যেটি এই সংসদে দেখা যায়নি।

চতুর্থ অধিবেশনঃ ৪র্থ অধিবেশন ছিল শীতকালীন। '৯২ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে উপজেলা অধ্যাদেশ বাতিল প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক হয়। এই অধিবেশনেও দেরী করে উপস্থিত হওয়া এবং অনুপস্থিতির হার ছিল লক্ষনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধিবেশনঃ ৫ম অধিবেশনে গোলাম আজম প্রসংগে তর্ক বিতর্ক শুরু হলে বিরোধী দল যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে তার বিচার দাবী করে। সরকারী দল আইনানুগ পদ্ধতিতে নিষ্পত্তির আহবান জানায়। এতে বিরোধী দল ওয়াক আউট করে ফলে অধিবেশন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হতে পারেনি।

ষষ্ঠ অধিবেশনঃ ৬ষ্ঠ অধিবেশনে ১২ই জুন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান জাতীয় সংসদে ৯১-৯২ সালের বাজেট পেশ করেন। এই বাজেটের মাধ্যমে এই প্রথম মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট আরোপ করা হয়। যার মাধ্যমে অতিরিক্ত দু'শ ৫০ কোটি টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। এটি একটি ভাল উদ্যোগ ছিল। এছাড়া এতে চলমান বিবিধ সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়।

সপ্তম অধিবেশনঃ ৭ম অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, (১০ই আগষ্ট '৯২) BNP সরকারের বিরুদ্ধে মোট ৭টি দল যেমন-আওয়ামীলীগ, জাতীয় পার্টি, সিপিবি, গনতন্ত্রী পার্টি, ন্যাপ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। অনাস্থার কারণ হিসাবে বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেন। যেমন ঃ আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, জনগণের জানমালের নিরাপত্তাহীনতা, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা অর্থনৈতিক দুরাবস্থা প্রভৃতির উল্লেখ করেন। অনাস্থা প্রস্তাব যুক্তি সঙ্গত ছিল। কেননা '৯২ সালে সন্ত্রাসী তৎপরতা সহ বিভিন্ন অপকর্ম বেড়ে যায়। যার জন্য সরকার ও বিরোধী দল উভয়ে উভয়কে দোষারোপ করে। ১২ই আগষ্ট দীর্ঘ ১৭ ঘন্টা আলোচনা সমালোচনার পর অনাস্থার বিরুদ্ধে BNP ১৬৮-১২ ভোটে জয়লাভ করে। একমাত্র জামাতে ইসলামী ভোটদানে বিরত থাকে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে দিয়ে সরকার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। প্রধানমন্ত্রীর সমাপনী ভাষণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিরোধী নেত্রীর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রীদের অযোগ্যতা, অনভিজ্ঞতা, অদক্ষতা, সিদ্ধান্তহীনতার মন্তব্য করে যে অভিযোগ করা হয়েছিল তার জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন "BNP র মন্ত্রীরা ব্যর্থ, তারা দেশ চালাতে পারেনা, আমি নাম বলবো না, এখানেও অনেকেই আছেন। কিন্তু তারা অধির আগ্রহে BNP তে যোগদান করতে চান। কিন্তু একটি শর্ত। ১ম শর্ত হচ্ছে আমাদের যদি ঐ জায়গাটি দেওয়া হয় ঐ সুযোগটি দেওয়া হয় তাহলে আমরা BNP তে যোগদান করবো এবং BNP তখন খুব ভাল হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

কোন অনিচ্ছাই থাকবেনা"[২]। প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্যের সত্যতা এখানেই সে জাতীয় স্বার্থে নয় বরং দলীয় স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার জন্যই দলগুলি অনাস্থা আনে। এই বৈঠকে গুলইন, মেনন হত্যা প্রচেষ্টা এবং ইনডেমনিটি বিল নিয়েও আলোচনা করা হয়।

অষ্টম অধিবেশনঃ ৮ম অধিবেশনে সরকারের তৎপরতায় বহুল বিতর্কিত সন্ত্রাস দমন বিল উত্থাপন করা হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর '৯২ হইতে এই অধ্যাদেশটি কার্য্যকর ও বলবৎ হবার পর থেকেই সকল রাজনৈতিক দল পেশাজীবি সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ছাড়া সকল ছাত্র শিক্ষক সংগঠন এর তীব্র বিরোধীতা ও নিন্দা করে। এর প্রতিবাদে সকল বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে। ১৬ই সেপ্টেম্বর, '৯২ তারিখে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর ষ্ট্যান্ডিং কমিটির পক্ষথেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নৈরাজ্যমুলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশকে নিকৃষ্ট অধ্যাদেশ হিসাবে অভিহিত করে বলা হয় যে, যেখানে প্রচলিত আইনেই সন্ত্রাস ও অপরাধ দমন সম্ভব সেখানে জাতীয় সংসদ কে পাশ কাটিয়ে এ ধরণের বিশেষ অধ্যাদেশ জারির অর্থ হলো বিশেষ ক্ষমতা আইনের চেয়েও নিকৃষ্টতম অধ্যাদেশের অক্টোপাশে দেশ ও জাতিকে আবদ্ধ করা[৩]

নবম অধিবেশনঃ ৯ম অধিবেশনে '৯৩ সালের জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত প্রায় ২০ দিনের কার্য্যদিবসের একটি রেকর্ড স্থাপিত হয়। এতে ১টি বেসরকারী বিল সহ ১২টি বিল পাশ হয়। এই অধিবেশনে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে তাহলো মন্ত্রীর এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ডেপুটি স্পীকারের ডায়াসের সামনে গিয়ে মারমুখো বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এতে করে সংসদের কার্যকরী দিবসটি নষ্ট হয়ে যায়।

[২]এম এ, ওয়াজেদ মিয়া, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৪

৩. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধিবেশনঃ ১০ম অধিবেশন মাত্র ৫ দিন স্থায়ী হয়। এই অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে না যাওয়া নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উভয় দলের মধ্যে উত্তেজনা হাতাহাতির পর্যায়ে যায়। এতে আওয়ামীলীগ ও মিত্র দলগুলি বাংলামটরে ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির সমাবেশে হামলার অভিযোগে ওয়াক আউট করে।

একাদশ অধিবেশনঃ ১১দশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় '৯৩ এর সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে- শরৎকালীন অধিবেশন শিরোনামে এই অধিবেশনে আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ কৃষি মন্ত্রী এম মজিদুল হক এর বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেন। উভয় পক্ষের বাক-বিতন্ডার পর দূর্নীতির তদন্তের সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু কমিটি ৭৪দিন কাজ করার পরও Terms of reference ঠিক করতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা খুনের কারণে বিরোধী ও সরকারী দল সংসদে জামাত শিবির বে-আইনী ঘোষনা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে জঙ্গী বক্তব্য রাখে। বিরোধী পত্রিকাগুলি বিএনপির ভূমিকাকে "শাসক দলের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ শক্তির তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ বলে বর্ণনা করে।"[৯]

দ্বাদশ অধিবেশনঃ ১২দশ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী তার এক কথিত উক্তির জন্য সংসদ অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। পরে বিরোধী নেত্রীর বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে সাংবিধানিক অথবা বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গৃহীত না হয়ে বরং ইগো সমস্যায় নিপতিত হয়। বিরোধী নেত্রী পদত্যাদের হুমকী দেন। পরে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়। এই সময় বিরোধী দল সরকারের বিরুদ্ধে সু-নির্দিষ্ট ৬টি অভিযোগ আনে। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে দলীয় করণ, তথা ফেব্রুয়ারী, '৯৩ এ অনুষ্ঠিত মিরপুর ১১ আসনে ভোট ডাকাতি, প্রধানমন্ত্রীর সংসদে অনুপস্থিতি, সন্ত্রাস দমন আইন এর অপপ্রয়োগ ও মন্ত্রীদের অশালীন আচরণ।

[৯] দৈনিক জনতা, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োদশ অধিবেশনঃ ১৩ দশ অধিবেশন শীতকালীন অধিবেশন হিসাবে বিবেচিত হয়। '৯৪ এর জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ অধিবেশন থেকেই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। সেটি শুরু হয়েছিল মাগুরা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং শেষ হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে সাংবিধানিক দাবী নিয়ে। তবে তাৎক্ষণিক কারণ ছিল তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদার একটি অশোভন উক্তিকে কেন্দ্র করে। ইসরাইল কর্তৃক হেবরণ হামলার বিষয়টি সংসদে উপস্থাপিত হলে তথ্য মন্ত্রী প্রধান বিরোধী দলের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে রসিকতা করলে বিপত্তি শুরু হয়। ঐ মন্তব্যের প্রতিবাদে বিরোধী দল অধিবেশনের মাঝামাঝি সময় থেকে বেরিয়ে আসে। পরে আর ফিরে যায়নি। তাদের পক্ষ থেকে ৩ দফা দাবী উত্থাপিত হয়। ১) মন্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনা, ২) মাগুরার উপনির্বাচন বাতিল এবং ৩) সংসদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল উত্থাপন।

চর্তুদশ অধিবেশনঃ ১৪দশ অধিবেশন শুরু হয় ৪ঠা মে, '৯৪ সংকট নিরসনে কোন রকম কার্যকর ব্যবস্থা না গ্রহণ করেই। মাত্র ৬ দিনের কার্যকালের পর বিরোধী দলের অব্যাহত অনুপস্থিতির মধ্যেই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। এই অধিবেশনে মাত্র তিন মিনিটে দু'টি বিল পাশ করা হয়। এর আগে ক্ষমতাসীন দলের ষ্ট্যান্ডিং কমিটিকে বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তারা সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া অভিযোগ করেন "বারবার সংসদকে অচল রেখে আওয়ামী লীগ সংসদীয় গনতন্ত্রকে বিব্রাক্ত করে তুলেছে। সংসদের কথাবার্তা যদি সংসদ থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে গনতন্ত্রের চর্চা ব্যর্থ হতে বাধ্য [৫] অধিবেশনের প্রথম দিন ৭মিঃ স্থায়ী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী গ্রুপগুলিকে সংসদে যোগদানের জন্য আনুষ্ঠানিক আহবান জানান। এর জবাবে বিরোধী নেত্রী বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ অন্তঃসার শূন্য তার ভাষণে এমন কিছু নেই যে, বিরোধীদল সংসদে ফিরে যেতে পারে।

[৫] দৈনিক ইনকিলাব, ২৫শে এপ্রিল ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চদশ অধিবেশনঃ ১৫দশ অধিবেশনে ৬ই জুন '৯৪ তারিখে শুরু হয় বিরোধী গ্রুপের লাগাতার সংসদ বর্জন। এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ বাজেট অধিবেশন। তাই বিরোধী দলের অংশগ্রহণ সংসদীয় রাজনীতি অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ৯ই জুন সংসদে পেশ করা হয় সরকারের ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং '৯৪-৯৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট [৬] ১৯৯৩-৯৪ বাজেটে সর্বাধিক ২২৭২৭ কোটি টাকা শিক্ষা খাতে এবং দ্বিতীয় ১৬২৪ কোটি টাকা সামরিক খাতে বরাদ্দ করা হয়। তবে ১৯৯২-৯৩ বাজেটেও এদুটি খাতে বেশি বরাদ্দ করা হলেও দ্রারিদ্র্য বিমোচনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এতে বরাদ্দের পরিমান ১৪৮১ কোটি টাকা। এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এডিবিতে মোট বরাদ্দের ১৫শতাংশ। আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলিতে শৃংখলা নিয়ন্ত্রন এবং প্রচলিত কর ব্যবস্থা সংস্কারের ফলে সরকারের নিজস্ব তহবিলের অবদান বৃদ্ধি পায়। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে ধারণা করা হয় যে, সরকারী দল বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনতে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। সরকারী দল সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিরোধী দল উত্থাপিত বিল উপস্থাপনার সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু বিরোধী দলের তরফ থেকে এই ধারণা হয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সু-নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ ব্যাতিরেকে তারা সংসদে ফিরে যাবে না, তবে এই বর্জন নিয়ে তাদের মধ্যে উদ্দেশ্যগত মতদ্বৈতা ছিল। জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগ তখনই মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য কাজ করে। আপরদিকে জামাত- ৫দল, গণফোরাম, ইসলামী ঐক্যজোট ইত্যাদি দলের বক্তব্য সংসদ তার কার্য্যকাল পুরা করুক। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল উত্থাপন করে ভবিষ্যতে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। উক্ত বাজেট সম্পর্কে গণতান্ত্রিক পার্টির সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন "ঘোষিত বাজেট সংবিধান সম্মত নয়। একক সরকারী দলের নব্য স্বৈরাচারী মনোভাবের প্রকাশ সম্বলিত একটি চাপানো বাজেট।[৭] ১১ই জুলাই '৯৪-৯৫ অর্থ বৎসরের বাজেট অধিবেশনে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। জাতির ইতিহাসে এটিই ছিল ১ম ঘটনা যে ক্ষেত্রে বাজেট অধিবেশনের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিরোধী কোন সদস্যই উপস্থিত ছিলেন না।

[৬] দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই জুন, ১৯৯৪।
[৭] দৈনিক ভোর, ২৪শে নভেম্বর ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠদশ অধিবেশনঃ ১৬দশ অধিবেশন শুরু হয় ৩০শে আগষ্ট, ১৯৯৪ তারিখে। এ সংসদে বিএনপির মাত্র ৬২ জন সাংসদ উপস্থিত ছিল। ১৩ই সেপ্টেম্বর '৯৪ পর্যন্ত অধিবেশন চলে বিরোধী দলের অব্যাহত সংসদ বর্জনের মধ্যে দিয়ে। এতে ১৯৯৩ সালে কোম্পানী আইন সংশোধন বিল উত্থাপন এবং জামাতে ইসলামী কতিপয় সংসদ কর্তৃক ইতিপূর্বে সংসদ সচিবালয়ে জমা দেওয়া কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে সরকারী দলের কয়েকজন সদস্যের প্রস্তাব উত্থাপন ও সেগুলির উপর আলোচনা করা হয় ।

সপ্তদশ অধিবেশনঃ ১৭দশ অধিবেশন শুরু হয় ৮ই নভেম্বর ১৯৯৪। এই অধিবেশন শুরুর আগে রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর '৯৪ তারিখে কমনওয়েলথ মহাসচিব জেনারেল এমেকা আনিয়াকু এেদিলের সরকারী সফরে বাংলাদেশে আসেন, তিনি বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর সাথে পৃথক পৃথক বৈঠক করেন। নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নে, নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করণ এবং উপযুক্ত নির্বাচন আচরণ বিধি প্রনয়ন এই ৩টি বিষয়কে আলোচ্য সূচী হিসাবে নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বৈঠক করার প্রস্তাব দেন এবং তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য অস্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্নর স্যার নিনিয়ান স্টিফেনকে তার বিশেষ দূত হিসাবে নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। ১৩ই নভেম্বর তিনি ঢাকায় আসেন। দীর্ঘ এক মাস তার মাধ্যমে সরকার ও বিরোধী উপনেতার মাধ্যমে আলোচনা চলে, কিন্তু এই আলোচনা সম্পূর্ন ব্যর্থ হয়। সপ্তদশ অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন "আমাদের সমস্যা আমরা নিজেরাই সমাধানে সক্ষম, বাহিরে কোন সহযোগিতা প্রয়োজন নেই।" অপর দিকে বিরোধীদল সংসদের বাইরে থেকে তাদের সরকার বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

অষ্টাদশ অধিবেশনঃ অষ্টাদশ অধিবেশনের পূর্বে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও অবনতি হলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা, বিরোধীরা একের পর এক হরতাল অবরোধ বিক্ষোভ কর্মসূচী দিতে থাকে। অর্থাৎ সংসদীয় রাজনৈতিক দল চলে আসে রাজপথে। হাইকোর্ট তাদের অব্যাহত সংসদ বর্জন

Dhaka University Institutional Repository

বে-আইনী ঘোষণা এবং পরবর্তী অধিবেশন ঘোষণার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও ১৪৭ জন সদস্য ২৮শে ডিসেম্বর '৯৪ আনুষ্ঠানিক ভাবে পদত্যাগ করে, এতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং জনমনে সৃষ্টি হয় হতাশা ও উদ্বেগ। এই প্রেক্ষিতে ২৮শে ডিসেম্বর '৯৮ তাদের পদত্যাগ সংসদ আইনের বলে ঘোষণা করে। এই অবস্থায় ২৩শে জানুয়ারী '৯৫ ১৮দশ অধিবেশনের আহ্বান করা হয়। ঐ দিন স্পীকার বিরোধীদের পদত্যাগের বিরুদ্ধে রুলিং জারি করেন। সংসদ ডাকায় স্পীকার আদালতের অবমাননা করেছেন বলে প্রধান বিরোধী সংসদ নেতৃবৃন্দ পৃথকভাবে মামলা দায়ের করে।

ঊনিশতম অধিবেশনঃ '৯৫ এর মার্চে ১৯তম অধিবেশন বসে এবং ২৭শে এপ্রিল পর্যন্ত চলে। বিরোধীদল বিহীন নিস্প্রান এই অধিবেশনের কোন কর্ম তৎপরতা ছিল না। এই সময়ে এক হিসাবে সংসদ তার বৈধতা হারায়।

বিশতম অধিবেশনঃ ২৭শে জুন ২০তম অধিবেশন বসে। এটি ছিল বাজেট অধিবেশন। ২৯শে জুন '৯৫-৯৬ অর্থ বছরের বাজেট পাশ হয়। এই বাজেটে বিদ্যমান কাঠামোকে দক্ষভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হওয়ায় রাজস্ব আয় বাড়ে । এক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন করের অবদান বেশি। বিরোধীদের অনুপস্থিতিতে প্রণীত এই শেষ বাজেট দেশ ও বিদেশে তীব্র অবমাননার সম্মুখীন হয়। এই অধিবেশন শেষে সংবিধানের ১০৬ ধারা মোতাবেক প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম পদত্যাগকৃত সদস্যদের আইনগত অবস্থান সম্পর্কে সাংবিধানিক ব্যাখ্যা চান সুপ্রিম কোর্টের কাছে। ২৭শে জুলাই '৯৫ প্রধান বিচারপতিসহ ৫ জন বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত আপীল বিভাগ সিদ্ধান্ত দেয় যে, বিরোধী সদস্যদের ওয়াকআউট, বয়কট অনুমতি বিহীন অনুপস্থিত বলে গণ্য হবে এবং ঐ দিনই উক্ত সদস্যদের পদ শূন্য ঘোষণা করে। এই কারণে ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান এর বাধ্যবাধকতা দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে

Dhaka University Institutional Repository

উপনির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে সাংবিধানিক সংকট দূর করার আহ্বান জানালে তারা যে কোন মূল্যে এই নির্বাচন ঠেকাবে বলে ঘোষণা দেয়[৮]

একুশতম অধিবেশনঃ ২১তম অধিবেশন ৬ই সেপ্টেম্বর '৯৫ অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ক্রোর ক্রসিং এর কারণে ৩ জন সদস্যের সদস্যপদ বাতিলের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়। এবং প্রেসিডেন্টের পেনশন, আইসিডিডিআরবি, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত জাল উত্থাপন ও বিল দুটি বিল পাশ হয়।

বাইশতম অধিবেশনঃ ২২তম অধিবেশনের পূর্বে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য বুদ্ধিজীবিরা এগিয়ে আসেন। তারা উভয় পক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করে কোন মীমাংসায় আসতে ব্যর্থ হন। এরপর শুরু হয় পত্র যোগাযোগ। ২৮মে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বিরোধীনেত্রীকে আলোচনার আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রন জানান। ৩০শে অক্টোবর তিনি পত্রের জবাব দেন। পর পর তিনটি পত্র বিনিময় উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য আলোচ্য সূচী নির্ধারণে ব্যর্থ হয়[৯]। নিজ নিজ অবস্থানে অনড় থাকার জন্য এই যোগাযোগ কোন সমাধান দিতে পারেনি। অপরদিকে বিরোধী দলও তাদের আন্দোলন তীব্রতর করে। এ প্রেক্ষিতে ১৪ই নভেম্বর '৯৬ শুরু হয় ৫ম সংসদের অঘোষিত সমাপ্তি অধিবেশন। ২২শে নভেম্বর উপনির্বাচনের সিডিউল পুণঃঘোষিত হয়। বিরোধী অনড় অবস্থানের মুখে ২৪শে নভেম্বর '৯৫ প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম বেতার, টেলিভিশন বক্তৃতায় ৫ম সংসদের সমাপ্তির সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। এবং ঐদিনই প্রেসিডেন্ট ৫ম সংসদ বিলুপ্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।

৮. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৩০ শে আগষ্ট, ১৯৯৫।

৯ Weekly Dhaka Courier, 24 November, 1995.

Dhaka University Institutional Repository

উপরের বিস্তারিত আলোচনার দেখা যায় যে, ৫ম সংসদ শুরু হয় ৫ই এপ্রিল '৯১ এবং ২৮ নভেম্বর '৯৫ পর্যন্ত এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। এই দীর্ঘ সময় ২২টি অধিবেশনে ৩৯৬ টি কার্যক্রমে অতিবাহিত করে। তবে এই অধিবেশনগুলিই অধিকাংশই বিরোধী দলের অংশ গ্রহণ ছাড়াই সম্পন্ন হয়। কেননা বিরোধী দল মাত্র ১৩টি অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করে। ত্রয়োদশ অধিবেশনের পর থেকে তারা সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখে। আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে ২৮শে ডিসেম্বর '৯৪, সপ্তদশ অধিবেশন থেকে। এই ১৩তম অধিবেশন থেকে ১৭তম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদের অধিবেশন ছিল ৮১টি এবং সপ্তদশ অধিবেশন পর্যন্ত কার্যক্রম ছিল ৩৪৮টি [১৬]। এই অধিবেশনগুলির মান ছিল খুবই নিম্ন। কারণ ২০ মাসেরও বেশী সময় পর্যন্ত এই সংসদ বিরোধী দলের অংশ গ্রহন ব্যাতীত পরিচালিত হয়েছে। অপর পক্ষে সংসদের যে অধিবেশন সমূহে তারা উপস্থিত ছিল সে গুলিও সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন হতে পারেনি। এভাবে ৫ম জাতীয় সংসদের (১৯৯১-৯৬) কার্যকরী করণের পথে অন্তরায় সমূহ নিম্নোক্ত ভাবে উপস্থাপন করা হলো।

[১৬] সংবাদ ১০ই মে, '৯৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ সংসদীয় ব্যবস্থায় স্পীকারের পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদীয় ব্যবস্থা যেসব দেশে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ করে বৃটেনে স্পীকারের পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে সর্বসম্মতক্রমে নির্বাচিত করা হয়। কেননা তিনি কোন বিশেষ দলের নয় বরং সমগ্র আইন সভার মুখপাত্র ও প্রতিনিধি, তাকে অবশ্যই সৎচরিত্রে অধিকারী ও দেশপ্রেমিক হতে হবে। ৫ম সংসদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য হলেও সকল দলমতের গ্রহণযোগ্য হতে পারেননি। প্রথম স্পীকার আব্দুর রহমান বিশ্বাস ও ডেপুটি স্পীকার হুমায়ুন খাঁন পন্নী উভয়ই দেশদ্রোহী ছিলেন। এদের মধ্যে স্পীকারেরও যে উচু ব্যক্তিত্ব ও নিরপেক্ষ মনোভাব থাকা দরকার তা ছিল না। তিনি সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি নিয়ে ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে সংসদ পরিচালনা করতে পারেননি। আব্দুর রহমান বিশ্বাস যে ক'টি অধিবেশনে ছিলেন প্রত্যেকটিতেই দলের পক্ষে ও নিজ আত্মীয়ের পক্ষপাতিত্ব করেছেন। তিনি শ্যালক বিরোধী সদস্য রাশেদ খাঁন মেননকে ফ্লোর চাইলেই দিয়ে দিতেন কিন্তু অন্য সদস্যরাও বিশেষ করে বিরোধীরা ফ্লোর চাইলেও দিতেন না। এজন্য তিনি সরকারী ও বিরোধী উভয় সদস্যের কাছে সমালোচিত হয়েছেন। পত্র পত্রিকায়ও এই নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। সংসদের ভিতরে ও বাইরে সব জায়গায় তারা দলের পক্ষেই কথা বলেছেন। যার জন্য তাদের ব্যক্তিত্ব নিরপেক্ষ আচরণ দিয়ে সংসদকে প্রাণবন্ত করতে পারেননি। সংসদের সকল সদস্যকে সংসদের ভিতরে বসে নিয়ন্ত্রণ করা এবং এর মাধ্যমে সংসদকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন নি। "The qualities required of speaker are not really very high. So great is the prestige of the office and so careful are all parties to maintain his independence and authrity that any reasonable man can make a success of the office."[১১]

[১১] Ivor Jennings, ***The British Constitution*** Cambridge University Press New York, 1950, P-65

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত : সংসদীয় ব্যবস্থায় সংসদের দায়িত্বশীলতা ও কার্যকারীতা অধিবেশন সমূহের গুণগত মান ও সাফল্য নির্ভর করে সদস্যদের নিয়মিত উপস্থিতি, সময়নিষ্ঠা এবং দায়িত্বশীল ভূমিকার উপর। অথচ ৫ম সংসদে দেখা গেছে যে সরকারী ও বিরোধী উভয় সদস্যই এই কাজে ব্যর্থ হয়েছেন। অনেকটা ইচ্ছাকৃত ভাবেই তারা এই কাজ করেছেন। অর্থাৎ সময়মতো সংসদে উপস্থিত হওয়া ও রেগুলারিটি রক্ষা করা নতুবা এজন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে এই ধরণের কোন বাধ্যবাধকতা তাদের মধ্যে ছিলনা। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী নেত্রীর উপস্থিতি সংসদীয় গণতন্ত্রের সফলতার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কারণ তারা উভয়েই সংসদ নেত্রী ও সংসদকে প্রাণবন্ত করে রাখবেন" It is for the Prime Minister to fit all the necessary talents together in to a team, It is his function to arbitrate differences of view and personality. The house looks to the Prime Minister as the altiment oracle in the matter of doubt where Minister do not give it satisfaction and as the fountain of the policy"[১২] অতএব প্রধান মন্ত্রীর নিয়মিত উপস্থিতি বিশেষভাবে প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিগত ১৭টি অধিবেশনে দেখা গেছে যে, প্রধানমন্ত্রী শতকরা ২৫ ভাগ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন যার জন্য তিনি জবাবদিহি করেননি। এছাড়া অন্যান্য মন্ত্রী বর্গ ও সংসদ সদস্যরাও নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন না। কেবল বিল পাশের সময় হুইপ কার্যকর থেকেছেন। এছাড়া তারা সংসদে উপস্থিত থাকলেও পুরো সময়টাকে কাজে লাগাননি। সংসদের প্রথম থেকে তারা এ কাজ করেছেন। এ ব্যাপারটি তৃতীয় অধিবেশনে জামাতে মতিউর রহমান উত্থাপন করলে স্পীকার তার সাথে দ্বিমত পোষন করে। অর্থাৎ সদস্যদের অন্যায়ের কোন শাস্তি ভোগ করতে হয় না।

[১২] H. Finer, *The Theory Of Practice Of Modern Government*, London: Pall Mall Press 1962, P-592.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ঃ জাতীয় সংসদ হল জনপ্রতিনীধিত্বশীল সংস্থা এবং জনগণের অর্থেই এটি পরিচালিত। জনগণ সংসদ সদস্যদের নির্বাচিত করা এবং রাষ্ট্রের সেবা অর্থাৎ জনকল্যাণ করার জন্য তাই সংসদের প্রতিটি মুহুর্তই গুরুত্বপূর্ণ এই সময় সদস্যদের উচিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, মূল ইস্যু অর্থাৎ দিনের নির্ধারিত কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করা। কিন্তু ৫ম সংসদ এ কাজ সুষ্ঠভাবে করতে পারেনি। সংসদ ও বিরোধী উভয় সদস্যরাই অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে বক্তৃতা ও তর্ক বিতর্ক করেন, ব্যক্তিগত আক্রোশ দেখান এবং একে অপরের অতীত ইতিহাস নিয়ে অহেতুক টানাটানি করেন, যার কোন যুক্তিকতা ছিলনা। কারণ সকল দলের অতীতই হলো দুঃশাসনের ইতিহাস অথচ বিএনপি তার শাষণামলের গুণ গায় ও আওয়ামী লীগের বদনাম করে। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগও ঠিক একাজ করেছে। অর্থাৎ মূল ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে খুব কম। এজেন্ডা বা দিনের কর্মসূচীর বাইরে অনির্ধারিত বিতর্ক হয়েছে। দেখা যায় যে, বেশ কটি অধিবেশনে অনির্ধারিত বির্তকের সূচনা করেন প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগ।

"এই দলের সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তার উত্তরাঞ্চলের বেতার সফর শেষে সংসদে উপস্থিত হয়ে তথাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশ করলে অনির্ধারিত এক বিতর্ক আরম্ভ হয় এবং সংসদের পরিবেশও ঘোলাটে হয়ে উঠে। স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী বহু চেষ্টা করেও রোধ করতে পারেনি এই বিতর্ক। তিনি মাঝে মাঝে এমন মন্তব্য করেছেন যে, এই সংসদ চালানো সত্যিই কঠিন ব্যাপার।"[১৩]

সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বেও মন্ত্রিরা প্রায় উপস্থিত থাকতেন না এবং উপস্থিত থাকলেও নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় টেনে আনতেন। মন্ত্রীরা তার বিভাগীয় কাজে দক্ষ না হওয়ায় তার উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারেননি। প্রায় ক্ষেত্রেরই দেখা গেছে যে, অর্থমন্ত্রীর পক্ষে উত্তর দিয়েছেন তার প্রতিমন্ত্রী মজিবুর রহমান। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি সরকারী ব্যাংকের নাম বলতে পারেন নাই যা ছিল লজ্জা জনক। এভাবে প্রতিটি অধিবেশনই দায়সারা ভাবে সম্পন্ন হয়।

[১৩] Weekly Dhaka Courier, 24, November, 1995.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থত ঃ একটি সংসদ তখনই দায়িত্বশীল ও গণতান্ত্রিক হবে যখন এর সদস্যরা সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল সদস্যের জবাবদিহীতা সংসদীয় গণতন্ত্রের সফলতার পূর্ব শর্ত। ৫ম সংসদে এই জবাবদিহীতার প্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করা হয়নি। এজন্য প্রয়োজন ছিল সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির সংশোধন। সংসদের কাছে মন্ত্রী সভা কিভাবে জবাবদিহী করবে সে ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ভারত ও বৃটেনে দেখা যায় যে, মন্ত্রীসভা যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় তখন আইন সভা বা সংসদের অনুমোদন নিতে হয়। ফলে তারা সেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে না। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীপরিষদ সংসদের মধ্যে এখানেই পার্থক্য। ৫ম সংসদের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের অনেক সিদ্ধান্তই সংসদের অনুমতি নিয়ে করা হয়নি বরং সিদ্ধান্ত নেবার পরে সংসদকে জানানো হয়েছে। অথচ ভারতে নরসীমারাও সহ অন্যান্য প্রধানমন্ত্রীগণ যে কয়বার বিদেশ সফরে গেছেন প্রত্যেকবারই লোকসভার অনুমোদন নিয়েছেন। এবং ফিরে এসে সংসদ সম্পর্কে খুটিনাটি সব তথ্য দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কমনওলেথ শীর্ষ সম্মেলন হারারের কথা উল্লেখ করা যায়। এভাবে মন্ত্রীদের ও অন্যান্য সংসদ সদস্যদের আয় ব্যয়ের হিসাব, প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তৎপরতার হার ও অনেক খুটিনাটি তথ্য সংসদকে দেওয়া হয়নি এবং সংসদও এ ব্যাপারে কোন চ্যালেঞ্জ করেনি। " সংসদের কাছে দায়ী না থেকে পূর্বে জবাবদিহী করতেন রাষ্ট্রপতির কাছে এখন করেন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর কাছে। জবাবদিহিতা নয় কেবল প্রধানমন্ত্রীর আনুগত্য ও আস্থা অর্জনই সব কিছু হয়ে দাড়িয়েছে।"[৬৪]

*হাসানুজ্জামান, *নবপ্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা*, অক্ষর . ৪ নিউ সার্কুলার রোড . ১৯৯২ পৃষ্ঠা-৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমত: বাজেট হলো সরকারের এক বছরের অর্থনৈতিক নীতিমালা ও কর্মকান্ডের এক সুস্পষ্ট রূপরেখা। এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ করা হলো এবং এর ভিত্তিতে কোনখাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হলো। ৫ম সংসদের পূর্বে ২০ বছরে ২০ টি বাজেট পাশ করা হয়েছে। কিন্তু এর কোনটিতেই অর্থনৈতিক অবকাঠামোর কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। কিছু লোকের হাতে সম্পদ জমা হয়েছে মাত্র । যার জন্য আপামর জনগনের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। অর্থনীতিবিদদের মতে, Budget in our country is a continuing processes of pauperisation of our people . মূলত বাজেট তৈরীর ক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষ্যনীয় । প্রথমত: নীতি কি ভাবে নির্ধারিত হচেছ এবং কারা এই নীতি নির্ধারণ করছে। দ্বিতীয়ত: বাজেটের খসড়া তৈরী করছে কারা । যদি দেখা যায় যে এই দুই দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি তাহলে আগামী বাজেটে এমন কিছু প্রত্যাশা করার নেই যে পূর্ব ঐতিহ্য ভঙ্গ করে নতুন কোন অবদান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বা জনগনের জীবনে রাখতে পারে ।[১৫] ৫ম সংসদের সব গুলি বাজেটেই সামরিক ও শিক্ষা খাতে বেশি বরাদ্দ করা হয় । এই দুটি হলো অনুৎপাদনশীল খাত । বাজেটের অন্যতম কাজ হলো জনগনের আয়ের পূণ বন্টন । ভ্যাটের মাধ্যমে নতুন ভাবে কর আরোপ বিএনপি সরকারের একটি ভাল উদ্যোগ হলেও এর বোঝা সাধারণ অল্প আয়ের মানুষকেই বহন করতে হয় । খাদ্য সামগ্রীসহ নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসের উপর কর ধার্য করলে ১ টি জিনিসের দাম যদি পাচঁ টাকা বাড়ে তাহলে সেই চাপ এক জন অল্প আয়ের মানুষের উপর যে ভাবে পড়ে এক জন উচচ আয়ের মানুষের উপর সে ভাবে পড়ে না। তাই দেখা যায় সাধারণ ক্রেতার কাছে যেটা প্রবল চাপ ধনীদের কাছে সেটা লঘুচাপ। সে জন্য বাজেটে ধনীদের আয়ের উপর এবং তারা যে জিনিস ব্যবহার করে তার উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপ করা উচিৎ ।

ষষ্ঠত: সংসদীয় রাজনীতিতে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় সংসদের ভিতর থেকে, রাজপথে হরতাল অবরোধ বা ভাংচুরের মাধ্যমে নয়। অথচ ৫ম সংসদে দেখা যায় যে, বিরোধীরা সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে সংসদের বাইরে থেকে। ফলে তাদের রাজনীতি সংসদীয় রাজনীতি ছিলনা বরং সংসদ বর্জনের রাজনীতি ছিল। কারণ তারা একনাগারে সংসদ বর্জন শুরু করে ত্রয়োদশ অধিবেশন থেকে। তবে

[১৫]. বদরুদ্দিন উমর , *বাংলাদেশে গনতান্ত্রিক বৈরাতন্ত্র, বাংলা বাজার,* ঢাকা ১১০০, ১৯৯৪ , পৃষ্ঠা-৫৭

Dhaka University Institutional Repository

এর আগেও সংসদে উপস্থিত থাকলেও কোন অধিবেশনই সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে দেয়নি। প্রতিদিনই ওয়াক আউট এবং বয়কটের ঘটনা ঘটেছে। বিরোধী ১৩টি অধিবেশনে অয়াকআউট করে ৯১ বার। ৯১ সালে ৩টি অধিবেশনে তারা ১৩ বার ওয়াকআউট করে। উল্লেখ্য ৫ই এপ্রিল '৯১, ১ম অধিবেশনেই ওয়াকআউট ঘটে। সংসদের কার্য্যউপদেষ্টাদের তালিকায় বিরোধী নেত্রীর নাম ৬ নম্বরে থাকার জন্য এই ওয়াকআউটের ঘটনা ঘটে। ২য় ওয়াকআউট ঘটে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সেই সময় সংঘটিত সহিংস ঘটনা নিয়ে মূলতবী প্রস্তাব গ্রহণ না করার প্রতিবাদে। '৯৫ সালের ৪টি অধিবেশনে ১০ বার ওয়াকআউট হয়েছে। কারণ ছিল গোলাম আজমের বিচার দাবী, সন্ত্রাস দমন আইন বাতিলের দাবী ও ইউনিয়ন পরিষদ বিল নিয়ে। '৯৩ সালের ৫টি অধিবেশনে ওয়াকআউট হয় ২৬ বার। কারণগুলি ছিল টিভি রাউন্ড আপে বিকৃত তথ্য পরিবেশন, মিরপুর উপনির্বাচনে বিধিলংঘন ও ফলাফল নিয়ে মিডিয়া ক্যু, ৭ই মার্চ রেডিও ও টিভিতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করা নিয়ে আলোচনা কালে মাইক না দেয়া, আওয়ামীলীগ সাংসদ আওরঙ্গের আটকাদেশের প্রতিবাদে, বিধি বর্হিভূতভাবে জ্বালানী মন্ত্রীকে বিবৃতিদানের সুযোগ দানের জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটির সমাবেশে হাওলার প্রতিবাদে কৃষি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত দুর্নীতি তদন্ত কমিটি গঠনের দাবীতে। '৯৪ সলে ১ম অধিবেশনে ২দফা ওয়াকআউট করে বিরোধী দল। এই দু'টি হল সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনোত্তর বিজয় মিছিলে সহিংস ঘটনায় শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং হেবরনে সংগঠিত হত্যাকান্ড সম্পর্কিত বিতর্ককালে তথ্য মন্ত্রীর একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে।[১৬] সংসদীয় ব্যবস্থায় এধরণের কাজ স্বীকৃত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, যখন তখন সংসদ বর্জন করে একে অচল করে দিতে হবে। সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের যে শক্তিশালী গঠনমূলক ভূমিকা থাকে সেটি পালনে আওয়ামী লীগ সহ সকল দলই ব্যর্থ হয়েছে। " ওয়াক আউট কাংখিত নয় তবু তা সদস্যদের অধিকার বলে স্বীকৃত। ওয়াক আউটের ফলে সংসদের কার্যক্রমের বাধাসৃষ্টি হয়। সাধারণ ভাবে কোন বিষয়ের প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে ওয়াক আউট করা হয়। অতিরিক্ত ওয়াক আউট সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতার পরিবেশ অনুপস্থিত এটাই প্রমাণ করে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য বেশী হলে ওয়াক আউট বেড়ে যায়। বাংলাদেশের ৫ম সংসদের রেকর্ড পরিমান ওয়াক আউটের ঘটনা ঘটে।"[১৭]

১৬. সংবাদ, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪

১৭. মাহমুদ শফিক, জনগন সংবিধান নির্বাচন, ১৯৯৬, পৃষ্ঠাঃ ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

৫ম জাতীয় সংসদে অধিবেশন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিমান গত ভাবে সফল হলেও গুণগত মান সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারেনি। একথা ঠিক যে, এই সংসদ দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত রচনা করে। বিগত ৫ বছরে ৫ম সংসদে ২২টি অধিবেশনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যায়ে বিএনপি জাতীয় সংসদকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করে এবং সংসদকে সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বর্ণনা করে। কিন্তু তারা এ কাজে বিরোধী দলের আস্থা অর্জনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। বিরোধী দলের সম্মিলিত পদত্যাগের ফলে সুপ্রিমকোর্টের স্মরনাপন্ন হওয়া, বিধিমোতাবেক উপনির্বাচন ঘোষণা, সংবিধানে নাই বলে বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবীর বিরোধীতা প্রভৃতি চেষ্টার পর সংবিধান মোতাবেক সংসদ বিলুপ্তির ঘোষণা ইত্যাদি ছিল ক্ষমতাসীন বিএনপির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার প্রয়াস। তাদের উচিত ছিল বিরোধী দলের পদত্যাগের সাথেই সংসদকে ভেঙ্গে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচন দেওয়া। তারা জনমতকে উপেক্ষা করে স্বৈরাচার সরকারের মতই একটি অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ সংসদ গঠন করে জনপ্রিয়তাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল ৫ম সংসদে উত্থাপন করা ছিল গণতান্ত্রিক সম্মত। বিশেষজ্ঞদের মতে পদত্যাগের পরবর্তী অধিবেশনের কার্যক্রমগুলি ছিল অবৈধ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২। কমিটি ব্যবস্থা ও কার্যক্রম ঃ- "If parliamentary government is considered that parliament is a balance to the government able to criticise service initiate and investigate then parliament requires some independent means for carrying out its function and the committee system can serve usefull purpose in this regard" [১৮] - গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদগুলোর কর্মকান্ডে একটি প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ন উদ্ভাবন হলো এই কমিটি ব্যবস্থা। উন্নত বিশ্বে কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠু আইন প্রনয়ন এবং সরকারের দায়িত্বশীলতা বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কমিটি গুলি বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন ষ্ট্যান্ডিং কমিটি, সিলেক্ট কমিটি, পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি, স্থায়ী কমিটি। এই কমিটি গুলির আবার বিভিন্ন রকম উপ বা সাব কমিটি থাকতে পারে। কমিটি গুলির গুরুত্বপূর্ন কাজগুলি হলো -

১) আইন পরিষদের পূর্ন অধিবেশনে পেশকৃত সকল বিল ও অন্যান্য বিষয়ের উপর পুংখানুপুংখ বিচার বিশ্লেষন করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনা। তাই শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে আইনের খুটিনাটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এই কমিটির মাধ্যমে। "মূল্যবান সংসদীয় সময় বাঁচানো এবং জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতার পূর্নাঙ্গ ব্যবহারের লক্ষ্যে সাংসদগন বিভিন্ন কমিটি এবং উপকমিটিতে বিভক্ত হয়ে সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করেন। সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার পক্ষে একটা মৌলিক যুক্তি হচ্ছে আইন পরিষদ গুলির প্রধান কার্যাবলী কি তা নির্ধারন করা ।[১৯]

২) এর মাধ্যমে সংসদ সদস্যরা চলমান রাষ্ট্রীয় কার্যবলী সঠিক ভাবে পর্যালোচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারন ও প্রশাসকদের কাছে অসংখ্য প্রশ্ন তুলে ধরতে পারেন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন।

১৮. Koland Young , *The British Parliament*, 1962, page-22.

১৯. Allen R. Ball, *Modern Politics & Government*, London, The Macmillan Press Ltd, 1981, page – 156.

Dhaka University Institutional Repository

৩) নির্বাহী বিভাগ তথা সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কমিটি ব্যবস্থা আইন পরিষদের বিশেষ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ সঠিক সময়ে সংসদে বিলের রিপোর্ট পেশ করে । তবে তারা বিলের মৌল নীতি পরিবর্তন করতে পারেনা।

বাংলাদেশের সংবিধানে আইন সংক্রান্ত কাজের জন্য সংসদীয় কমিটি সমূহ গঠনের বিধান রয়েছে। সংবিধানের ৭৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদকে সংসদীয় বিধি অনুযায়ে পাবলিক একাউন্ট কমিটি সহ অন্যান্য ষ্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সংসদের কার্য প্রনালী বিধির ২৭ তম অধ্যায়ের ১৮৭ থেকে ২১৬ ধারা গুলোতে কমিটি সমূহের গঠন, কাজ ও কর্ম পদ্ধতির বিশদ বিবরন আছে। সংসদীয় কমিটির সম্ভাব্য ভূমিকা ও সুবিধা বহুবিধ হতে পারে। যেমন, সংসদীয় কমিটিগুলো কেবলমাত্র প্রশাসনিক দক্ষতার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে না বরং ইহা পূর্ববর্তী প্রশাসনিক সিস্টেমের অভ্যন্তরীন ত্রুটি গুলিও দূর করতে সহায়তা করে। " The widespread use of committees is justified on the grounds that they are capable of offering MPs a variety of rewards and opportunities, such as encouraging than to build up more specializd knowledge of policy areas, providing a means of keeping them busy and feeling useful and granting them more active and rewarding particpation in the governing process".[২০]

অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সংসদীয় বিধিমালা প্রতিটি মন্ত্রনালয়ের জন্য ষ্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনে নির্বাহী বিভাগের কর্মকান্ড পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে এবং বিল সহ অন্যান্য বিষয় পরীক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রগামী বলে প্রতীয়মান হয়। এসব কমিটি মাসে অন্তত একবার বসে প্রশাসনিক বিষয় পর্যালোচনা করার কথা। বাংলাদেশের সংসদে ত্রিবিধ কমিটি বিদ্যমান। মূলত তাদের স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে এই প্রকারভেদ হয়ে থাকে। এগুলি হলো ষ্ট্যান্ডিং কমিটি, সিলেক্ট কমিটি ও স্পেশাল কমিটি। পঞ্চম সংসদে ৫২টি সংসদীয় কমিটি ও ৬৩টি উপ-কমিটি গঠিত হয় । ৫ বছরে এগুলির ১৬৫৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে কমিটিগুলো কের মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ-

[২০] N. Ahmed, Committees in the Bangladesh Parliament. *Legislative Studies*, 1998, Voll-13, No-1, Page-79.

Dhaka University Institutional Repository

নং	কমিটির নাম	কমিটির সংখ্যা
	স্ট্যান্ডিং কমিটি	৪৫
১.	মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত কমিটি	৩৪
২.	অর্থ সম্পর্কিত কমিটি	০৩
৩.	নিরীক্ষা কমিটি	০১
৪.	অনুসন্ধান কমিটি	০২
৫.	সার্ভিস কমিটি	০২
৬.	হাউস কমিটি	০৩
	সিলেক্ট ও স্পেশাল কমিটি	
১.	বিল সম্পর্কিত কমিটি	০৫
২.	বিশেষ কমিটি	০২
	মোটঃ	৫২টি

সূত্রঃ সিরাজ আহম্মদ খান, মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, আনম মুসির আহম্মেদ, জবাবদিহিতা, নীতি নির্ধারন ও সংসদীয় কমিটি, বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, উন্নয়ন বিতর্ক, ত্রৈমাসিক জার্নাল, অষ্টাদশ বর্ষ, জুন-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৭৫।

জাতীয় সংসদের ষ্ট্যান্ডিং কমিটির বিভিন্ন ভাগ ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :-

মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত কমিটি	অর্থ এবং নীরিক্ষা কমিটি	অন্যান্য ষ্ট্যান্ডিং কমিটি	বিশেষ কমিটি	মোট
প্রতিটি মন্ত্রনালয়ের জন্য ষ্ট্যান্ডিং কমিটি	পাবলিক একাউন্টস এষ্টিমেট এবং পাবলিক আন্ডার টেকিং কমিটি	পিটিশন সুবিধাদি সরকারী প্রতিশ্রুতি কার্জ-উপদেষ্টা প্রাইভেট সদস্য বিল রুলস হাউজ এবং লাইব্রেরী কমিটি	বিশেষ বিষয়ে গঠিত কমিটি	
৩৪	৩	৮	৭	৫২

সূত্র : বাংলাদেশ পার্লামেন্ট সচিবালয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ছকে বর্ণিত পাবলিক একাউন্টস কমিটি সংসদের অনুমোদিত সরকারী বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষা করে এবং এসব ক্ষেত্রে সরকারী দপ্তর সমূহের অসঙ্গতি তুলে ধরে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে। এষ্টিমেট কমিটি সম্পন্ন অর্থ বৎসরের অনুমিত হিসাব পরীক্ষা করে এবং অর্থনীতি ও প্রশাসনের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে অন্যান্য কমিটি গুলি পিটিশনে প্রদত্ত নির্দিষ্ট অভিযোগ সাংসদগনের অধিকার ও দায় মুক্ততা ; মন্ত্রীগন প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং অঙ্গীকার সরকারী বিলের সময় বরাদ্দ। বেসরকারী সদস্যগনের প্রস্তাবিত বিল প্রভৃতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। ৫ম সংসদে কমিটি গুলোর পেশকৃত রিপোর্টের বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হলো ঃ-

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	রিপোর্টের সংখ্যা
১।	পাবলিক একাউন্টস	৩
২।	সরকারী প্রতিষ্ঠান	২
৩।	বিশেষ অধিকার	৮
৪।	বুলস	১
৫।	পিটিশন	১
৬।	আইন ও সংসদীয় বিষয়	১
৭।	জাহাজ (শিপিং)	১
৮।	শিক্ষা	১
৯।	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন	১
১০।	২২৬ নং বিধি মোতাবেক গঠিত বিশেষ কমিটি	১

সূত্র: পার্লামেন্ট সচিবালয়,১৯৯৪।

পঞ্চম সংসদে এপ্রিল ৯১ হইতে ডিসেম্বর ৯৪ পর্যন্ত মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত ৩৪টি কমিটি গড়ে বৎসরে বৈঠকে বসেছে ৭ বার এবং মোট রিপোর্ট দিয়েছে ১৩টি। আর্থিক কমিটির রিপোর্টের সংখ্যা ৬, বৈঠকের সংখ্যা ১১। অন্যান্য স্থায়ী কমিটির বৈঠকের সংখ্যা ২২, রিপোর্টের সংখ্যা ৫। বিল সম্পর্কিত কমিটির বৈঠকের সংখ্যা ৩, রিপোর্ট নাই, বিশেষ কমিটির বৈঠকের সংখ্যা ২, রিপোর্টের সংখ্যা শুন্য। সার্বিক হিসাবে দেখা যাচেছ কমিটিগুলি বছরে মাত্র ৮বার বৈঠকে বসেছে এবং উক্ত সময়ে গড়ে সদস্যদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৬০ শতাংশের কাছাকাছি।[২১]

[২১] নিয়াজ আহম্মদ খান, মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, আনম মুনির আহম্মেদ, জবাবদিহিতা, নীতি নির্ধারন ও সংসদীয় কমিটি, বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, *উন্নয়ন বিতর্ক, ত্রৈমাসিক জার্নাল,* অষ্টাদশ বর্ষ, জুন-১৯৯৯, পৃষ্টা-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে দেখা যায় যে, পঞ্চম সংসদের কমিটির রিপোর্ট এবং সুপারিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়িত হয় নাই। কেননা কমিটিগুলির বিভিন্ন সভা আহুত হলেও শেষ পর্যন্ত সঠিক সময়ে সংসদ রিপোর্টগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বা পরামর্শ দিতে পারেনী। এক্ষেত্রে পাবলিক একাউন্টস কমিটির উদাহরণ দেওয়া যায়। ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে পাবলিক একাউন্টস কমিটির ৩য় রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে অনেক ক্ষেত্রেই এর সুপারিশগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয় না এবং কিছু ক্ষেত্রে একদম বাস্তবায়িত হয়না। অধিকন্তু মন্ত্রনালয়ের অডিট আপত্তি নিরসন সহ অতিরিক্ত ব্যায় অনুমোদনে অনীহা প্রদর্শন করে এবং এভাবে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা বন্ধ করতে কমিটির নির্দেশ বা সুপারিশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। উক্ত রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় যে শুধু অতীতের হিসাব এবং প্রতিবেদন পরীক্ষা করা বা সুপারিশ করা অর্থহীন কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। এসব কারনে বলা যেতে পারে যে যুক্ত রাজ্য বা ভারতের ন্যায় বাংলাদেশের পাবলিক একাউন্টস কমিটি যথেষ্ট কার্যকর হতে পারেনি এবং এর মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা বা জবাব দিহিতা নিশ্চিত হয়নি।[২২] এছাড়া বিশ্ব বিদ্যালয় গুলিতে সন্ত্রাস নির্মূলের উদ্দেশ্যে সুপারিশ তৈরীর দায়িত্ব প্রাপ্ত কমিটি ও কোন সাফল্য দেখাতে পারেনি। কেননা নিজস্ব দলীয় ছাত্র সংগঠনের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কেউই পদক্ষেপ নিতে রাজী হয়নি বলে ঐ কমিটি কোন ঐক্যমত্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। এভাবে দেখা গেছে যে সুনির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে টার্মস অব রেফারেন্স মেনে চলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান , সুপারিশ তৈরি প্রভৃতি কাজে কমিটি গুলি ব্যর্থ হয়েছে।

[২২] আলমাসুদ হাসানুজ্জমান , "বাংলাদেশে কমিটি ব্যবস্থা", মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত "*সংসদ*" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা - ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

ষ্ট্যান্ডিং বা স্থায়ী কমিটি গুলি স্থায়ী ভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা মন্ত্রনালয় সম্পর্কে কাজ করে বলে এর সদস্যরা এর সকল দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে। কিন্তু এই কমিটি গুলির প্রধান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা থাকায় তারা কমিটির কার্যকলাপ বিভিন্ন কৌশলে নিজেদের অনুকুলে নেওয়ার চেষ্টা করে যার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুপারিশ বাস্তবায়িত করা হয়না । যেমন কৃষি ও সেচ মন্ত্রী সহিদুল হকের বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করা হয় এবং এজন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় কিন্তু মন্ত্রিদের হস্তক্ষেপের জন্য অনেক বার বৈঠক হবার পরও টার্মস অব রেফারেন্স প্রনয়ন করতে ব্যার্থ হয়। অন্য আরেকটি কমিটিতে জেলা পরিষদের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন সম্ভব হয়নি। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বিলের উপর গঠিত বিশেষ কমিটিও কোন চুড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করতে পারেনি। সংসদীয় ব্যবস্থার উপযোগী নতুন বিধিমালা প্রনয়নে গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটি বিভিন্ন বৈঠক করেও ঐকামতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। [২৩] এই জন্য জনাব সামসুল হুদা হারুন স্থায়ী কমিটি গুলিকে ঝষববঢ়রহম ঈড়সসরঃঃবব বলে উল্লেখ করেছেন। এসব সংসদীয় কমিটি সমূহের অকার্যকারীতার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সার্বিক ভাবে কমিটি ব্যবস্থার উপর এবং সংসদ কতৃক সরকারের জবাবদিহিতা অর্জনের প্রক্রিয়া অনুপস্থিত থেকে যায়।

জাতীয় সংসদের সকল সদস্য দেরই কমিটি ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এবং ৩৩০ জন সদস্য প্রত্যেকেই অন্তত একটি কমিটির সদস্য। ৫ম জাতীয় সংসদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচেছ এতে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত বিরোধী দলের উপস্থিতি আছে। আগের সংসদ গুলোতে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় ট্রেজারী বেঞ্চের বিশেষ সুবিধা ছিল কিন্তু বর্তমানে সংসদে ৩৩০ জন সাংসদের ১৫৭ জনই বিরোধী দলীয় এবং তার সংসদে বরাবরই সরব থেকেছেন। [২৪]

[২৩] ভোরের কাগজ, ২২শে ফেব্রুয়ারী ৯৪।

[২৪] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫শে মে, ১৯৯৪, ।

Dhaka University Institutional Repository

তবে বিরোধী দলের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও কমিটির বিভিন্ন সিদ্ধান্তে তাদের মতামত নেয়া হয় নাই। ৫ম সংসদে দেখা গেছে যে, অনেক ক্ষেত্রেই অধ্যাদেশ জারী করার পর সংসদে বিল আকারে পেশ করা হয়েছে । এতে সংসদীয় সরকারের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে । কারন এতে বিরোধীদের অংশ গ্রহন ছিলনা, বিরোধীরা সবচাইতে বেশী ক্ষুব্ধ হন ট্রেজারী বেঞ্চের বিরুদ্ধে যখন বিশেষ কমিটিতে বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় সন্ত্রাস দমন বিলটি সংসদে পাশ করা হয়। এভাবে উক্ত অধ্যাদেশ জারী সংসদ এবং সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা খর্ব করার সমান এবং সংবিধানের নীতির পরিপন্থী বলে ব্যাপক সমালোচনা করা হয়, বিরোধীরা অভিযোগ করেন যে, সংসদীয় কমিটিগুলোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন এতে নেই বলে ষ্ট্যান্ডিং কমিটিগুলি কার্যকরী হতে পারছেনা । এবং স্বয়ং স্পিকার ও মন্ত্রীরা এর প্রধান হওয়ায় নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন হয়েছে। ৫ম সংসদে কমিটি ব্যাবস্থায় লক্ষনীয় ছিল কমিটির বৈঠকে সরকারী দলের সদস্যদের এমনকি বিরোধীদেরও সংসদে অনুপস্থিত থাকার প্রবনতা। প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা কার্য উপদেষ্টার মত গুরুত্বপূর্ন কমিটির সদস্য ছিলেন এবং স্পীকার ছিলেন এর সভাপতি। অথচ এই বৈঠকে তাদের উপস্থিতির হার ছিল খুবই নগন্য। অথচ জাতীয় সংসদের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যউপদেষ্টা কমিটির ভূমিকা সবচাইতে বেশী। জাতীয় সংসদ কার্য প্রনালীবিধির ১৯৩ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে কমিটির অনুমতি ছাড়া যদি কোন সদস্য দুই বা ততোধিক বৈঠকে অনুপস্থিত থাকে তবে উক্ত সদস্যকে কমিটি থেকে বহিস্কারের জন্য প্রস্তাব আনা যাবে। সংসদ সদস্যরা প্রধান মন্ত্রীর অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে প্রস্তাব উত্থাপন করলেও কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই। অভিযোগ করা হয়েছে যে, মন্ত্রীবর্গের বিভিন্নমূখী ব্যস্থতার কারনে কমিটি সমূহের বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়না এবং এর ফলে যোগাযোগের পার্থক্য সহ সমন্বয় সাধনে সমস্যার সৃষ্টি হয়। মন্ত্রীদের মধ্যে ও প্রবনতা রয়েছে তাদের দপ্তরের ব্যাপারে অভিযোগ গ্রহনে অনীহা প্রদর্শন করা। অনেক ক্ষেত্রে বিরুধী সদস্যগনের মতামত বা প্রস্তাবকে গুরুত্ব না দেয়া বা বিবেচনায় না ধরায় অভিযোগ করা হয়েছে।[৩৫]

[৩৫] ঢাকা কুরিয়ার, ১৩ই মার্চ , ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম সংসদে কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থায় কোন গুরুত্ব পূর্ন সাফল্য অর্জন করতে পারেনী। অর্থাৎ কমিটির মাধ্যমে সরকারের দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ষ্ট্যান্ডিং কমিটিগুলির সর্বসম্মত প্রস্তাব প্রনয়নে ব্যার্থ হয়েছে কারন কমিটিতে ছিল প্রতিদন্দ্বী দলগুলির পরস্পর বিরোধী মতামত ও সিদ্ধান্তহীনতা। এভাবে অনেক বারই বিরোধী দলের ওয়াক আউটের মুখে বিল পাশ হয়েছে। বিরোধী দল গুলি মাগুরা উপনির্বাচনে কারচুপি ও তত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে সংসদ অধিবেশন বয়কট করে এবং একই সাথে সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমে অনুপস্থিত থাকে। যার জন্য কমিটি সরকারী দলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়েছিল। এরজন্য বিরোধী দলের একগুয়েমি মনোভাব ও দায়ী ছিল। সরকার ও বিরোধী দলগুলির কোন্দল শেষ পর্যন্ত কমিটিকে অকার্যকর করে দেয় তথা সংসদীয় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিকীকরনে বাধা সৃষ্টি করে "Though structurally the Committees seemed to be quite active , operationally they were yet to prove thir effectivity," [২৬]

বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি গুলির কার্যকারীতা সীমিত ও অনুজ্জ্বল সাংসদগন নিজ নির্বাচনী এলাকার বিষয়াদি ছাড়া সরকারী কর্মতৎপরতা বা মন্ত্রনালয়ের বিশেষ কোন কাজে জবাব দিহিতা বা মূল্যায়নের প্রতি বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। " There remained a major gap betwen what was expected of the committess and the way (s) they actually fared. In particularly, they were not seen as much effecting in influencing the making of policy decisions by various ministers of promoting government wide accountabilty..... The committees in Bangladesh lag for behind their counterparts in the parliament in almost every respect. [২৭]

২৬. Nazrul Islalm , Parliamentary Democracy In Bangladesh : An Assessment, *Perspecpive In Social Science*, Vol – 5 , 1998, October.

[২৭] N.A. Ahmed , op. cit. pp.91-92.

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ জরিপের ফলাফল বিশ্লেষন

সংসদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সৃষ্ট মতবিরোধ তথা ১৯৯১ সালের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যক্রম সম্বন্ধে এই অভিসন্দর্ভে প্রশ্নমালায় বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে (১৭জন) মতামত জরিপ করা হয়। মোট ১৫টি প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত এই জরিপের মাধ্যমে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা নিসন্দেহে দেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতিফলন । নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে প্রশ্নমালা ও এর উত্তর একে একে দেখানো হলো।

টেবিল - ১

প্রশ্ন	হ্যাঁ	না	আংশিক	মন্তব্য
৯০ এর গনঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৬ বছর পর ৫ম জাতীয় সংসদে যে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সরকার কি দায়িত্বশীল সরকারের ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল?	৩৯.৪১%	৫২.৯৪%	১৭.৬৫%	
প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসাবে এই সংসদ গনতান্ত্রিক ও স্বাধীন ছিল কি না ?	৪১.১৭%	৪১.১৭%	১৭.৬৫%	
এখানে সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা সংসদীয় রীতি সম্মত ছিল কি না ?	৫.৮৮%	৭৬.৪৭%	১৭.৬৫%	
শক্তিশালী বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামীলীগের ভূমিকা সংসদীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ ছিল কি না ?	৫.৮৮%	৭৬.৪৭%	১১.৭৬%	অধিকাংশ ৫.৮৮%
বিএনপি সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত দুটি উপনির্বাচন যেমন : ঝিনাপুর ও খাগড়া উপনির্বাচনে ভোটকারচুপি ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে , অর্থাৎ অবাধ নির্বাচন হয়নি । বিরোধী দলের এই অভিযোগ কি সঠিক ?	৮৮.২৪%	৫.৮৮%	৫.৮৮%	
৫ম জাতীয় সংসদে বিরোধী আন্দোলনের মূল দাবী তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এর জন্য তাদের লাগাতার সংসদ বর্জন , হরতাল , অবরোধ, ধর্মঘট প্রভৃতি কর্মসূচী যুক্তি সংগত ছিল কি না ?	৩৫.২৯%	৫৮.৮২%		অধিকাংশ ৫.৮৮%
এই তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সঠিক ও কারচুপি বিহীন হবে । এই কথাটি সঠিক কি না ?	৫২.৯৪%	৪১.১৮%		সম্ভবা ৫.৭৮%
বিরোধীরা পদত্যাগের পর সংসদে অনুষ্ঠিত অধিবেশন গুলি কি বৈধ্য ছিল ?	৩৫.২৯%	৬৪.৭১%		
বিএনপি সরকার তত্বাবধায়ক সরকার বিল ৫ম জাতীয় সংসদে পাশ না করে একটি অযাচন যোগ্য ৬ষ্ট জাতীয় সংসদে পাশ করে স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। কথাটি কি সঠিক ?	৮২.৩৫%	১১.৭৬%	৫,.৮৮%	
৬ষ্ট জাতীয় সংসদ কি বৈধ ছিল ?	২৯.৪১%	৭০.৫৯%		
যদি ৬ষ্ট জাতীয় সংসদ অবৈধ্য হয়ে থাকে তবে উক্ত সংসদে পাশ কৃত তত্বাবধায়ক সরকার বিলটিও অবৈধ। কথাটি কি সঠিক ?	৪১.১৮%	৪৭.৬%		প্রযোজ্য নয় ৫.৮৮%

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল - ২

প্রশ্ন	সরকারীদল	বিরোধীদল	উভয়ের	মন্তব্য
যদি স্থায়িত্বশীল সরকারের ভূমিকা পালন করতে না পারে তবে সেই ব্যর্থতার দায়ভার কার বেশী।	৫.৮৮%	৫.৮৮%	৭৬.৪৭%	উত্তর দেয়নাই ৫.৮৮%
				প্রযোজ্য নয়? ৫.৮৮%
যদি তাদের পদত্যাগে সংসদ অকার্যকর হয়ে পড়ে তবে এর জন্য দায়ী কে ছিল?	১১.৭৬%	৫.৮৮%	৮২.৩৫%	

টেবিল-৩

প্রশ্ন	সম্পূর্ন	আংশিক	একেবারেই পারেনি
'৯০ এর গণ-অভ্যুত্থানের ৩ জোটের কাকে আওয়ামীলীগ ও বিএনপি গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সরকার গঠন করার পর সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা কতটুকু কাজ করতে পেরেছিল ?		৮৮.২৮%	১১.৭৬%

টেবিল নং ৪

প্রশ্ন	প্রথম	দ্বিতীয়	কোনটাই না	মন্তব্য
বাংলাদেশের প্রথম সংসদীয় সরকার (৭২-৭৫) এবং দ্বিতীয় সংসদীয় সরকার (৯১-৯৬) এর মধ্যে কোনটি দায়িত্বশীল ও জবাবদিহি সরকারের ভূমিকা পালন করে।	৫.৮৮%	৩৫.২৯%	২৩.৫৩%	উত্তর দেয়নাই ২৯.৪১%
				দুটোই আংশিক ৫.৮৮%

উপরের টেবিল সমূহে প্রদত্ত মতামত, জরিপের ফলাফল বিশ্লেষন নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

১. ১৯৯০ এর গনঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৬ বৎসর পর ৫ম জাতীয় সংসদে যে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সরকার কি দায়িত্বশীল সরকারের ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল ?

এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে বেশীরভাগ উত্তরদাতা মনে করেন ৯০এর গন অভ্যুত্থানের মাধ্যমেদীর্ঘ ১৬ বছর পর ৫ম জাতীয় সংসদে যে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সরকার দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়নাই। মাত্র ২৯.৪১% উত্তরদাতা এক্ষেত্রে হ্যাঁ বোধক জবাব দেন। বাকী ১৭.৬৫% মনে করেন ৯১-৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এক্ষেত্রে আংশিক সফলতা লাভ করেছিল।

" রাজনীতিতে যে সহঅবস্থান প্রয়োজন, বিরোধীদলকে বা সরকারী দলকে যে গ্রাহ্য করার মানবিকতা - তা আমাদের দেশে নাই । আর নেই বলেই দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও সংসদ এখানে পরিপূর্ন ভাবে কাজ করছে বলা যাবে না।" [২৮]

২৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ২০শে নভেম্বর, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

২. উত্তর দাতাদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল যদি স্থায়িত্বশীল সরকারের ভূমিকা না পালন করতে পারে তবে সেই ব্যর্থতার দায়ভার কার বেশী ?

৯০এ গনঅভ্যুত্থানের পর নির্বাচিত সরকারের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে ব্যার্থতার দায়ভার (৭৬.৪৭%) বেশীরভাগ উত্তর দাতার মতে সরকার এবং বিরোধী উভয় দলের উপর বর্তায়। এ ক্ষেত্রে কৌতুহল উদ্দীপক ভাবে ৫.৮৮% উত্তর দাতা সরকারীদলকে এবং একই সংক্ষক উত্তরদাতাবিরোধী দলকে দায়ী করেন।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসাবে এই সংসদ গনতান্ত্রিক ও স্বাধীন ছিল কি না?

৪১.১৭% উত্তরদাতা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসাবে ৯০এর গণঅভ্যুত্থানের পরে নির্বাচিত সংসদকে গণতান্ত্রিক ও স্বাধীণ মনে করেন এবং একই সংখ্যক উত্তরদাতা একে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক মনে করেন না। অপরদিকে মাত্র ১৭.৬৫% উত্তরদাতা এসংসদকে আংশিক গনতান্ত্রিক ও স্বাধীন মনে করেন।

৪. এখানে সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা সংসদীয় রীতি সম্মত ছিল কি না?

সরকার ও বিরোধীদলের ভূমিকা সংসদীয় রীতিসম্মত ছিল কি না, ব্যাপারে (৭৬.৪৭%) অধিকাংশ উত্তরদাতা না বোধক উত্তর দেন যা বাস্তব সম্মতমনে হয়। মাত্র ৫.৮৮% উত্তর দাতা সরকার ও বিরোধীদলের ভূমিকা সংসদীয় রীতি সম্মত ছিল বলে মনে করেন। আর মাত্র ১৭.৬৫% উত্তরদাতা সরকার ও বিরোধী উভয়ের ভূমিকাকে আংশিক ভাবে সংসদীয় রীতি সম্মত বলে মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার গঠনকারী প্রতিটি দলই (আওয়ামীলীগ, জাতীয় পার্টি, বি.এন.পি.) ব্যক্তির ইমেজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে বিধায় ব্যক্তি কেন্দ্রীক দল হয়ে উঠে। সকলের মতামতকে প্রধান্য না দিয়ে নেতা বা নেত্রী যা বলেন সেটাই দলের সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হয়। ৭২ সালে আওয়ামীলীগ নেতা হিসাবে শেখ মুজিব এর ক্যারিজমেটিক নেতৃত্ব দলের প্রাতিষ্ঠানিকী করনে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে দলটি সংসদীয় সরকার পরিচালনায় ব্যর্থ হয়। ৭৮ সালে বি.এন.পি ও ৮২ সালে জাতীয় পার্টি যথাক্রমে জিয়া ও এরশাদের ইমেজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। একই ভাবে ৯১ সালের সংসদীয় ব্যাবস্থায় সরকারী দল বিএনপি এবং প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগ খালেদা জিয়া ও হাসিনার ব্যক্তিগত ইমেজ থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। দলের ভেতর গনতন্ত্রের চেতনা থাকায় তারা সংসদীয় সরকার পরিচালনায় সম্পূর্ন ব্যর্থ হয়। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তেই রাষ্ট্র পরিচালনা হতো, সংসদের মতামতের প্রাধান্য দেয়া হতো না। তিনি রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে নয় বরং দলের চেয়ার পারসন হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব খাটাতেন। এভাবে সবকিছুতেই দলীয় করন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশে প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারী করে সংসদের বাইরে থেকে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত সাহস কারও ছিলনা। দল হিসাবে আওয়ামীলীগের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত মজবুত থাকলেও প্রতিষ্ঠানের উর্দ্ধে হাসিনার ইমেজকে বড় করে দেখা হয়। ৯১ এর নির্বাচনে "ভোট ডাকাতি ও সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে" নেত্রী হাসিনার এ কথার প্রতিবাদ করল দলের প্রধান সদস্য ডঃ কামাল হোসেন কে দলের সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। ঠিক একই ভাবে তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদাকেও বিএনপির সদস্য পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় দলের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য । এভাবে দেখা গেছে যে প্রধান দলগুলি তাদের নেতা কর্মীকে বহিস্কার করছে দলের বাইরে কথা বলার জন্য । বাংলাদেশ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ উল্লিখিত নীতির জন্যই দলগুলি গনতান্ত্রিক না হয়ে স্বৈরাচারী ভূমিকা পালন করছে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় গনতন্ত্র কার্যকর হওয়া না হওয়া নির্ভর করে বহুদলীয় ব্যবস্থার পরিচালনা ও কার্যক্রমের উপর । কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো আমাদের সংবিধানে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রন ও সংগঠন রেজিষ্ট্রেশন করার বিষয়ে কোন শর্ত নাই। শুধু আমাদের সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দল সম্পর্কে একটি রেফারেন্স আছে। এখানে বলা হয়েছে কোন নির্বাচনে কোন দলের প্রার্থী রূপে মনোনিত হয়ে কোন ব্যাক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি উক্ত দল থেকে পদত্যাগ করেন অথবা সংসদে উক্ত দলের বিরুদ্ধে ভোট দান করেন তাহলে তার আসন শূন্য হবে। আমাদের সংবিধান এক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও ভারতীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে অনুসরন করেছে, যেখানে রাজনৈতিক দল গুলির জন্ম, বিকাশ অথবা ধ্বংস, রাজনৈতিক দলের নিজস্ব গতিশীলতা ও রাজনৈতিক সংস্থার উপর নির্ভর করে। [২৯] উক্ত অনুচ্ছেদে নেতৃত্বের বিষয়টি উল্লেখ করে বলা হয় " যদি কোন সময় রাজনৈতিক দলের সংসদীয় দলের নেতৃত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে তাহা হইলে সংসদে সেই দলের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যর নেতৃত্বের দাবীদার কোন সদস্য কর্তৃক লিখিত ভাবে অবহিত হইবার সাতদিনের মধ্যে স্পিকার সংসদের কার্যপ্রনালী বিধি অনুযায়ী উক্ত দলের সকল সদস্যদের সভা আহ্বান করিয়া বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় ভোটের দ্বারা উক্ত দলের সংসদীয় নেতৃত্ব নির্ধারন করবেন এবং সংসদে ভোট দানের ব্যাপারে অনুরূপ নির্ধারিত নেতৃত্বের নির্দেশ যদি কোন সদস্য অমান্য করে তাহা হইলে তিনি (১) দফার অধিন উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দান করিয়াছেন বলিয়া গন্য হইবে এবং সংসদে তার আসন শূন্য হইবে। [৩০] সংবিধানের এই বিধান কি তাহলে সংসদীয় শাসন ব্যাবস্থার ইঙ্গিত বহন করে ? সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ কি একজন সংসদ সদস্যের নিজস্ব দায়িত্ববোধ বা তার সতন্ত্র চিন্তা চেতনার পরিপন্থী নয় "

[২৯] ৩রা জানুয়ারী, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠা দিবসে বিচারপতি মোস্তফা কামালের "Democracy and Consttutionalism & Compromise" শীর্ষক বক্তৃতা থেকে উদ্বৃত।

৩০. সাপ্তাহিক ২০০০, ৬ই আগষ্ট ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

(৫)শক্তিশালী বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা সংসদীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য ছিল কি না?

এ প্রশ্নের উত্তরে ৬.৪৭% উত্তরদাতা শক্তিশালী বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামীলীগের ভূমিকা সংসদী সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ন ছিলনা বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে ১১.৭৬% উত্তর দাতার মতে আংশিকভাবে আওয়ামীলীগের ভূমিকা সংসদীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন ছিল । ৫.৮৮% এর মতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য পূর্ন ছিল।

রাষ্ট্রপতি সরকারের সমর্থক সামরিক শাসকের অধীনে জন্ম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি.) সংসদীয় সরকারের পক্ষে রায় দিয়ে সকলের প্রশংশা অর্জন করে। ১৯৮২ সালের পর আন্দোলন, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দলের ইমেজ তৈরী, কর্মী সমর্থক গড়ে তোলার ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। যার জন্য '৯১ এ তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে জয় লাভ করে এবং এর মাধ্যমে সামরিক ছাউনিতে জন্ম গ্রহনকারী দলের গ্লানি মুছে ফেলার স্বীকৃতি লাভ করে। বি.এন.পি. অনেকগুলি অর্জনকে ঝুলিতে নিয়েই নব্বই এর দশকে প্রবেশ করেছে এবং দেশের চলতি রাজনৈতিক দলের ধারায় প্রবাহিত স্রোতে মিশে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে '৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বি.এন.পি. নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করে।[৩১] ক্ষমতাসীন হবার পর বি.এন.পি. কে অধিকাংশ আয় ব্যয় করতে হয়েছে সরকার পরিচালনায়। যার জন্য সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সময় দিতে পারেনি। মন্ত্রী সহ অনেকেই প্রথমবারের মত সরকারী দায়িত্ব পালন করায় বিরোধীরা বিকল্প কর্মসূচি কি হবে বা তারা কিভাবে এতে অংশ গ্রহন করবে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট ছিল না। থানা ও জেলা পর্যায়ে তাদের নেতৃত্বের সংকট দেখা যায়। নতুন বিশ্ব অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মুক্ত বাজার ও মুক্ত বিনিয়োগে আগ্রহী হয় কিন্তু তাদের গঠনতন্ত্রে ছিল মিশ্র অর্থনীতির কথা এবং সংসদীয় সরকার তাদের গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। এ জন্য ৯৩ সে কাউন্সিল অধিবেশনে এ সবদিক লক্ষ্য রেখে তাদের নীতি ও গঠনতন্ত্রে আমুল পরিবর্তন করে।

৩১ . দৈনিক ইত্তেফাক, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ সবই ছিল সরকারী দলের কিছু ভাল উদ্যোগ, কাউন্সিলের সমাপনী ভাষণে দূর্নীতি ও দলীয় কোন্দল সম্পর্কে হুশিয়ারী করে দেন প্রধানমন্ত্রী এবং '৮২ দূর্নীতির অভিযোগে নির্বাহী কমিটির সভায় ৫২ জনকে বহিঃস্কারের কথা স্মরন করেন। তবে তাদের কে সঠিক ভাবে কাজ করতে না দেওয়ার জন্য না দেওয়ার জন্য প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগকে দায়ী করেন।

অপরদিকে দেখা যায় যে, সংসদীয় সরকারের আজন্ম সমর্থক হয়েও আওয়ামী লীগ যে কোন মূল্যে এই সংসদকে কাজ করতে দিতে চায় নি। গত ৮ই অক্টোবর (১৯৯১) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় দেখা গেছে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের ভূমিকা ছিল বি.এন.পিকে বিনা চ্যালেঞ্জে কোন কিছু করতে দেবে না। প্রথম পর্যায়ে আওয়ামী লীগ অন্যান্য বিরোধী দলের সাথে আলোচনা না করে জাতীয় ঐক্যমতের প্রার্থী হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। এই মনোনয়নের বিরোধীতা করেছিল জাতীয় পার্টি, জামাতে ইসলাম ও ওয়ার্কার্স পার্টি। কোন কোন পর্যবেক্ষকের মতে " রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নিজেকে অন্যান্য বিরোধী দলের কাছে গ্রহন যোগ্য করে তুলতে পারে নি। [৩২] আওয়ামী লীগ কৌশলগত কারনে সংসদীয় সরকারের পক্ষ নিয়েও সংসদ ভেঙ্গে দেবার আন্দোলনে নামে তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে। এই আন্দোলনে প্রধান বিরোধী দল আঁতাত করে ৯০ এর স্বৈরাচারী দল জাতীয় পার্টি এবং ৭২ এর ঘাতক দালাল জামাতের সাথে। জামাতের সাথে আঁতাত করার জন্য আওয়ামী লীগ সমর্থক নীলীমা ইব্রাহিম বলেন যে, "আপনাদের কাছে বিনীত নিবেদন ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের সাথে রক্ত দিতে হলে বাঙ্গালী দিবে কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী হত্যাকারী, ধর্ষনকারীদের হস্তপূর্ন করতে বলবেন না। ক্ষমতায় আসা বড় কথা না টিকে থাকাটাই বড় কথা"। [৩৩]

৩২ সামসুর রহমান, রাজনৈতিক যেন সন্ন্যাসীদের অস্ত্রাশ্রম না হয়, *বাংলার বাণী*, ঢাকা, ৩রা নভেম্বর ১৯৯১।

৩৩ "সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৯৫"

Dhaka University Institutional Repository

বি.এন.পি. জামাতের সহযোগীতায় সরকার গঠন করলে আওয়ামী লীগ জামাত বিরোধী আন্দোলনে নামে যদিও তারা এর পূর্বে জামাতের সাথে আঁতাত করেছিল আন্দোলনের ভিত মজবুত করার জন্য । তাদের চাপে পড়ে সরকার গোলাম আজমকে গ্রেফতার করে। দেখা যায় যে, এখানে নীতি বা আদর্শ বড় কথা নয়, বড় কথা হলো ক্ষমতা। স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের জন্য যেহেতু এই সংসদ দায়ী ছিল তাই জাতীয় পার্টি এই সংসদকে সুষ্ঠু ভাবে কাজ করতে দিতে চায়নি। যার জন্য তারা প্রথম থেকেই প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সরকারী দলের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। অপরদিকে জামাত প্রথমে সরকার গঠনে বি.এন.পি.-কে সাহায্য করলেও পরবর্তীতে নিজেদের স্বার্থগত কারনে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগের সাথে যোগ দেয়।

৬. ১৯৯০ এর গনঅভ্যুত্থানের ৩ জোটের কাছে আওয়ামী লীগ ও বি. এন.পি গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সরকার গঠন করার পর সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা কতটুকু কাজ করতে পেরেছিল ?

১৯৯০ সালের গনঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত ৩ জোটের কাছে আওয়ামীলীগ ও বিএনপি গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলো, সরকার গঠন করার পর সে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আংশিক কাজ করতে পেরেছিল বলে অধিকাংশ (৮৮.২৪%) উত্তরদাতা মনে করেন। অপর পক্ষে মাত্র ১১.৭৬% উত্তর দাতা মনে করে আওয়ামীলীগ ও বিএনপি সরকার গঠন করার আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একেবারেরই কাজ করতে পারে নাই।

১৯৯১ সালের সংসদীয় সরকার ব্যাবস্থায় দলগুলি প্রথম দিকে কিছুটা গঠন মূলক ভূমিকা পালন করলেও পরের দিকে তাদের ভূমিকা ছিল গতানুগতিক। তিন জোটের কাছে দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিশ্রুতি ছিল, যেগুলির প্রয়োগ হয়নি। সংসদীয় ব্যাবস্থায় বিরোধী দল সরকারীদলের কেবল বিরোধীতা করার জন্য নয় বরং সরকারকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য। "Attack upon the government and individual ministers are the function of the opposition. The duty of the opposition is to oppose..... that duty is

Dhaka University Institutional Repository

the major check which the constitution provids upon corruption and defective administritration" [৩৪] পাশাপাশি সরকারী দলের প্রয়োজন বিরোধী দলের সমালোচনার প্রতি সহনশীল হবার। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগ ও বিএনপি সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে ঐকমতে পৌঁছলেও সরকার প্রতিষ্ঠার পর অন্যান্য মৌলিক বিষয়ে প্রধান দল দু'টির মধ্যে প্রচন্ড মতবিরোধ দেখা যায়। পারস্পারিক অবিশ্বাস দলীয় কর্তৃত্ব লাগাতার হরতাল বিরোধীদলকে গ্রহনযোগ্যতায় না আনা প্রভৃতি কারনে সংসদ অচল হয়ে পড়ে। বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা গনতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার জন্য বাংলাদেশ এডিটরস কাউন্সিল আয়োজিত "গনতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা" শীর্ষক এক মুক্ত আলোচনায় বলেছিলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার জন্য সরকার ও বিরোধী দলকে দায়িত্বশীল, সমযোতাপূর্ন পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। [৩৫] নেতা নেত্রীরা ২য় সংসদীয় সরকার কার্যকরী করার জন্য বড় বড় বক্তৃতা দেন কিন্তু বাস্তবে তার কোন প্রতিফলন দেখা যায় নি। " রাজপথ কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়। আর সংসদীয় গনতন্ত্রকে রাজপথে নিয়ে গেলে সেটা ব্যর্থ হতে যাবে"। " রাজপথ আমরা কাউকে ইজারা দেইনি' বিএনপিকে আমরা গনতন্ত্র শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো" এ ধরনের বক্তব্য উস্কানিমুলক গঠন মুলক নয়। সংসদে বিরোদী দলের পেশকৃত বিল পাশ না হলেই রাজপথে নামতে হবে সরকারের পতন ঘটাবার জন্য এই ধরনের কালচার সংসদীয় গনতন্ত্রে স্বীকৃত নয়। বৃটেন, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডার দিকে তাকালেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। " বিরোধীদল সে যেই হোক আজকের বিএনপি বা গতকালের আওয়ামীলীগ এদের কাছে প্রত্যাশা একটাই শুধু বিরোধীতার খাতিরে যেন সবকিছুর বিরোধীতা না করা হয়। বিরোধী দলেরও একটা স্বচ্ছ ও আদর্শ নীতি থাকা দরকার যাতে করে মানুষ সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে একটা পার্থক্য নির্নয় করতে পারে"। [৩৬]

[৩৪] Ivorjennings, *Cabinet Government*, Cambridge University press, 1961, page, 61.]

[৩৫] দৈনিক ইনকিলাব, ২৩শে অক্টোবর ১৯৯১।

[৩৬]. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯শে জুলাই ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

৭. "বি.এন.পি সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত দুটি উপনির্বাচন যেমনঃ মিরপুর ও মাগুড়া উপ-নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ অবাধ নির্বাচন হয়নি ।" বিরোধী দলের এই অভিযোগ কি সঠিক ?

বিএনপি সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত দুটি উপনির্বাচনে যেমন- মিরপুর ও মাগুড়া উপনির্বাচনে "ভোট কারচুপি ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে" । বিরোধী দলের এই অভিযোগের প্রতি অধিকাংশ উত্তরদাতা (৮৮.২৪%) হ্যাঁ বোধক উত্তর দেন । মিরপুর ও মাগুড়া উপনির্বাচনে ভোট কারচুপি ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে । বিরোধী দলের এই অভিযোগের প্রতি না সূচক উত্তর আসে মাত্র ৫.৮৮% ।

১৯৯২ সালের ১৪ নভেম্বর বিএনপি'র সংসদ সদস্য হারুন মোল্লা মারা যান । তিনি ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেনকে ২,৪০০ ভোটে পরাজিত করে মিরপুর (ঢাকা-১১) এলাকা থেকে নির্বাচিত হন । ১৯৯৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী এই আসনে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মহসীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী কামাল মজুমদার ।

দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, মিরপুরের উপ-নির্বাচনে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু উত্তেজনা, সংঘর্ষ-সংঘাত, ভোটারদের হয়রানি-এসব ছাড়াও বেশ কিছু জাল-ভোট দেয়া হয় । ভোট দিতে এসে ফিরে গিয়েছেন অনেক ভোটার । আবদুল আজিজ (ভোটার নং ১২২৩) ও ফজলুর র হমান (ভোটার নং ১০৭০) ভোট কেন্দ্রে গিয়ে দেখতে পান, তাদের ভোট কে বা কারা দিয়ে গেছে।.....এছাড়া আরও বহু অভিযোগ পাওয়া গেছে । যেমনঃ গাবতলী স্কুল-কেন্দ্রে একজন আনসার কমান্ডার বিএনপি'র ধানের শীষে ভোট দেয়ার জন্য প্রচারণা চালান । প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে অভিযোগ করে ফল হয় নি । শাহ আলী কেন্দ্রি স্কুল-কেন্দ্রে একজন পুলিশকে (আওয়ামী লীগের) নৌকা-মার্কা স্লিপধারী মহিলা ভোটারদের হয়রানি করতে দেখা যায় । শাহ আলী গার্লস স্কুল-কেন্দ্রে নৌকার প্রতীক সম্বলিত পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয় ।[১০]

১০. দৈনিক সংবাদ, ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ প্রধান আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে রেডিও-টেলিভিশনে মিরপুর উপ-নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা এবং আওয়ামী লীগ আহূত সন্ত্রাসী তৎপরতা, সংসদের বিরোধীদলের চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিমকে নির্দয়ভাবে প্রহারের মধ্য দিয়ে সরকারের অগণতান্ত্রিক চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে । গণতন্ত্র বিএনপি'র হাতে নিরাপদ নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিশু-গণতন্ত্র পরিচর্যার অভাবে বিকলাঙ্গ ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েছে । গণতন্ত্র কিভাবে লালন করতে হয়, বিএনপি তা জানে না ।[৩৮]

মিরপুর উপ-নির্বাচনের পরই বিএনপি সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয় বলে আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে ।

২০শে মার্চ ১৯৯৪-এ মাগুরা-২ আসনে উপ-নির্বাচনে মিরপুরের লজ্জাজনক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় । বিএনপি সরকার মনে করেছিলো, মাগুরা উপ-নির্বাচনে পরাজিত হলে তারা জনগণের আস্থা হারাবে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার শিখর থেকে বিচ্যুত হবে । অতএব, এই উপ-নির্বাচনে বিজয়ের প্রশ্ন তাদের কাছে জীবন-মরণ সমস্যা হিসাবে দেখা দেয় । দৈনিক "ভোরের কাগজ"-এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, মাগুরা-২ আসনের উপ-নির্বাচনে বিভিন্ন স্থানে ভোট-কেন্দ্র দখল, ব্যালট-বাক্স ছিনতাই, ভোট-কারচুপি, এজেন্টদের বের করে দেয় । সকাল ৯টার দিকে চান্দ্রা -কেন্দ্র এলাকায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ কামাল ও ঋষি সম্প্রদায়ের রামপদকে মারধর করা হয় । সকাল ৯টা ৪০মিনিটে চতুরবাড়িয়া -কেন্দ্র এলাকায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের ওপর হামলার ছবি তুলতে গেলে বিএনপি সমর্থকরা চিত্র-সাংবাদিকদের হুমকি দেয় ।[৩৯]

[৩৮] দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ ।

[৩৯] দৈনিক ভোরের কাগজ, ২১ মার্চ, ১৯৯৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক "সংবাদ"-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মাগুরা উপনির্বাচনটি ছিল প্রায় সব বিরোধীদলের চোখের সামনে প্রধানমন্ত্রীসহ ক্ষমতাসহ ক্ষমতাসীন বিএনপি'র মন্ত্রী, এমপি, প্রশাসন, পুলিশবাহিনী, সর্বহারা পার্টির সশস্ত্র ক্যাডার, মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের এক যৌথ অভিযান । অভিযানের লক্ষ্য ছিল নির্বাচনে জয়ী হওয়া, যার ফলাফল সম্পর্কে বিএনপি ঢাকা থেকে নীতি নির্ধারন করে দিয়েছিল ।

৮. পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিরোধী আন্দোলনের মূল দাবী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এর জন্য তাদের লাগাতার সংসদ বর্জন, হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট প্রভৃতি কর্মসূচী যুক্তিসংগত ছিল কিনা?

বেশীর ভাগ উত্তর দাতা মনে করেন (৫৮.৮২%) পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী আন্দোলনের মূলদাবী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এর জন্য লাগাতার সংসদ বর্জন, হরতাল, অবরোধ ধর্মঘট প্রভৃতি কর্মাদি যুক্তিসঙ্গত ছিল না । কম সংখ্যক উত্তর দাতা মনে করেন যে বিরোধী আন্দোলনের মূল দাবী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এবং এর জন্য তাদের লাগাদার সংসদ বর্জন, হরতাল, অবরোধ প্রভৃতি কর্মসমূহ যুক্তিসঙ্গত ছিল । মাত্র ৫.৮৮% উত্তরদাতা মনে করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত দাবী ও দাবী পক্ষে আন্দোলন যুক্তিসঙ্গত ছিল ।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী আন্দোলনের মূল দাবী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এর জন্য এদের লাগাতার হরতাল, সংসদ বর্জন এগুলো যুক্তিযুক্ত ছিল কারন সরকারী দল তখন তাদের এই দাবীর প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান করেনি । উপরন্তু সরকারী দল সর্বদাই বলছিল যে, তারা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

সরকার বোঝে না এবং এই ধরনের সরকারের অস্তিত্ব স্বীকার করে না । তারা বারংবার এই কথা বলে আসছিল এবং বিরোধী দল গুলির দাবীর প্রতি কর্ণপাতই করেনি । যার ফলে তারা বাধ্য হয়ে এ ধরনের কর্মসূচী গ্রহন করে । যদিও এটা সার্বিকভাবে মঙ্গলজনক ছিল না। কিন্তু তারা বাধ্য হয়েছিল দাবী আদায়ে এ ধরনের কর্মসূচী দিতে ।

৯.এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সঠিক ও কারচুপি বিহীন হবে । এই কথাটি সঠিক কিনা?

বেশীর ভাগ উত্তরদাতা (৫২.৯৪) মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সঠিক ও কারচুপি বিহীন হবে । এর কমসংখ্যক উত্তরদাতা (৪১.১৮)% মনে করেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সঠিক ও কারচুপি বিহীন হবে না । এর সম্ভাব্য উত্তর দিয়েছেন মাত্র ৫.৮৮% ।

১০. বিরোধীতারা পদত্যাগের পর সংসদে অনুষ্ঠিত অধিবেশন গুলি কি বৈধ ছিল ?

বিরোধীরা পদত্যাগের পর সংসদে অনুষ্ঠিত অধিবেশনগুলি বৈধ ছিল না বলে বেশীরভাগ উত্তরদাতা অর্থাৎ ৬৪.৭১% মনে করেন । অপরদিকে ৩৫.২৯% উত্তরদাতা মনে করেন যে বিরোধীরা পদত্যাগের পর সংসদের অধিবেশনগুলি বৈধ ছিল ।

১১. যদি তাদের সংসদ অকার্যকর হয়ে পরে তবে এর জন্য দায়ী কে ছিল ?

বেশীরভাগ উত্তরদাতা(৮২.৩৫) মনে করেন যে বিরোধী দলের পদত্যাগে সংসদ অকার্যকর হয়ে যায় এবং এর জন্য সরকারী ও বিরোধী দল উভয়ই দায়ী । ১১.৭৬% উত্তরদাতা সংসদ অকার্যকর হয়ে যাবার জন্য সরকারী দলকে দায়ী করেন । অপরদিকে মাত্র ৫.৮৮% উত্তরদাতা এজন্য বিরোধী দলকে দায়ী করেন ।

Dhaka University Institutional Repository

১২. বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পঞ্চম জাতীয় সংসদে পাশ না করে একটি অগ্রহনযোগ্য ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের পাশ করে স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে ।

অধিকাংশ উত্তরদাতা (৮২.৩৫) মনে করেন যে বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পঞ্চম জাতীয় সংসদে পাশ না করে একটি অগ্রহনযোগ্য ষষ্ঠ সংসদে পাশ করে স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে । ১১.৭৬ উত্তরদাতা মনে মনে করেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল ষষ্ঠ সংসদে পাশ করে অবশিষ্ট কাজ করেছে । মাত্র ৫.৮৮% উত্তরদাতা মনে করেন আংশিক স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে ।

১৩. ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ কি বৈধ ছিল ?

বেশীরভাহগ উত্তরদাতা অর্থাৎ ৭০.৫৯% মনে করেন যে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ বৈধ ছিল না । অপর পক্ষে কম সংখ্যক উত্তরদাতা অর্থাৎ ২৯.৪১% মনে করেন যে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ বৈধ ছিল ।

১৪. যদি ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ অবৈধ হয়ে থাকে তবে ঐ সংসদে পাশকৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলটিও অবৈধ।

০.৬% উত্তর দাতা মনে করেন যে যেহেতু ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ অবৈধ তাই উক্ত সংসদে পাশকৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলটিও অবৈধ । পাশাপাশি প্রায় একই সংখ্যক উত্তরদাতা ৪১.১৮% মনে করেন যে ষষ্ঠ সংসদে পাশকৃত তত্ত্বাবধাকীয় সরকার বিলটি বৈধ । এবং বাকী ৫.৮৮% উত্তরদাতা মনে করেন যে প্রশ্নটি প্রযোজ্য নয় ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ অবৈধ ছিল , কারন নির্বাচন সার্বজনীন ছিল না । এর ফলাফলও ছিল হাস্যকর । কিন্তু ঐ সংসদে তত্ত্বাবধাকীয় সরকারের যে বিল পাশ হয়েছিল তা বৈধ ছিল । কারন এই দাবীটি সার্বজনীন ছিল এবং বিলটি পাশ করার ব্যাপারে সকল বিরোধী দলগুলোর ঐকমত ছিল । ফলে বিলটিকে বৈধ বলা চলে। ৯০ এর গণঅভূত্থানের পর গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেয় । এর মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতাসীন হয় । কিন্তু আওলীগ বিরোধী দল হিসাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা নেয়নি । বিএনপি সরকারও দায়িত্বশীল ভূমিকা নেয়নি । যেহেতু ৫ম জাতীয় সংসদে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি সেহেতু ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ছিল নিয়মাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া । ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলকে অন্তর্ভূক্ত করেছিল- তাই এ প্রক্রিয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল বৈধ ছিল।

১৫. বাংলাদেশের প্রথম সংসদীয় সরকার (৭২-৭৫) এবং দ্বিতীয় সংসদীয় সরকার (৯১-৯৬) এর মধ্যে কোনটি দায়িত্বশীল ও জবাবদিহি সরকারের ভূমিকা পালন করে ?

এ প্রশ্নের ক্ষেত্রে দেখা যায় মাত্র ৩৫.২৯% উত্তরদাতা মনে করেন যে, বাংলাদেশের প্রথম সংসদীয় সরকার ও দ্বিতীয় সংসদীয় সরকারের মধ্যে দ্বিতীয় টি বেশী দায়িত্বশীল ও জবাবদিহি সরকারের ভূমিকা পালন করে। তুলনামূলক কম সংখ্যক উত্তরদাতা মনে করে যে, বাংলাদেশের ১ম এবং দ্বিতীয় কোন সরকারই দায়িত্বশীল সরকারের ভূমিকা পালন করতে পারে না। ৫.৮৭% উত্তরদাতা মনে করেন ১ম সংসদীয় সরকার বেশী দায়িত্বশীল ছিল । এবং একই সংখ্যক উত্তর দাতা মনে করে যে উভয় সরকারই আংশিক দায়িত্বশীল ছিল। ২৯.৪১% উত্তর দাতা প্রশ্নে র কোন উত্তর দেয় নাই।

বাংলাদেশের ১ম সংসদীয় সরকার গঠিত হয়েছিল স্বতস্ফুর্ত ভাবে। এখানে বিতর্কের কোন অবকাশ ছিল না। স্বাধীনতা আনয়ন কারী জাতীয়তা বাদী রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে এ সরকার গঠিত হয় । কিন্তু এর পরিনতি ছিল এর বিপরীত। ১৯৭৫ সালে ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে ১ম সংসদীয় সরকারের সমাপ্তি হয়। এর প্রভাব পড়ে গোটা সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর।

Dhaka University Institutional Repository

The Fourth Amendment of the constitution not only altered the form of the government but also brought about drastic changes in the political processes of the country. It abandoned competetive party policies and introduced single party system named as Bangladesh Krishak Sramik Awami League, curbed, fundamantal rights of the citizens, controlled the freedom of the press and publications, and finally restricted the powers of the judiciary, the last remnant of a constitutional government. Under this amendment, Mujib became once again president, the most power ful figure in the country." [৪০] অর্থাৎ দীর্ঘ ২৪ বৎসরের বাঙ্গালী সায়ত্বশাষন আন্দোলন ও নয়মাস মুক্তিযোদ্ধের ফলে যে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটি মাত্র ২ বছর কার্যকরী ছিল। অর্থাৎ বাঙ্গালীর দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল প্রথম সংসদীয় সরকারের সমাপ্তি হয় মাত্র ২ বছরের মাথায়।

এর পর ১৯৯০ সালের গন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৬ বছর পর ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধিনে ২য় সংসদীয় সরকার গঠিত হয়। এই সংসদের কাছেও জনগনের প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু এই সংসদ ১ম সংসদের তুলনায় ভালভাবে কাজ করলেও জনগনের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারে নাই। তবে ৯১ সালের সংসদীয় সরকারের ১ম সংসদীয় সরকারের মত পতন হয়নি। এই সংসদ ৫ বছরের কাছাকাছি মেয়াদ পূর্ণ করে। তবে দীর্ঘ ২২ মাস এই সংসদ ছিল এক দলীয় সংসদ। কারন ১৩তম অধিবেশন থেকে বিরোধীদল সংসদ বর্জন শুরু করে এর পর আর সংসদে ফিরে যায়নাই। অতএব, ৫ম সংসদ মেয়াদপূর্ণ করলেও সংসদীয় কার্যক্রম ও রীতিনীতির দিক দিয়ে ব্যার্থ হয়। ৯৬ সালে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চম সংসদের বিলুপ্তি হলেও সেটি মাত্র ১৫ দিন স্থায়ী ছিল। এর পর সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ৩য় সংশোধনীর সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। অর্থাৎ বাংলাদেশে ২য় সংসদীয় সরকার পরিবর্তন হয়ে আরও একটি সংসদীয় সরকার এসেছে। এর মাধ্যমে সরকার বা রাজনীতির কাঠামোগত কোন পরিবর্তন হয়নি, যেটি ১ম সংসদীয় সরকারের বেলায় হয়েছিল।

৪০. Dr. Nazrul Islam. Parlimentary Democracy In Bangladesh, An Assessment, perspective in social seience review. Vol-1 , No.7, 1997, P-5

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আর্থসামাজিক চ্যালেঞ্জ

একটি দেশের আর্থ সামাজিক ব্যাবস্থা এর রাজনৈতিক ব্যাবস্থার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এমত পোষন করেন যে, উন্নত আর্থ সামাজিক ব্যাবস্থা রাজনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। "Political development as the political prerequisitie of economic development" [১] ১৯৯১ সালে গঠিত দ্বিতীয় সংসদীয় সরকারের পূর্বে দীর্ঘ ২০ বৎসরের ৩টি শাসনামলে (মুজিব, জিয়া ও এরশাদ) গড়ে উঠে নূতন মুনাফাকারী ও লুটেরা শ্রেণী। মুজিব শাসণামলে রাষ্ট্রীয় ও ব্যাংকিং সেক্টর এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহে চোরাকারবারী ও লুটপাট শুরু হলেও জিয়া ও এরশাদের সামরিক শাসনামলে তার প্রকটতা বৃদ্ধি পায়। একদিকে এসব মুনাফাকারী শ্রেণী তাদের ব্যাংক ব্যালেন্স গড়ে তুলে অপর দিকে শাসক শ্রেণীও তাদের সহায়তায় কিছু আমলা, শিল্পপতি ও বুর্জোয়ারা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। ফলে অবকাঠামোগত ভাবে কোন উন্নতি হয়নি এবং দেশ চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে যায়। '৯১ জানুয়ারী মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ এবং সাধারণ নির্বাচনের পর নূতন সরকারের অর্থমন্ত্রী এবং অর্থ প্রতিমন্ত্রী প্রকাশ্যে এ কথা স্বীকার করেছেন। ৫ই এপ্রিল, '৯১ ৫ম সংসদের উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন "অনেক লোক শিল্প ব্যাংক ও শিল্প ঋণ সংস্থা থেকে বিপুল ঋণ গ্রহণ করে। এরা শিল্প গড়েনি ঋণও শোধ করেনি। প্রধান ৩টি আমলে এভাবে লুট করা হয় রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক এবং অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান সমূহের তহবিল ও অর্থসম্পদ"[২]।

---

[1] Lucian pye, *Aspect Of Political Development*, Little Brown and Companny inc boston 1966 P - 68

[2] জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরই সংঘঠিত হয় স্মরণকালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, এতে কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়, ক্ষতিগ্রস্থ হয় হাজার হাজার ঘড়-বাড়ী, রাস্তাঘাট, গৃহহীন হয় হাজার হাজার মানুষ। এই পটভূমিতেই বিএনপি সরকারের অর্থনৈতিক কাজের মূল্যায়ন করা উচিৎ।

বাংলাদেশের ৫ম জাতীয় সংসদের সময়কালে উদ্ভূত আর্থসামাজিক সমস্যাসমূহ একজন গবেষক এভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকর করার পথে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দিয়েছে ।[৩] এ অংশে আমরা কৃষি শিল্প ও শিক্ষা এবং সার্বিক দারিদ্র সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ সমূহ আলোচনা করবো।

৫.১ কৃষি ব্যবস্থা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড গড়ে ওঠে কৃষিকে ভিত্তি করে। অথচ জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কৃষির অবদান ক্রমেই হ্রাসমান। ১৯৮৫-৮৬ সালের যেখানে কৃষির অবদান ছিল ৫২.৪ ভাগ সেখানে ১৯৯০-৯১ সালে ৪৮.৯ ভাগ। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষিখাতকে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার দেয়া হয়নি। কৃষকদের ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ দিন দিন কমেছে। সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদ সহ মওকুফ করলেও সমবায়ী কৃষকদের কৃষিঋণ মওকুফ করেনি। " জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সত্বেও কৃষিখাতে ঋণ দানের হার কমেনি। ৯০-৯১ ও ৯১-৯২ সালে কৃষিখাতে ঋণদানের হার ছিল যথাক্রমে ৩ ও ৪ ভাগ। অর্থাৎ ৯০-৯১ সালে ৫৯৫ কোটি টাকা এবং ৯১-৯২ সালে ৭৭৪ কোটি টাকা। উল্লেখ্য পূর্ববর্তী বছর গুলিতে কৃষিঋণের পরিমান উক্ত দু'বছরের তুলনায় দেড় থেকে দু'গুন বেশী ছিল,"[৩]

৩. অরুন কুমার গোস্বামী, " *Institutionalization Constraints Of Democracy Of Bangladesh.*", অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস।

[৩] সংবাদ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী হিসাব অনুযায়ী ৮২ সালে তুলনায় ১৯৯২ সালে ধানের সংগ্রহ মূল্য বেড়েছে ৮৩ ভাগ। কৃষি উপকরণ থেকে ক্রমান্বয়ে ভর্তুকি তুলে নেয়ার ফলে ইউরিয়ার দাম বেড়েছে ১২৮ ভাগ, বিটিএমপি ৩৭১ ভাগ, পটাশ ৪৫৩ ভাগ। কীটনাশক ১২০০ ভাগ, জ্বালানী ৩৩২ ভাগ, ফলে আজ আমন ধানের মন প্রতি উৎপাদন ব্যয় ২২৭ টাকা, উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের উৎপাদন ব্যয় ১৮৪ টাকা, "সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিবি) থেকে কৃষি উন্নয়ন ও কাঁচামালের সেচ সারের বরাদ্দ বাতিল ও ১০০ বীজ বিতরণ কেন্দ্র বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে বিএডিসি ১২০০০ কর্মচারীর বেতন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।"[৫] সেখানে গ্রামীণ ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা হয়েছে সেখানে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ২২৫ টির মতো শাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে খাদ্যশষ্য আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা আর্ন্তজাতিক চক্রান্তের অংশ। প্রশাসনে সমন্বয় ও দিক নির্দেশনার অভাবই এ ব্যর্থতার প্রধান কারণ। "মন্ত্রনালয়ের কতৃত্বের প্রশ্নে ঐক্যমতের অভাবে কৃষি এবং সেচমন্ত্রী মজিদুল হকের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ২ বৎসরেও সংসদীয় সরকার পদ্ধতির সাথে সঙ্গতপূর্ণ একটি কার্য্যবিধিমালা খসড়া করতে পারেনি।"[৬]

এই সময় চাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যায় এবং সার সংকট সৃষ্টি হয়। ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সার সংকট সম্পর্কে পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন খবর প্রকাশিত হয়। ২৩শে মার্চ প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় বগুড়ার শিবগঞ্জে প্রতি বস্তা ইউরিয়া সার ১১২০ টাকাদরে বিক্রি হচ্ছে। একই তারিখে নওগাঁ ও তার আশে পাশের এলাকায় প্রতি বস্তা সার ১০০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। অথচ ২১শে মার্চ সারের দাম ছিল ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা।" একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ ১৯৯১ - ৯৫ সালের বিভিন্ন সময়ে ১২ হাজার টন ইউরিয়া সার ভূয়া কাগজ পত্রের মাধ্যমে মিলের বাইরে পাচার করা হয়।

৫. দৈনিক আজকের কাগজ, ২৯শে জুলাই, ১৯৯৩।
৬ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯শে জুলাই, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

এই সারের হিসাব মিলের কাগজ পত্রে রয়েছে কিন্তু গুদামে এর অস্তিত্ব নেই। বাকি ২০ হাজার টন ইউরিয়ার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয় দেশের দক্ষিনাঞ্চলে ইউরিয়া সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বস্তা প্রতি ইউরিয়ার বিক্রয় মূল্য ২১৫ টাকা নির্ধারিত থাকলেও এই অঞ্চলে বর্তমানে তা ২৬০ থেকে ২৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে" [৭] ১৯৯৫ সালে বিএনপি সরকার আমন বোরো মৌসুমে ইউরিয়া সার রপ্তানী করে প্রায় ৫৩ কোটি টাকা লাভ করে। অন্যদিকে সার রপ্তানীর ফলে অভাবের জন্য কৃষকেরা জমিতে সার দিতে না পারায় ১০ লাখ টন খ্যাদ্য ঘাটতির আশংকা করা হয়। এই ঘাটতি পুরন করতে হলে বিদেশ থেকে ১০০০ কোটি টাকার খাদ্য আমদানি করতে হবে। বৈদেশিক সাহায্য দাতা সংস্থা ইউএম এইচ এর এগ্রোবেইজড ইন্ডাষ্ট্রিজ ট্রেড বুলোটিন এই তথ্য প্রকাশিত হয়" [৮] ১৯৯৫ সালের এতিহাসিক সার কেলেংকারির দায় দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ৪ঠা এপ্রিল ৯৫ পদত্যাগ করেন শিল্প মন্ত্রী এ এম জহির উদ্দিন খান। "তবে তিনি পদত্যাগের পর সাংবাদিকদের চাল দেন। শিল্প মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব কলকারখানায় সার উৎপাদন নিশ্চিত করা সেটা যথাযথই হয়েছে। কিন্তু উৎপাদিত সার সরবরাহ ও বিতরণের অনিয়মের কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়." [৯]

৭ দৈনিক জনকণ্ঠ ৩রা এপ্রিল, ১৯৯৫।

৮ সাপ্তাহিক যায় যায় দিন, ১৪ই জুলাই, ১৯৯৫।

৯. দৈনিক সংবাদ ৬ঠা এপ্রিল, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন মন্ত্রী মাজেদ উল হক কমিশনারের কাছে বলেন যে, চাহিদার তুলনায় স্বল্প সরবরাহ এবং কারখানা গুলিতে মজুদের পরিমান সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসার ফলে সার সংকটের সৃষ্টি হয়। তিনি আরও বলেন মন্ত্রনালয়ের নিরুপিত চাহিদা কোন মতেই ভুল ছিলনা। সার মজুত ও মিল গেটে গুদামি এই সংকটের অন্যতম কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। খাদ্য মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূইয়া বিভিন্ন পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়েছেন যে দেশে উদ্বৃত্ত খাদ্য শষ্য রহিয়াছে। অথচ চালের কেজি তখন ১৭-১৮ টাকা। প্রকৃত ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এর এবং দলীয় লোকজনকে দিয়ে সার বিলি বন্টন ও বিক্রির ব্যবস্থা করায় সার সংকটের সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। অর্থমন্ত্রী দাবী করেছেন কতিপয় রাষ্ট্রবিরোধী লোকের সহায়তায় ডিলাররা গরীব চাষীদের বঞ্চিত করছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ শিল্প ব্যবস্থা

বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরই শিল্পকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি নতুন শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি ঘোষনা করে ২২শে জুলাই ৯১ জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পূর্বে বেরিয়ে এসেছে যে, সরকারী ব্যাংকের ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের সম্পদ পাচার করে বেসরকারী ব্যাংক গড়ে উঠেছে। এছাড়া ৯টি বেসরকারী ব্যাংকের ৩৯ জন চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও পরিচালক বিভিন্ন সরকারী ব্যাংক শিল্প ব্যাংক থেকে ৮২ লাখ ৮২ হাজার টাকা ঋন নেয়। সরকার এমন ৫ শতাধিক প্রতিষ্ঠানের খোজ পেয়ে তাদের অনুমোদন ও রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করে। খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন "খেলাপীদের ৩টি কেটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। মামলা করার আগে তাদের সুযোগ দেওয়া হবে। ঋণ আদায়ের জন্য সকলের সহযোগীতা চাইবো, নতুন উদ্যোগীদের কাছ থেকে এই টাকা আদায় করে নতুন ঋণ দেওয়া যায়, এ ব্যাপারে সংসদীয় কমিটির ব্যাবস্থা নেওয়া হবে"। [১০]

১০. দৈনিক আজকের কাগজ ঢাকা ২৩শে জুলাই, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদ ক্যাবল ব্যাংক কোম্পানী এ্যাক্ট ১৯৯১ পাশ করে ঋণ খেলাপীদের তালিকা প্রকাশ করতে শুরু করলে বিভিন্ন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা এর বিরোধিতা করতে থাকে এবং পত্রিকাগুলি এর বিরুদ্ধে রিপোর্ট লেখা শুরু করে। এছাড়া অতীত আমলের মন্ত্রী এম.পি এবং বর্তমান আমলের বিএনপি ও আওয়ামীলীগের অনেক সদস্য এর সাথে জড়িত ছিলেন। প্রধান বিরোধী দলের আক্তারুজ্জামান বাবু এবং সরকারী দলের শামসুল ইসলাম খান এই দুই জন সাংসদ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। এটি ৫ম জাতীয় সংসদের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ ছিল। কিন্তু সংসদ শেষ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোন কার্য্যকরী পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। কেননা খোদ সরকারী দল ও অন্যান্য সরকারী দলের ভিতর এ সব লুটেরা শ্রেণী থাকায় তারাই এতে বাধ সাধে। "বাস্তবত দেখা যাচ্ছে , বাংলাদেশে অর্থনীতি শাসনে যারা যত নির্ধারন ভূমিকা পালন করে তারা হলো, বৃহৎ রাজনৈতিক দল সমূহ , আমলাতন্ত্র, বৃহৎ ব্যবসায়ী সংস্থা এবং বিশ্ব ব্যাংক আই এম এফ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা । আন্দোলন, নির্বাচন, পারস্পারিক প্রতিদন্দ্বিতা ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলির সীমিত জবাবদিহির কিছু ব্যবস্থা সৃষ্টি হলেও অন্যদের কোন রকম জবাবদিহির সুযোগ নাই" [১১]

400108

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

[১১] Anu Muhammad, " Economics of the World Bank : Growing Resources, Increasing Deprivition" *Holiday, December*, 1995.

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি সরকারের আমলে প্রায় ৪ হাজার শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। সরকার বিভিন্ন সময়ে ৫৮টি বৃহত্তর শিল্প এবং ১৪টি বৃহৎ শিল্পের ৪৯% মালিকানা বিক্রী করেছে। সরকারের এই শিল্প বিরোধী নিতীর ফলে বেসরকারী পর্যায়ে ২৬০টি ছোট বড় শিল্প কারখানা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। একি সময়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ১৫ শতাধিক শিল্প কারখানা রুগ্ন হয়ে পড়ে। "সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় সহ বিভিন্ন সূত্র জানাই ৫ বৎসরে বিএনপি সরকারের বিক্রি করা সরকারী বৃহত্তর শিল্পগুলির মধ্যে ১৩টি পাট, সুতা কল ১৮টি ও অন্যান্য শিল্প ২৩টি। এই ৫৮টি বৃহত্তর শিল্পের যাবতীয় সম্পদ ও সম্পত্তির মূল্য হবে ১৬শ কোটি টাকা, পনির মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে ৫৮০ কোটি টাকা। বিক্রিত সম্পত্তি থেকে সরকার এ পর্যন্ত পেয়েছে মাত্র ২৭০ কোটি টাকা। বাকি ৩১০ কোটি টাকা ক্রেতারা এখনো পরিশোধ করেনি। এই বিপুল অংকের সরকারী শিল্প কারখানা ও সম্পদ যাদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে তাদের অধিকাংশ বিএনপি 'র মন্ত্রী বর্গ ও নেতাদের আত্মীয় স্বজন।"[১২]

[১২] দৈনিক বাংলার বাণী ৭ই মে, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

দেশে ক্রমাগত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অরজকতার সৃষ্টি হলে বিদেশী বিনিয়োগ কারীরা তাদের পুঁজি প্রত্যাহার করে নেয়। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে গড় বিনিয়োগের পরিমাণ হলো ১০ লাখ মার্কিন ডলার। ভারত পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় দলীয় কোন্দল বিদ্যমান, তথাপী সেখানে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতে বিনিয়োগের পরিমাণ ২০ কোটি ডলার, পাকিস্তানে ২৫ কোটি ৭ লাখ ডলার, শ্রীলংকায় ৯ কোটি ৮ লাখ ডলার। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মুজাফ্ফর আহমদের মতে শিল্পয়ানের গতি নেই বলে ব্যাংকে বিপুল পরিমাণ টাকা পড়ে আছে এবং অর্থনৈতিক তৎপরতা নেই বলে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ এত কম। মুদ্রাস্ফীতির রোধে বিএনপি সরকার ১ম ৩বৎসরে সাফল্য দেখালেও ৪র্থ বৎসরেও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

বিএনপি আমলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় পাট ও বস্ত্র শিল্প। ২৯শে আগষ্ট, ৯৩ সরকার বাংলাদেশ পাট শিল্প অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংকের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এটি একটি অলাভ জনক প্রতিষ্ঠান, এই কারণ দেখিয়ে এর বিলুপ্তি ঘোষণা করে। পাট মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায় যে, বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশনের দায়-দেনা ১২৫৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৯৩৩ কোটি টাকা অতীত ব্যাংক ঋণের সুদ। পক্ষান্তরে সরকারী হিসাব মতে এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদের বাজার মূল্য ৬০০ কোটি টাকারও অধিক। অধ্যাদেশটি সরকারের সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে পাশ করানো হয় এবং রাষ্ট্রপতি সম্মতির পর ৩০শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন এ্যাক্ট নামে আইনে পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে, '৮৫ সালে বাংলাদেশ জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

জুট এক্সপোর্ট কর্পোরেশন ও র‍্যালি ব্রাদার্স লিঃ এই ৪টি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন গঠন করা হয়। এর উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ছিল কৃষকের পাটের ন্যায্য মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান, পাটের চোরচালান নিয়ন্ত্রণ ও বেসরকারীখাতের পাট কল সমূহে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও মানের পাট সরবরাহ ও বিদেশে কাঁচাপাট রপ্তানী। বিশেষজ্ঞদের এর বিলুপ্তি করায় পাট শিল্পে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এই সময়ে বাংলাদেশ টেক্সটাইলস মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি) ৫৩০ কোটি ৩৪ লাখ ৩৯ হাজার টাকা লোকসান দেয়। সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। হিসাব অনুযায়ী সংস্থা ২৩ বৎসরে লোকসান দিয়েছে ৭৪ হাজার ৪৪ কোটি ৮৫ লাখ ২৩ হাজার টাকা। অর্থাৎ বিএনপি সরকারে শাসন আমলের পূর্বে ১৮ বছরে সংস্থা গড়ে লোকসান দিয়েছে ১৪ কোটি ৬০ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। নিম্নে ৪১টি মিল নিয়ে গঠিত সংস্থার লাভ-ক্ষতির হিসাব তুলে ধরা হল ঃ (১ম ও ২য় সংসদীয় সরকারের আমলের)

অর্থ বছর	লাভ	লোকসান
১৯৭২-৭৩	৬,১৯,৪৯০০০	-
১৯৭৩-৭৪	১১,৯০,৩৯,০০০	-
১৯৭৪-৭৫	১২,৬৬,৫১০০০	-
১৯৭৫-৭৬	৩,৪৫,১৭০০০	-
১৯৯২-৯২	১,৫০,৯০০০	৫৫,২০,১০০০০
১৯৯২-৯৩	-	১,৪৪,৫২,৯৭,০০০
১৯৯৩-৯৪	-	১,৫৩,৮২,৩০,০০০
১৯৯৪-৯৫	-	১,১৯,২৮,৯৯,০০০

সূত্রঃ মানচিত্র ২০শে অক্টোবর , ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

দেশ স্বাধীন হবার পর সংস্থা ৪১টি শিল্প নিয়ে থানা শুরু করে। বিএনপি আমলে মিলগুলি রেকর্ড পরিমাণ লোকসান দেয়ায় সরকার ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে ১০টি এবং ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে ১টি মোট ১১টি লে-অফ ঘোষনা করে পরবর্তীতে পানির দামে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত করে। ফলে ১০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এরপর আও ১১ হাজার শ্রমিক ছাটাই করা হয়। তাতে তাদের পরিবার পথে বসে যায়। বিটিএমসির অব্যাহত লোকসানের জন্য ওয়াকিবহাল মহল প্রচলিত সরকারের বিকল্পনীতিকে দায়ী করে থাকেন। উক্ত মহল একই মাসে মিলের অব্যস্থাপনাকে দায়ী করছে।

বিশ্ব ব্যাংক ও এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) মানে বিএনপি সরকারের আমলে যে পরিমান প্রকল্প সাহায্যের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে তার মধ্যে মাত্র এক চতুর্বিংশ ব্যয় করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রনালয়ের অর্থনৈতিক সংক্রান্ত বিভাগের সূত্রে জানা যায় যে ১৯৯১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৯৫ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত ৪ বছর ৩মাসে বিশ্বব্যাংকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ৪ হাজর ৯১৪ কোটি ৫৮ লাখ ৩০ হাজার টাকা এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ১৭০ কোটি ৩৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা। নিম্নে বিভিন্ন প্রকল্পের টাকার চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং কত ব্যয় হয়েছে তা পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পের নাম	চুক্তির তারিখ	চুক্তির পরিমান	ব্যয়ের পরিমান
কৃষি	১৭,০৬,৯১	১৫২,১৪,৪০,০০০	৩৬,১২,৭০,০০০
সম্পদ ব্যবস্থাপনা	১০,৭,৯২	২২৬,৯৬,৯০,০০০	৫৮,৩১,৪০,০০০
তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম	২১,৬,৯১	৩১০,৫২,৪০,০০০	৪,১৮,৪০,০০০
গ্যাস অবকাঠামো উন্নয়ন	২৪,৫,৯৫	৫২০,০৩,৪০,০০০	-
আভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন	১৭,৬,৯৫	১৯৫,১৬,৯০,০০০	১০,২৬,৪০,০০০
যমুনা বহুমুখী ব্রীজ	২৫,২,৯৪	৮৯৫,৪০,৭০,০০০	২৫৮,৮৩,২০,০০০
২য় আরআর এমাপ	২৯,৬,৯৪	৬৪২,২৪,৮০,০০০	১০০,৩৭,২০,০০০
বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১১,৩,৯৩	৩০৮,৬৫,৩০,০০০	৪৫,২১,৪০,০০০০
পুষ্টি	৬,৬,৯৫	২৫০,০৪,০০,০০০	-
৪র্থ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য প্রকল্প	১১,৬,৯১	৮৩০,৫৫,৮০,০০০	৪০১,৩৬,৮০,০০০
বেসরকারী শিল্প	২৭,৪,৯২	১১৪,১০,৮০,০০০	১৩,৪১,২০,০০০
টিএডিআইপি প্রকল্প	১০,৭,৯২	১১৪,১০,৮০,০০০	৩৬,২৩,৪০,০০০
ক্ষুদ্র জলসেচ উন্নয়ন	১৭,৬,৯১	২৩৫,৫৭,০০,০০০	১০৪,৮৯,২০,০০০
নলকূপ ও অগভীর পাম্প	১০৭,২৪,৯০,০০০	১০০,৫০,৩০,০০০	১০০,৫০,৩০,০০০
		৪,৯০৪,৭৮,৩০,০০০	১,১৭০,৩৯৫০,০০০

সূত্রঃ মানচিত্র ২০শে অক্টোবর, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পখাতের উন্নতি ব্যতীত সামষ্টিক অর্থনীতির উন্নতি অসম্ভব। অথচ বাংলাদেশে এখাতটি আজ পর্যন্ত অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করতে পারেনি। শিল্পখাতের অবদান অর্থনীতিতে এখন অল্প । মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ম্যানুফেকচারিং খাতের অবদান ১৯৬৯ - ৭০ সালে ৭.৫৮% , ১৯৮৬-৭৮ সালে ৮.৮% , ১৯৮৮-৮৯ সালে ৮.৪% এবং ১৯৯০-৯১ সালে ৮.৭৮% শতাংশ ছিল । এই খাতের অবদান অবশ্য ১৯৯১- ৯২ সালে ৯.১, ১৯৯২-৯৩ সালে ৯.৭ এবং ১৯৯৩-৯৪ সালে ৯.৯শতাংশে উন্নীত হয়েছে।[১৩] বর্তমানে প্রাইভেট ও পাবলিক খাত মিলে ম্যানুফকচারিং খাতের অবদান ১২শতাংশের কাছাকাছি এসেছে। সরকারী খাতের শিল্পগুলো অধিকাংশ রুগ্ন শিল্পে পরিনত হয়েছে । যে গুলি চালু আছে তারাও ক্রমাগত লোকসান দিয়ে যাচেছ। বিশ্ব ব্যাংকের ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সার্ভে এন্ড ষ্টাডিজ প্রোগ্রাম ১৯৯৩-৯৫ এর অধীন ২২৭ টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ৭,৩৬৬ টি ইউনিটে মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৭৬ থেকে ১০০শতাংশ ব্যবহার করা হয়। এর ফলে শিল্পখাতের উৎপাদন দাড়াই ৬৯ শতাংশে । বাদ বাকি গুলির উৎপাদন হচ্ছে শুন্য থেকে ২৫ শতাংশ। সামান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের পুরো উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থেকে থাকে। তৈরি পোষাক খাতে উৎপাদনের তেজি ভাব বজায় থাকলেও ৮২শতাংশের উপরে উঠতে পারেনি। বেশী ভাগ শিল্পেই গড়ে ৫০ শতাংশের কম উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগানো হয় ।[১৪]

[১৩] *বি, বি, এস, পরিসংখ্যান পকেট বুক*, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ১২৭।

[১৪] আবু মাহমুদ , প্রবন্ধ , শিল্পায়নে বিলম্বিত পদক্ষেপ আত্মঘাতি মূলক হতে পারে, *দৈনিক খবর* - ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি সরকারের রপ্তানীমুখী প্রবৃদ্ধির ঘোষিত লক্ষ ছিল বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতি পূরণে অপ্রচলিত পন্য রপ্তানী বৃদ্ধি সহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্বয়ংভরতা অর্জনের লক্ষ্যে শ্রমঘন ও রপ্তানী মুখী শিল্প স্থাপনের অগ্রাধিকার প্রদান। অপ্রয়োজনীয় অথবা স্বল্প প্রয়োজনীয় বিলাস সামগ্রীর আমদানী সীমিত করণ ও ক্ষেত্র বিশেষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করণ। কিন্তু এই লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী রপ্তানী বাড়েনি বরং প্রতি বছর ৫ হাজার কোটি টাকা বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে। দাতা সংস্থার পরামর্শে বাংলাদেশকে বিদেশী পন্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখানে উন্নত বিশ্বের সকল বিলাস সামগ্রী পাওয়া যায়। যার জন্য দেশীয় শিল্প মার খায় ও বিদেশী শিল্পের বাজারে পরিণত হয়। বিশেষ করে ভারতীয় দ্রব্য সামগ্রী বাংলাদেশ বাজারে একটি বৃহৎ অংশ দখল করে এবং এগুলি আসে চোরা পথে। "বিগত ৫ বছরে ভারত প্রীতির কারণে বিএনপি সরকার দেশের শিল্প ও অর্থনীতিকে অপূরনীয় ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। দেশ আজ ভারতে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক আগ্রাসনের কাছে জিম্মি। তার পরেও বিএনপি নেতা নেত্রীরা মিথ্যাচারের মাধ্যমে দেশীয় স্বার্থ ও ভারত বিরোধী জিগির তুলেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ভারতের স্বার্থ সংরক্ষনের পক্ষে। তাদের ৫ বছর শাসন আমলে এটাই প্রমাণ করেছে।" [১৫] বশ্ব ব্যাংকে ইস্যুকৃত এক প্রেস রিলিজে বিএনপি সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে যে.

[১৫] দনিক খবর ১০ই মে, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

" Small progress achieved in controlling public enterprise deficits, installing a mere open competive merket economy and the slow implementation of the public programme." জাপানের রাষ্ট্রদূত ১৯৯২ সালে ঢাকার লায়ন্স ক্লাবে এক ভাষনে বলেন যে, " Smuggling labour unrest cumbersome bureaucracy and corruption are obstacle to private investment .[১৬]

বিএনপি আমলে বিদেশী সাহায্যের বিভিন্ন অংশ নিম্ন রূপ

সাল	খাদ্যসাহায্য	পণ্য সাহায্য	প্রকল্পসাহায্য
১৯৯১-৯২	১৪.৯	২৩.৯	৬১.২
১৯৯২-৯৩	৭.২	২২.৯	৭০.৩
১৯৯৩-৯৪	৭.৫	২৮.৯	৬৩.৬

সূত্র বি বি এস ১৯৯৫

দেশী পক্ষের অদক্ষতা , কর্মচারী সুলভ দৃষ্টি ভঙ্গি, ইত্যাদি কারনে মন্ত্রনালয় মানে এখন বিদেশী সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী মানে এধরনের প্রকল্পের সমাবেশ যা বরাদ্দ খরচের ক্ষমতা এসব প্রতিষ্ঠানের নেই। এরেই প্রতিফলনের বিএনপি আমলে বিদেশীক সাহায্য প্রকল্পে পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু অন্যান্য খাতে কমেছে । পরস্পর বিরোধী, ক্ষতিকর , অকার্যকর, অপ্রয়োজনীয় ইত্যাদি প্রকল্পে দেশী বিদেশী অনেকেই লাভবান হয়। বাজার সম্প্রসারণ , সচলতা, জি ডি পি বৃদ্ধি ইত্যাদি দিক থেকে এর পক্ষে যুক্তি বের করা যায়। কিন্তু এগুলির নীট ফলাফল ও প্রভাব নিয়ে কখনোই কোন সামিক্ষা পর্যালোচনার খবর পাওয়া যায় না ।

[১৬]. মোহাম্মদ, গনতন্ত্র, সংবিধানও অর্থনীতি : বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বৎসর, সম্পাদনা তারেক শামসুর রেহমান, মওলা ব্রাদার্স , ৩৯ বাংলা বাজার ঢাকা, ১৯৯৯,পৃষ্ঠা- ১৫৫-১৫

Dhaka University Institutional Repository

"অর্থনীতি পরনির্ভরতায় বিষন্ন, বিদেশী সাহায্য অভ্যন্তরীণ উদ্‌পাদনের ১১শ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশে নেমেছে। বিনিয়োগ কমেছে, পন্য উৎপাদন খাতে দশক ব্যাপী বন্ধ্যাত্ব স্থায়ী হয়েছে। শিল্পায়ন সহ নানান ক্ষেত্রেও প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দূর্নীতী। রাজনৈতিক দলগুলি একসাথে কিছু করবে তার কোন লক্ষন দেখা যায় না। জনসংখ্যাকে ১লা নম্বর সমস্যা বলায় কিছু অগ্রগতি হয়েছে।"[১৭]

[১৭] শ ডিসেম্বর, ১৯৯২ বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সিটিটিউশন আয়োজিত বাংলাদেশ উন্নয়ন চর্চা শীর্ষক সেমিনারে সভাপতি এ এস এম আলহুসাইনের ভাষ্য থেকে উদ্ধৃত। *এশিয়া উইক*, ৫ই মে, ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ দারিদ্র্য দূরীকরণ

বাংলাদেশের দারিদ্র সম্পর্কে এ পর্যন্ত অনেক গবেষনা জরীপ হয়েছে। ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) বিভিন্ন সরকারের আমলের দারিদ্র পরিস্থিতির এবং এটি দূরিকরণে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল সেই সম্পর্কে বেশকিছু গবেষনা ও জরীপ করা হয়েছে। এছাড়া বিশ্বব্যাংক, বিবিএস, আইএলও, ইউএনডিপি,আইএমএফ, প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষনা জরীপ থেকে এ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) এর বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে বলা হয় "বিগত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কার্যতঃ কোন প্রগতি হয়নি। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা মোটেই অর্জিত হয়নি। প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল সঞ্চয়ে স্বল্পতা, সরকারী খাতে বিনিয়োগের ব্যর্থতা ও গনভোগ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে সম্পদের প্রবাহ হ্রাস পাওয়ার মাধ্যমে মেয়াদী প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে। বিগত কয়েক বছরে কৃষি খাতে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। এর পিছনে মূল কারণ হলো উদার আমদানী নীতি। তবে কৃষিতে শষ্য বৈচিত্রকরণ সম্ভব হয়নি। কয়েকটি খাতে শিল্পোৎপাদন ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে। মুদ্রা বিনিময় কঠোর হবার কারণে তৈরী পোষাক রফতানী কিছুটা উন্নতি হলেও পাটজাত দ্রব্য মার খাচ্ছে।"[১৮]

১৯৯৩ এর ৮ই মে বিআইডিসি এর এক জরিপ রিপোর্টে বাংলাদেশ অর্থনীতিবিদদের সম্মেলনে বলা হয় যে "Bangladesh has been fortunate during this entire period in having an unbroken series has good hervests" ক্রমাগত ফসল উৎপন্ন হবার জন্যই মাঝারী কৃষকে উন্নতি প্রসঙ্গের কথা বলা হয়েছে। তবে তারা বলেন যে "The proportion of house holds in ixtreme poor status has remain largely unchanged" কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষকের সার্বিক পরিস্থিতির কোন উন্নতি হচ্ছেনা[১৯]

১৮ বদরুদ্দিন উমর, বাংলাদেশের গনতান্ত্রিক স্বৈরাতন্ত্র, ১৯৯৭,

১৯ আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, *গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সংকট*, প্রকাশক মোঃ আব্দুল কাদের, কবি জসিম উদ্দীন রোড, পৃঃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

'৯২-'৯৩ অর্থবছরে সার বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৬.১৩ লক্ষ মেট্রিকটন, '৯৩ এর মার্চ পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে ১৬.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন। '৯১-'৯২ অর্থ বছরে একই সময়ে সার বিক্রি হয় ১৯.১ লক্ষ মেট্রিক টন। অর্থাৎ সার বিক্রির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে। '৯১-'৯২ অর্থ বছরে গমবীজ বিতরণ করা হয়েছিল ৩১ হাজার ১৬ মেট্রিকটন। '৯২-'৯৩ অর্থ বছরে এই বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৮.৩ হাজার মেট্রিক টন। এতে কৃষকেরা পর্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন করতে পারেনি ফলে খাদ্য ঘাটতির চতুর্থ অধ্যায় ১০৬

পরিমান দাড়ায় ১০ লাখ টনের মত। এতে খাদ্য শষ্যের দাম বৃদ্ধি পায়। বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী মাথাপিছু খাদ্য প্রাপ্তির পরিমান বার্ষিক ১.৫৮ কেজি থেকে ১.৬৪ কেজিতে হ্রাস পায়। প্রধানমন্ত্রী ৯৪ সালে চালের কেজি ৩০.১১ টাকায় নামিয়ে আনতে বলেন। অথচ তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫/১৬ টাকা ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ করার কথা চলা হলেও তা কার্যকরী করা হয় নাই।

দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিএনপি সরকার ১৯৯১ সালের ২৫শে জানুয়ারী ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইসতেহারে খালখনন কর্মসূচীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। উক্ত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া খাল খনন কর্মসূচীকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অধীনে সরাসরি এনে তার দেখাশুনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নিজেই বহন করেন। উল্লেখ্য '৮১ সনের ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো এবং বন্যা জলাবদ্ধতা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে শহীদ জিয়া খাল খনন প্রকল্পের কাজ শতকরা ৭৫ ভাগ স্বেচ্ছাশ্রমে এবং বাকিটা কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় শুরু করেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ঐ স্বেচ্ছাশ্রম কর্মসূচীতে অংশ নিয়ে সেই কাজে সফল হয়েছিল। খালেদা জিয়া সরকার এই কাজে তেমন সফল হতে পারেনি। বরং খাল খনন কর্মসূচীর নামে খরচ হয়েছে কোটি কোটি টাকা, যেটি ছিল রাষ্ট্রের একটি বিরাট অপচয়। প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকার এই ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে এমপিদের কাছে লেখা চিঠিতে বলেন যে, "বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে স্বেচ্ছাশ্রমের অংশ কমিয়ে শতকরা ৫০ ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু বিগত বছরে এই কর্মসূচীতে সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। জন প্রতিনিধিদের সহযোগিতা ছাড়া খাল খনন কর্মসূচী সফল করা সম্ভব নয়। খাল খনন কর্মসূচী সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী ব্যাপক

Dhaka University Institutional Repository

গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে আপনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন এবং আপনার সক্রিয় সহযোগিতায় আপনার এলাকায় এই কর্মসূচী সফল হবে।"[২০]

১৯৯২-৯৩ সালে খাল খনন কর্মসূচী সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বলা হয় যে, '৯১-'৯২ অর্থ বৎসরে খাল খনন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে বিলম্বে কর্মসূচী শুরু, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন প্রকল্প চূড়ান্ত করণ, অনুমোদনে বিলম্ব এবং দুর্নীতি। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কেবল হাজা ও মজা পুকুর পুনরায় খনন ও পানি সংরক্ষনের জন্য বাঁধ নির্মান প্রকল্প খাল খনন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায় ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে খাল খনন কর্মসূচীর জন্য ৩৫ হাজার মেঃ খাদ্য শস্য বরাদ্দ ছিল। এ থেকে ১৩১ টি প্রকল্পের বিপরীতে ২২ হাজার ৪০০ মেঃ খাদ্য শস্য অব্যবহৃত থেকে যায়। "সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী কার্যালয়ের মূখ্য সচিব আ.ন.ম ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খাল খনন কর্মসূচীতে নির্বাহী কমিটির এক সভায় কাজের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত ৪৮ টি জেলা হইতে খাল খনন কর্মসূচী বাস্তবায়নের সঠিক অগ্রগতির হার হচ্ছে শতকরা ৩১ ভাগ। এছাড়া ৩০ এপ্রিল ৯৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত ৯৭ টি জেলা হইতে প্রতিবেদন অনুসায়ী সার্বিক অগ্রগতির হার হচ্ছে ৩৮.৫৫ শতাংশ। সভায় ৯৪-৯৫ অর্থ বছরে খান খনন কর্মসূচীর জন্য ৩৫ হাজার মেঃ টন খাদ্য শস্য বরাদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।"[২১]

বিএনপি খালকাটা কর্মসূচির জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্যের সংস্থান করে বেকার সমস্যার সমাধান করলেও দারিদ্র দূরীভূত হয়নি বরং এজন্য রাষ্ট্রের অনেক অর্থ অপচয় হয়েছে। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী প্রচুর টাকা খরচ করে বিভিন্ন জায়গায় যেতেন। অথচ ঐ কাজ একজন ডিসি এসপি বা চেয়ারম্যান ও করতে পারতো।

[২০] দৈনিক সংবাদ, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ৯৩
[২১] দৈনিক সংবাদ, ৫ই জুন , ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপির ৫ বৎসরে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহ অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে । ঋণ প্রবৃদ্ধি স্বীকার হয়ে আর্থিক খাত এখন হাবুডুবু খাচ্ছে। কলমানি মার্কেটিং ব্যাংক রেট ২০-২৫ শতাংশে উঠেছে। মুদ্রাস্ফীতির হার ৯ শতাংশের উপরে গিয়ে উঠেছে। ভুয়া কাগজপত্র ও নামে বেনামে ঋণ নেওয়ার ঘটনা এরশাদ আমলের চেয়ে বেশী ঘটেছে। এরশাদের ৮১-৮২ অর্থ বছর থেকে ৯০-৯১ অর্থ বছর পর্যন্ত ১০ বছরে ঋণ স্থিতীশিল ছিল ২৪হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা । আর্থিক ঋণ প্রবৃদ্ধির পরিমান ছিল ২০ হাজার ৬'শ ২০ কোটি টাকা। অপরদিকে ৯১-৯২ অর্থ বছর থেকে ৯৪-৯৫ অর্থ বছর পর্যন্ত ৪ বছরে ঋণ স্থিতি ২৪ হাজার ৪'শ ৭৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৩৯ হাজার কোটি টাকা। আলোচ্য ৫ বছরে ঋণ প্রবৃদ্ধির পরিমান ১৪ হাজার ৫'শ ২৫ কোটি টাকা। পরবর্তী ৯৫-৯৬ অর্থ বছরের শুরু থেকে বিদায়ের আগ পর্যন্ত এ ঋণের পরিমান বৃদ্ধি পায় ৩৫০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিএনপির ৫ বছরে ১৮ হাজার কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করা হয়েছে। কিন্তু শিল্পায়নে তার ছাপ পাওয়া যায় নি। ঋণ দাতা প্রতিষ্ঠান গুলোর খাতা কলমে ঐ পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেটা কোথায় কিভাবে ব্যয় হয়েছে, রিটান কি এসব হিসাব কমই আছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। বিতরণকৃত ঋণের সিংহ ভাগই ব্যাংক তহবিলে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। ৯১ সালে ক্ষমতায় এসে সরকারের অর্থমন্ত্রী এরশাদের শাষন আমলে ব্যাংকিং খাতে লোপাটের বিরুদ্ধে হুংকার দেন। ঋণ খেলাপীদের নামের তালিকা প্রকাশ করে পত্রিকায়। আইন কানুন কঠোর করা হয়। অর্থ ঋণ আদালতও গঠন করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এর কোন প্রয়োগ করা হয় নাই।[২২]

[২২] দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ই এপ্রিল, '৯৬

Dhaka University Institutional Repository

ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (আইএফএডি) এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের ১৪৪ টি দরিদ্র দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ৫ম। তাদের মতে গ্রামীণ জনগণের ৮৬% দরিদ্র এবং শহরাঞ্চলে দরিদ্রের সংখ্যা ৫৩ ভাগ [১৩] বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্য নিরূপনের জন্য ঢাকাস্থ বিআইডিএস "1987-94 Dynamics of rural poverty in Bangladesh" শীর্ষক একটি গবেষনা জরীপ পরিচালনা করে। উক্ত জরীপে গবেষনায় Analyses of poverty trend project, 62 Villages Re-Survey, 1995 অর্ন্তভূক্ত ছিল। প্রতিবেদনটির সারসংক্ষেপে মূল গবেষনা প্রতিবেদনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যায়। এ চিত্রে বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্রের যে অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে তাতে প্রতীয়মান হয় আশির দশকের চেয়ে ৯০ এর দশকে বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের অবস্থার উন্নতি ঘটেছে।[১৪]আয় পরিমাপের বিচারে গ্রামীণ দারিদ্র্য জনসংখ্যা ১৯৮৭ সালের ৫৭% থেকে ১৯৯৪ সালে ৫১.৭% হ্রাস পায় । মাঝারি দারিদ্র্য ১৯৮৭ সালে ৩৭.৭% থেকে ১৯৯৪ সালে ৩৯.২% এবং অনপেক্ষ দারিদ্র্য ২৫.৮% থেকে ২২.৫% নেমে আসে। গ্রামীন অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস একটা মস্ত বড় ঘটনা । এটা ঘটেছে গ্রাম থেকে মানুষ চলে আসার জন্য এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসের জন্য।[১৫]ইউএনডিপি সর্বশেষ মানব উন্নয়ন রিপোর্টে (১৯৯৫-৯৬) এ উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশের লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ৬ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে।

[১৩] আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, *গণতন্ত্র, নেতৃত্ব ও উন্নয়ন*, প্রশাসক মোঃ আব্দুল কাদের, ১৬ কবি জসিম উদ্দীন রোড, পৃঃ ৯১।

[১৪] হিরালাল বালা, বাংলাদেশের দারিদ্রঃ অতীত ও বর্তমান, আরেক সামসুর রেহমান, *বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃঃ১৮৮।

[১৫] বিআই ডিএস তথ্য সূত্র ১৯৯৪,

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণে '৯৪-'৯৫ অর্থ বাজেটে বরাদ্দ করে ২০ কোটি টাকা কিন্তু সংশোধিত বাজেটে তা দাঁড়ায় মাত্র ৫ কোটিতে। বিশেষজ্ঞদের মতে বেগম জিয়ার ডাল-ভাতের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হলে প্রবৃদ্ধির হার করতে হবে ৯ শতাংশ এবং জাতীয় আয়ের ৩৬% করতে হবে বিনিয়োগ। বেকারের সংখ্যা প্রায় ২ কোটির উপরে। তাদের কর্মসংস্থানের তেমন কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। বরং গোল্ডেন হ্যান্ড শেকের নামে ৩৫টি পাটকলের ১ লাখ শ্রমিককে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয় অতিরিক্ত এই অজুহাতে। এই শ্রমিক ছাঁটাই এর প্রভাব পড়ছে অর্থনীতির উপর, "Asia development outlook (ADO) '৯২তে বলা হয়েছে যে Enormous national economic loss in terms of economic opportunities forgone due to lengthy delays interm of economic decisions in project implementation" রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দলীয় কোন্দলের জন্য ৫ম সংসদের প্রথম দিকে বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেয়। "Try as it midht the goverment of primeminister Begum Khalada Zia is still sruggling to boost investment, analysis blame this partly on appartment lack of policy coordination, pointing to contradictions with in verious ministers on ts measures, trade reforms, export incentives an cutbas in public sector enterprises"[26] ১৮ই জানুয়ারী ৯৩ ঢাকায় দেশী বিদেশী বিনিয়োগ কারীদের উপস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুত উইলিয়াম ডি মাইলাম বলেন যে Investment Policies are still not conbucive to domestic investment, not to mention of foreign investment. তার মতে এই বিনিয়োগের প্রধান প্রতিবন্ধকতা আমলাতন্ত্র ও আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি[27]

26 *Far Eastern Economic Review*, 1992, 31 December

[27] আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, *গণতন্ত্র, নেতৃত্ব ও উন্নয়ন*, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও ৯৪-৯৫তে কিছু কিছু অর্থনৈতিক সংস্কার হয়েছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ ১৯৯৭ সালে অর্থনীতির উপর কাজ করে এই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন যাতে কাজ করেছেন বিভিন্ন লেখক। এর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনের প্রধান রেহমান সোবহান। ওয়াহিউদ্দিন মাহমুদ ৯০ দশকের প্রথম কয়েক বছরের সমষ্টিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্টের কথা লিখেছেন। নিম্নহারে মুদ্রাস্ফীতি, অদৃষ্টপূর্ব বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ সরকারের বাজেট পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ইত্যাদিকে একদিকে সফল সমষ্টিক অর্থনীতি, স্থিতিশীলতা অন্যদিকে স্থবিরতার লক্ষণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। '৯৪তে জিডিপিতে আমদানীর শতকরা হার ছিল ১৬.৩ সেখানে '৯৫তে এসে দাড়ায় ২১.৪ এ। ওমর হায়দার রাজস্ব খাতের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, '৯০-'৯১ তে মোট রাজস্ব আয় ছিল ৮১৭৭ কোটি টাকা, '৯৫-'৯৬ তে তা দাড়ায় ১৫৬১২ কোটি টাকা। আমদানী শুল্ক হ্রাসের ফলে আমদানী থেকে প্রাপ্ত আয় কমেছে অন্যদিকে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক থেকে আয় বেড়েছে। '৯০-'৯১ প্রত্যক্ষ করের সব মাধ্যম মিলে দাড়ায় ১৫০৭ কোটি টাকা। '৯৫-'৯৬ তে বেড়ে দাড়ায় ৫৯.৯২ কোটি টাকা। বৃদ্ধির শতকরা হার ৫৯.৯২ কোটি টাকা অন্যদিকে একই সময়ে পরোক্ষ কর ছিল যথাক্রমে ৫২.৬২ কোটি টাকা ও ৯৮.২৩ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ৭৬.০৪ কোটি টাকা। এই বৃদ্ধির চাপ পড়েছে সাধারণ জনগণের উপরে। উন্নয়ন ব্যয়ে দেশীয় সম্পদের অংশ গ্রহণ বেড়েছে, কিন্তু উন্নয়ন কর্মসূচীর আকার না বাড়লে এটি ইতিবাচক কিছু নির্দেশ করে না[২৮]।

Dhaka University Institutional Repository

২৪শে জানুয়ারী '৯৫ বিনিয়োগ বোর্ড ও লন্ডন ভিত্তিক প্রকাশনা ইউরোমানি যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে যার মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশী বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য সম্ভাব্য খাত সনাক্ত করা। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের এত বড় সম্মেলন এই প্রথম হলো। এর অন্যান্য উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা শেয়ার বাজারের সম্ভাবনা পর্যালোচনা সহ আঞ্চলিক বাজারগুলির সাথে তুলনা এবং বেসরকারী কর্মসূচী সহ যৌথ পুঁজি বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো দীর্ঘ ৪০ বছর পর চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে চালু করা [৯৯]এই বৎসর ঋণ খেলাপীদের বিরুদ্ধে সরকার তৎপর ছিলেন। এজন্য ব্যাংকের কয়জন পরিচালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন সমগ্র নির্বাচনে তারা যাতে অংশগ্রহণ করতে না পারে। এছাড়া বেশকটি নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন প্রাইম ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, সাউথ ইষ্ট ব্যাংক এবং ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক। এগুলিই ছিল বিএনপি সরকারের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য প্রসংসনীয় উদ্যোগ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণে প্রয়োজন হল সুষ্ঠ অর্থনৈতিক নীতিমালা। প্রশাসনে সমন্বয়, সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সু-সম্পর্ক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা মোট কথা গণতান্ত্রিক পরিবেশ যেটি ৫ম জাতীয় সংসদে দেখা যায়নি [১০০]

[৯৯] সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫।
[১০০] সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ শিক্ষা ব্যবস্থা

নিরক্ষরতা বা অল্পশিক্ষা দারিদ্র্যের সঙ্গী। এই দুটি অবস্থা সাধারণত একই সঙ্গে বিরাজ করে। শিক্ষার অভাব বা স্বল্পতা হেতু দারিদ্র্য সৃষ্টি হয় ও বৃদ্ধি পায়। এজন্য নিরক্ষরের হার অধিক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সফল দেশের অনেক পিছনে পড়ে আছে । শিক্ষা শক্তি যোগায় ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারে। একজন গরীব শিক্ষার মাধ্যমে তার জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারে। বুঝতে পারে তারা , কি ভাবে তাকে শাসন ও শোষন করছে। দ্বিতীয়ত শিক্ষা গরীবের কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা করে আয়ের পথ সৃষ্টি করতে পারে । অবশ্য এ শিক্ষা যে সর্বত্র প্রাতিষ্ঠানিক ও পুথিগত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। গরীবের জন্য এমন শিক্ষা প্রনয়ন ও কার্যকর করতে হবে যা তাদের আয় ও উন্নতির পথ সুগম করতে পারে । বয়স্ক শিক্ষা ও শিশু শিক্ষা কার্যক্রম ভিন্নভাবে বাস্তবায়ন করা দরকার ।[৩১]

বিএনপি সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন না আনতে পারলেও নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহন করে। অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং মেয়েদের জন্য এই শিক্ষা ফ্রি করা হয়। প্রাইমারী পর্যন্ত খাতা কলম স্কুল থেকে দেবার ব্যবস্থা করা হয়।" বি আই ডি এস এর ১৯৯৫ সালে ৬২ টি গ্রাম পুনঃজরিপ তথ্যে জানা যায় যে ১৯৯০-১৯৯৫ সালে ৬-১০ বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ৫৬ থেকে ৭০ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্র ছাত্রীর বৈষম্যের হার ১৯৯০ সাল থেকে কমে ১৯৯৫ সারে নেই বললেই চলে। অবশ্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ততটা বাড়েনি, যা মাত্র ২% ধরা যায়। ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি এ পর্যায়ে পূর্বের মতই ব্যাপক"[৩২]

[৩১]হীরালালবালা, বাংলাদেশের দারিদ্র ; অতীত ও বর্তমান, *বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর,* সম্পাদনা, তারেক সামছুর রেহমান, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯ পৃষ্ঠা-১৯৫।

[৩২]১-৩-১৯৯৪ তারিখে সংসদে প্রশ্নোত্তর দানকালে শিক্ষামন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্য অনুসারে। *দৈনিক সংবাদ, ২রা মার্চ, ১৯৯৪.*

Dhaka University Institutional Repository

২য় সংসদীয় সরকারের আমলে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় করা হয় এবং প্রতিটি বাজেটেই এখাতে বেশী ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু এতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা লাভবান হয় নাই। কেননা ক্যাডেট কলেজ গুলিতে ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়।"শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির যে কথা আগে বলা হতো এবং বিএনপি সরকারও সেই কথা বলছে, তা মূলত ব্যয় হয়েছে একদিকে ধর্মশিক্ষা অপরদিকে ক্যাডেট কলেজ, মডেল কলেজ ইত্যাদির খাতে। মাদ্রাসা মসজিদ ইত্যাদির সংখ্যা স্বাধীনতার পর থেকে বৃদ্ধি পাচেছ এবং এক ঠালা ভাবে এক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি চলছে। এতে আধুনিক কারিগরি বা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা বিকাশে গুরুত্ব রাখে না। বর্তমানে ছাত্র শিবির ও জামাতে ইসলামীর যে শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে তার মূলে আছে শিক্ষাখাতে সরকারের এই ধরনের ব্যয় বৃদ্ধি । এই ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক জীবনের এবং গনতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার বিকাশের সাথে সম্পর্কিত ভাবে কোন শিক্ষার বিস্তার ঘটেনা এবং এই পরিস্থিতিতে দেশের জনগন সামগ্রিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও লাভবান হন ধনীক শ্রেনীর লোকেরা এবং তাদের আন্তর্জাতিক রক্ষক সাম্রাজ্যবাদ।"[৩৩]বিশ্বব্যাংকের মতে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ করা হলেও এই খাতে সেবার মান বাড়েনি। শিক্ষা খাতের সমীক্ষায় বলা হয়েছে ৫ শতাংশ শিক্ষকই অনুপস্থিত থাকেন এবং ১০০ জনের উপস্থিত থাকেন ১ জন শিক্ষক, এই সময় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কমেনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সন্ত্রাস দূর করার জন্য সংসদে প্রস্তাব আনার পর সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হয় সরকারী দলের তালিকা বিরোধী দল তৈরী করবে আর বিরোধী দলের তালিকা সরকারী দল তৈরী করবে। এই প্রস্তাবের পর সেই কমিটিকে আর কাজ করতে দেওয়া হয় নাই ।

[৩৩] ভোরের কাগজ ৩রা জুলাই, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ

সুদীর্ঘ গনতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা অর্জন করে। কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকর ভাবে পরিচালিত করার জন্য যে রাজনৈতিক কৃষ্টি দরকার তা এখানে অপ্রতুল। যে রাজনৈতিক কৃষ্টি দেশে বিরাজিত তা প্রতিনিয়তই একটি স্থিতিশীল সংসদীয় পদ্ধতিকে বিঘ্নিত করে তোলে। অভিসন্দর্ভের এই অংশে ১৯৯১-১৯৯৬ সংসদীয় সরকারের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সমূহ আলোচনা করা হচ্ছে। এ সময়ের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সমূহ প্রধানতঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। তবে এর পাশাপাশি গোলাম আযমের মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা প্রসঙ্গ, ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে প্রলম্বিত ও ঘনীভূত করেছে। উল্লেখ্য এসব বিষয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্য মতের মাধ্যমে সংসদে বসেই সমাধানের সূত্র বের করা সম্ভব ছিল। কিন্তু দেশে বিরাজিত রাজনৈতিক কৃষ্টি সংসদীয় পদ্ধতির তথা গনতান্ত্রিক রাজনীতির অনুকূলে নয়। যার ফলশ্রুতিতে সংসদে সরকার ও বিরোধী দল একসাথে কাজ করার সন্তোষ জনক সময় কাল অতিক্রম করতে পারে নাই। তাই ৫ম জাতীয় সংসদ যে গগনচুম্বী আকাংখা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল তা অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়ে। এ সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট হয়ে দাড়ায়, বিরোধী দলের ঘন ঘন ওয়াক আউট, বয়কট এবং সরকারী দলের, বিরোধী দলের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার প্রতি অসহনীয় মনোভাব সংসদকে শেষ পযন্ত অকার্যকর করে দেয়। নিম্নে আলোচিত সময়ের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সমূহ আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১ গোলাম আযম প্রসঙ্গঃ

১৯৯১ সালে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রশ্ন রাজনৈতিক অঙ্গনকে উত্তপ্ত করে তোলে। ১৯৯১ সালের ২৯শে নভেম্বর গোলাম আযমকে জামাতে ইসলামী দলের আমীর নির্বাচিত করা হয়। তবে তিনি প্রায় একযুগ ধরে জামাতে ইসলামীর অঘোষিত আমীর ছিলেন । এই প্রথম তিনি ঘোষনা দিয়ে বাংলাদেশর রাজনীতিতে সরাসরি অংশ গ্রহনের উদ্দেশ্যে আত্ম প্রকাশ করেন। এক মাত্র জামাতে ইসলামী বাদে সবগুলি বিরোধী রাজনৈতিক দল গোলাম আজমের বিচারের দাবীতে সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে। আওয়ামীলীগ এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, গোলাম আজমকে দেশ থেকে বহিষ্কার না করে বিশেষ ট্রাইবুনালে যুদ্ধাপরাধীর অভিযোগে বিচার করতে হবে। আওয়ামীলীগে দুজন সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন আহমেদ ও আব্দুল রাজ্জাক - গোলাম আজমকে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, গনহত্যা, বুদ্ধিজীবি হত্যা, নারী ধর্ষন এবং স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর সংগঠক হিসাবে অভিযুক্ত করে বলেন " তিনি ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে জামাতের সংসদ সদস্য শেখ আনসার আলী বলেন "গোলাম আজমকে আমীর পদে নির্বাচন করে জামাত কোন ভুল করে নাই" ।[১]

এর জবাবে ২রা জানুয়ারী বিকেলে মন্ত্রী পরিষদে একজন কর্মতর্কা বলেন, বঙ্গ সুলভ কোন বিদেশী নাগরিকের বাংলাদেশের রাজনীতিতে অংশ গ্রহনে কোন বাধা নেই । তাছাড়া বাইরের কেউ দেশের রাজনীতিতে জড়িত হতে পাবরে না এমন কোন সুনিদিষ্ট আইন পাশ করা হয়নি।[২]

১.শাহরিয়ার কবির, *গনআদালতের পটভূমি*, দিব্য প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ১৩৫

[২] দৈনিক বঙ্গ, ঢাকা, ৩রা জানুয়ারী, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯২ এর ২৬ শে মার্চ বিশিষ্ট নাগরিক ও আইনজ্ঞদের সমন্বয়ে গনআদালত গঠন করা হয়। এর আগে ১৯ শে জানুয়ারী দেশের ১০১ জন বিশিষ্ট নাগরিক একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন করে ২৫শে মার্চ এর মধ্যে গোলাম আযমকে দেশ থেকে বহিষ্কারের দাবী জানানো হয়। গনআদালতে গোলাম আযমের বিচার প্রসঙ্গে তার নাগরিকত্বের বিষয়টিও নতুন করে আলোচিত হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আদেশের (অস্থায়ী বিধান) ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গোলাম আযমসহ মোট ৩৯ জনকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের অনুপযুক্ত বলে ঘোষনা করা হয় । এর কারণ হিসাবে গেজেট নোটিফিকেশনে বলা হয় "এসব ব্যক্তি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে থেকে বিদেশে অবস্থান করছিলেন। এদের আচারন ও বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না এবং এরা পাকিস্তানে অবস্থান করছেন"।[৩] এভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে এই গোলাম আযম প্রসঙ্গ রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তোলে। স্বাধীনতার দীর্ঘ ২৩ বৎসর পর গোলাম আযমকে কেন্দ্র করে জাতি স্বাধীনতা পক্ষ ও স্বাধীনতা বিরুদ্ধ এই দুইটি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পরে।

২৩ শে মার্চ রাতে সরকার দুটি নোটিশ জারী করে। একটি গোলাম আযমের উপর - কেন তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য। অপরটি গনআন্দোলনের উদ্যক্তাদের উপর - গনআদালত গঠন করার জন্য কেন উদ্যক্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবেনা তার কারণ দর্শানোর জন্য। গোলাম আযমের বহিষ্কারের কারণ হিসাবে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে বিদেশী নাগরিক হিসাবে অবৈধ ভাবে বাংলাদেশে অবস্থান এবং সংবিধানের ৩৮ ধারা লংঘন করে একজন বিদেশী নাগরিক হওয়া সত্বেও জামাতের আমীর হওয়া। এই নোটিশে গোলাম আযমের একাত্তরের গনহত্যা বা তৎসংক্রান্ত কোন অভিযোগের উল্লেখ ছিল না ।[৪]

[৩] শাহরিয়ার কবির, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৪।

[৪] আজকের কাগজ ২৭ শে মার্চ ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধ অপরাধী গোলাম আযমের বিরুদ্ধে সরকারের তরফ থেকে কোন রকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি দেখে, সরকার যাতে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনে জনগনের সমর্থন ও রাজনৈতিক সহযোগিতা অর্জন করে সে লক্ষ্যেই ২৬শে মার্চ জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গনআদালত গঠন করা হয়। ২৮শে মার্চ বিএনপি সরকার গনআদালতে অংশ গ্রহনের অভিযোগে জাহানারা ইমামসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদোহিতার মামলা দায়ের করে। মামলার প্রাথমিক তদন্তি শেষে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়।

১৯৯২ সালের ৯এপ্রিল গনআদালতে গোলাম আযমের বিচার সম্পর্কে বিবিসি কে বলেন, "গোলাম আযমের বিচার অনুষ্ঠানের দাবী আন্দোলনের বিষয়বস্তু হতে পারেনা, কারণ বিশ বছর পর এই নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করার কোন সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। .....গোলাম আযম ইস্যুকে সম্পূর্ন আইনগত দিক থেকে দেখতে হবে। এখানে গোলাম আযমের বর্তমানে কোন রকম সিটিজেনশিপ নাই। তিনি এখন 'ষ্টেটলেস্‌পার্সন'। কারণ ১৯৭৮ সালে তিনি বাংলাদেশে আসার পর পাকিস্তানের সিটিজেনশিপ পরিত্যাগ করেছেন এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন করেছেন । ..... আমাদের বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোন ষ্টেটলেস্‌পার্সনকে আমরা ডিপোর্ট করতে পারিনা। .... একটা এস্টাব্লিসড সরকারের পাশাপাশি , একটা এসটাব্লিসড রাষ্ট্রীয় আদালত ব্যবস্থার পাশাপাশি, কোন রকম প্যারালাল বা সমান্তরাল আদালত বসতে পারে না। এ প্রশ্নটা আমরা আদালতে নিয়ে গেছি। যারা এসব কর্মকান্ডের জন্য দায়িত্ব বহন করছেন, তাদের কাঠগড়ায় যেতে হবে। সেখানে যদি তারা নিজেদের নির্দোশ প্রমান করতে পারেন, অবশ্যই তারা ছাড়া পাবেন"।[৫]

[৫] দৈনিক সংবাদ ২০ শে এপ্রিল ,১৯৯২ ।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদে দীর্ঘ আলোচনা ও বির্তক এবং সংসদের বাইরে প্রবল আন্দোলনের মুখে ১৯৯২ সালের ২৯ শে জুন বিএনপি সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে চার দফার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী সরকার গণআদালতের ২৪ জন উদ্যাক্তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করার শর্ত মেনে নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ চুক্তি কার্যকর করা হয়নি। ১৯৯২ সালের ২৪শে মার্চ অবৈধ ভাবে বাংলাদেশে বসবাস করার অভিযোগে গোলাম আযমকে গ্রেফতার করার পর তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। এক বছর পর ১৯৯৩ এর ২২শে মার্চ হাইকোর্ট গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনবর্হালকরে রায় প্রদান করে। However the government of Begum Zia carefully called for a legal measure, and thereby, settled the burning citizenship issue of Golam Azam. Neverthless, the Psychological and emotional scares caused by Azams citizenship issue are, in fact, more destructive than the physical damage".[৬]

[৬] M. Nazrul Islam, Parliamentary Democracy in Bangladesh : *An Assessment, Perspective In Social Science Review, 1998, Page, 10*

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম আযম ইস্যু সরকার কর্তৃক আদালতের মাধ্যমে নিস্পত্তি হওয়া সত্বেও এটি রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবেই থেকে যায়। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিরোধী শিবিরে অভিনব মেরুকরনের সূত্রপাত হয় এবং রাজনৈতিক অঙ্গনকে উত্তপ্ত করে তোলে। তবে এই ইস্যুর দ্বারা সৃষ্ট স্বাধীনতার পক্ষের এবং স্বাধীনতার বিপক্ষের মেরুকরণ প্রক্রিয়ায় প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগ লাভবান হয় বেশী। আঃলীগের এই দলীয় শক্তি বৃদ্ধি করণ প্রচেষ্টা পরবর্তী কালে তত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলনে সকল দলকে একত্রিত করতে সহায়তা করে এবং আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। যদিও বিএনপি বিরোধী আন্দোলনে গোলাম আযম ইস্যু তেমন জোরদার হয়ে উঠতে পারেনি, কিন্তু পরবর্তী কালে গোলাম আযমের নিজস্ব দল জামাতে ইসলামী, প্রধান বিরোধী আওয়ামীলীগ এবং পতিত স্বৈরাচার জাতীয় পার্টির যুগপৎ আন্দোলনের ফলে জামাতে ইসলামী নিজেই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে জাতীয় পার্টি, আওয়ামীলীগ ও বিএনপিকে আরও শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাড় করিয়েছে। দেখা যায় যে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিএনপি জামাতের সমর্থন নিয়ে দল গঠন করলে সবাই বলেছে বিএনপি রাজাকারদের সাথে একত্রিত হয়ে সরকার গঠন করেছে। একই ভাবে আবার যখন প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগ ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে তত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলনে জামাতকে সাথে নিয়ে দল ভারী করে তখনও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছিল এবং স্বাধীনতা আনয়নকারী দল আওয়ামীলীগ স্বাধীনতা বিরুদ্ধ দল জামাতের সাথে আতাত করার জন্য জনসমালোচনার সম্মুখীন হয়। জামাতের ইসলামী রাজনৈতিক ময়দানের সম্মুখ ভাগে এসে অন্য দলগুলিকে যতটা উপরে উঠিয়েছে নিজে ততটা নিচে পতিত হয়েছে। এটি বোঝা যায় ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের আসন দেখে। আর এভাবেই ৫ম জাতীয় সংসদের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ধর্মভিত্তিক দল জামাতের ইসলামীকে কোনঠাসা করে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২ ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক

" বেশীর ভাগ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি তার ভৌগলিক অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয় ।এক্ষেত্রে নিকটত রাষ্ট্র বা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আচারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে "।[৭] বাংলাদেশের চতুপার্শ্ব ভারতের অবস্থান হওয়ায় ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জার্তিক নীতি বাংলাদেশের রাজনীতিকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করে । তাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ভারত বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক । এবিষয়টি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ ইস্যু হিসাবে দেখা দেয়। সাধারণ ভাবে দেশের সব রাজনৈতিক দল বিশেষত আওলীগ , বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামী ডাইনী খোজার মত ভারত পন্থী এবং ভারত বিরোধী প্রচারনায় লিপ্ত।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভুমিকার কারনে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আওলীগ সরকারের আমলে ভারত বাংলাদেশ সুসম্পর্ক বজায় ছিল । ভারতীয় রাজনীতির প্রতি শেখ মুজিবের বরাবরই একটা আগ্রহ ছিল যার জন্য ৭২ সালে তিনি যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেন তার সাথে ভারতের মডেলের অনেক মিল ছিল। যেমন (ক) সংসদীয় ব্যবস্থায় একদলীয় প্রাধান্য (খ) অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি (গ) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি (ঘ) জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি । শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারীতে ও ১৯৭৪ সালের মে মাসে এই ২ বার ভারত সফর করেন । অন্যদিকে ১৯৭২ এর ১৭ মার্চ প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফর করেন এবং ঐ সময় উভয় দেশের মধ্যে ২৪ বৎসরের একটি মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয় । এই চুক্তিকে গোলামি হিসাবে আখ্যায়িত করা হলেও অধ্যাপক রেহমান সোবহানের মত গবেষকরা মন্তব্য করেছেন, উক্ত চুক্তিতে বিতর্কিত তেমন কোন বিষয় নেই । তবে আসল কথা হচেছ ভারত শুধুমাত্র বাংলাদেশের সাথে এধরনের চুক্তি করেনি । একই সাথে নেপাল ও ভারতের সাথে এধরনের চুক্তি করেছে । [৮]

৭. Jules Canbon, *The Permanent Bases Of Foreign Policy, New York* (Council of Foreign Relations) 1951, P-2.

৮. Imtiaz Ahmed, *State And Foreign Policy: India's Role In Southasia*, Academic Publishers 1993, P-269-304.

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত চুক্তিতে বাংলাদেশের দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্র ভারতের প্রভাবে আনা হয়েছিল বলে উক্ত ধারণা করা হয় ।

১৯৯১ সালের সংসদীয় সরকার বিএনপি যেহেতু এর প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও নীতির উপর গড়ে উঠে তাই জিয়া অনুসৃত বৈদেশিক নীতি তারা অনুসরণ করে ।" নতুন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান উল্লেখ করেছিলেন যে ,বর্তমান বিএনপি সরকার জিয়াউর রহমান সরকার অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করবে ।[৯] ১৯৭৫ সালের পর জেনারেল জিয়া রাজনীতিতে এসে মুজিব অনুসৃত বৈদেশীক নীতির ব্যাপক পরিবর্তন করেন। এসময় ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবনতি দেখা দেয় । এটা হয়তো জেনারেল জিয়া কতৃর্ক বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষনা দেবার জন্য ও সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজনের জন্য । "Mujibs foreign policy....suited India" becase it was in conformity with one of the major thrusts of India's foreign policy in the South Asian region.....Zia on the other hand atleast innitially, was anti Indian as he declared his determination not to "accept expansionism and hegemony"[১০] একই ভাবে বেগম জিয়ার সময়েও ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি হয় । তবে খালেদা জিয়া ভারতের সাথে মুজিব আমলের মতো হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক না হলেও প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও বৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। যার জন্য তিনি ক্ষমতায় এসেই ২৪শে মে ১৯৯১ রাজীব গান্ধীর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নয়াদিল্লী যান। এর পর ১৯৯২সালের মে মাসে পুনরায় ভারতে যান দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক জোড়দার করার জন্য ।

[৯] বেগম জিয়ার সাক্ষাৎকার, বিচিত্রা, বর্ষপঞ্জ, - ১লা জানুয়ারী ১৯৯২।

১০. Virendra Narain, *Foreign Pllicy Of Bangladesh (1971-81)* Jaipur Aalekh Publeshers 1987, P-207.

Dhaka University Institutional Repository

আলোচিত সময় কালে ক্ষমতাসীন বিএনপি ভারতের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহন করে তা হলো (১) তিন বিঘা করিডোর হস্তান্তর (২) অবৈধ অভিবাসী হস্তান্তর (৩) বানিজ্য চুক্তি প্রভৃতি। এছাড়াও ফারাক্কা বাধের ফলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া জাতিসংঘে ভাষন দেন কিন্তু এক্ষেত্রে কোন বাস্তব অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়না । অপর পক্ষে পাবত্য চট্টগ্রামে শরনার্থী ইস্যু ভারতের সৃষ্টি এসম্পর্কেও বিভিন্ন মহল বিশেষ করে বিএনপির মধ্য থেকেও কথা উঠে। যদিও এব্যাপারে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। আন্তসীমান্ত চোরাচালান, বানিজ্য ঘাটতি প্রভৃতি বিষয়ও বাংলাদেশের রাজনীতিতেও ভারতের অবস্থানকে একটি বির্তকিত অথচ অপরিহার্য ইস্যুতে পরিনত করে। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. **ছিটমহল হস্তান্তর ও করিডোর সমস্যাঃ-** ১৯৪৭সালের দেশ ভাগের পর ১৯৫৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহর লাল নেহেরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনের মধ্যে পাকভারত সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা, ছিটমহল এবং তিন বিঘা করিডোরের মালিকানা সংক্রান্ত বিবাধ মিমাংসা হবার সম্ভাবনা দেখা দিলেও বাস্তবে তা হয়নি। ১৯৬৫সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় এই ছিটমহল নিয়ে যুদ্ধ হয় কিন্তু তাতেও এসব ছিটমহল ভারতের দখলেই থেকে যায়। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৪৭ সালের ১৬ই মে দিল্লীতে ভারতের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর মধ্যে এক সীমান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ছিটমহল সমস্যার সমাধান আশা করা হয়েছিল কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের বিয়োগান্তক পরিনতির পর তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। বেরুবাড়ী হস্তান্তরের বিরোধীতা করে নৈক বাংলাদেশী নাগরিক ঢাকা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। মামলার রায়ে বিচারপতি গন এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বেরুবাড়ী কোনদিনই পাকিস্তানের দখলে ও কর্তৃত্বে ছিল না। তারা মামলা টি খারিজ করে দিলে বঙ্গবন্ধু সরকার বেরুবাড়ীর কগজী হস্তান্তর করে । অন্যদিকে ১৯৭৪ সালে মুজিব ইন্দিরার চুক্তিতে তিন বিঘা স্থায়ী ভাবে বন্দোবস্ত দেয়ার কথা থাকায় তা বাংলাদেশের ভূ-খন্ড হিসাবে স্বীকৃত বলে জনৈক ভারতীয় নাগরিক কলকাতা হাইকোর্টে উক্ত চুক্তি ভারতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী বলে আখ্যায়িত করে এবং

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তিটি বাতিলের দাবী জানিয়ে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর মামলা শুনানীর পর কলকাতা হাইকোর্ট এবং দিল্লী সুপ্রীম কোর্ট মামলাটি খারিজ করে।

১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসে ১৯৭৪ সালের ১৬ ই মে স্বাক্ষরিত মুজিব ইন্দিরা চুক্তির কিছু শর্ত রদবদল করেন- যা স্বাধীন সার্বভৌম অনুকূলে নয় । জেনারেল এরশাদ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য জান কবুল করে অনেক ভাষন দিয়েছেন , কিন্তু চুক্তি করেছেন যে তিনবিঘার উপর ফ্লাই ওভার নির্মান করা হবে যাতে ভারতীয় কতৃর্ত্ব ও সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে। বাংলাদেশের সামরিক - আধাসামরিক বাহিনীসহ নাগরিকগন যাতায়াত করতে পারবে নির্বিঘ্নে । বছরে এক টাকা খাজনার বিনিময়ে তিনবিঘা জমি বাংলাদেশের নাগরিক ব্যবহার করতে পারবে। ঐ টাকা ভারত সরকারের রাজস্ব খাতে জমা হবে।

১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর সংসদীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে তিনবিঘা করিডোর সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত গুলি নিম্ন রূপ ছিল

(ক) ভারতীয় সার্বভৌমত্ব বোঝানোর জন্য তিনবিঘা করিডরের চার কোনাতেই ভারতীয় পতাকা উড়বে।

(খ) তিনবিঘার চারদিকে বেড়া থাকবে। বেড়াটি তৈরি ও রক্ষনাবেক্ষনে ভার থাকবে ভারত সরকারের উপর ।

(গ) তিনবিঘা করিডোরে যানবাহন চলাচলের নিয়ন্ত্রন থাকবে ভারতের হাতে ।

[১১] অধ্যাপক আবু সাইয়িদ , "মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী : আমার প্রিয় পতাকা কোথায়? " *দৈনিক ভোরের কাগজ,* ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ৫ দ্রঃ

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের সাথে বেগম খালেদা জিয়া সরকারের আমলে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির ফলে বিরোধী দলের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বিরাজমান সরকার বিরোধী আন্দোলনের ইন্ধন হিসাবে এই বিষয়টিও যুক্ত হয়। বিরোধী দল আওয়ামীলীগের পক্ষথেকে এ চুক্তি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবমাননা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

(২)**ফারাক্কা ইস্যুঃ** বাংলাদেশ ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফারাক্কা সমস্যা একটি প্রধান ইস্যু। বাংলাদেশের প্রায় সকল নদী হিমালয় থেকে উৎসারিত হয়ে ভারতের উপর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে। এমনি একটি আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার উজানে বাধ দিয়ে ২০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করে ৭৫ ফুট উচু ও ৭০০ ফুট ফারাক্কা বাধ নির্মান করে বাংলাদেশ কে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত পানি সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে,যেটি ছিল আন্তজার্তিক আইনের লংঘনের সামিল। ১৯৭৫ সালে এই বাধ চালু হয় কিন্তু নির্মান কাজ শেষ হয় ১৯৬২-৭০ সালের মধ্যে। ১৯৭২ সালে পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এর অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল ফারাক্কা সমাস্যার সমাধান। স্বাধীনতা উত্তর কালে তাদের নেতৃত্বে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে শেখ মুজিব এ ব্যাপারে দৃঢ় কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি, কারণ তখন বাংলাদেশ ছিল একটি বিধ্বস্ত রাষ্ট্র যেটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের উপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিল। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ছিল ব্যাপক। উপরন্ত আওয়ামী লীগ এর পররাষ্ট্র নীতি ছিল ভারত ঘেষা। এজন্য ভারতের বিরুদ্ধে ফারাক্কার প্রশ্নে কোন সবল পদক্ষেপ নিতে পারেনি। তবে ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে যখন ২৪ বৎসরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেখানে ফারাক্কা প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই চুক্তির ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়, " বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নদী অববাহিকায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে যৌথ সমীক্ষায় ও যৌথ কার্যক্রম গ্রহনে চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন উভয় পক্ষ একমত হয়েছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী দ্বয়ের যুক্ত ঘোষনার ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে উভয় দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদী সমূহের ব্যাপক জরীপ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে উভয় দেশের জন্য প্রকল্প প্রনয়ন ও সেগুলির বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই দুই দেশের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে স্থায়ী ভিত্তিতে যৌথ নদী কমিশন গঠন করা হবে।[১২] তবে এই সময় উভয়ের মধ্যে ৪১ দিনের স্বল্প মেয়াদী একচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে ভারত একতরফা ভাবে পানি প্রত্যাহার করতে থাকে। যা বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর মারাত্নক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

১২. জনকণ্ঠ, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালে আওয়ামীলীগ শাসনের অবসান হলে জেনারেল জিয়া ১৯৭৬ সালে ক্ষমতায় আসেন। তার নেতৃত্বে ১৯৭৭ সালের নভেম্বরে ৫ বৎসর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । এটি ছিল জিয়ার অন্যতম কূটনৈতিক সাফল্য । এতে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ হয় ৩৫০০০ কিউসেক পানি । এরপর ১৯৮২ সালের ৭ই অক্টোবর এরশাদের আমলে কোন চুক্তির বদলে ৭৮ সালে এক সমঝোতা স্বাক্ষর করা হয় । ১৯৮৪ সালে এর মেয়াদ আরও ৩ বৎসর বাড়ানো হয় । এরপর ১৯৮৫ এর নভেম্বরে ৩ বৎসরের পরিবর্তে ৫ বৎসর বৃদ্ধি করা হয় । এভাবে দেখা যায় যে সামরিক সরকারের আমলে গনতান্ত্রিক সরকারের তুলনায় বাংলাদেশ গঙ্গার পানির ভাল হিস্যা পায় । কিন্তু তাতে দীর্ঘ মেয়াদী বিরোধটি কোন নিস্পত্তি হয়নি।

দীর্ঘ ১৬ বৎসর পর ১৯৯১ সালে বিএনপির নেতৃত্বে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে গঙ্গার পানি বিরোধের একটা স্থায়ী সমাধান হবে বলে সবার ধারণা ছিল । সংসদীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া পানির বিরোধ মিটানোর জন্য ১৯৯২ এর ২৬শে মে ভারতে যান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও এর সাথে এক বৈঠক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য । বৈঠক শেষে ২৮শে মে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষনা দেন ফারাক্কার গঙ্গার পানি প্রবাহ সমতার ভিত্তিতে বন্টনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভোগান্তি এড়াবার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্ট চালানো হবে। এরপরের বৎসর ১৯৯৩ সালের ১২ই মে জাতীয় সংসদে ফারাক্কা প্রশ্নে আওয়ামী সদস্য শামসুল হক ও মীর্জা আব্বাসের প্রশ্নের জবাবে সেচ ও পানি মন্ত্রী মজিদউল হক বলেছিলেন, ভারতের অযৌক্তিক প্রস্তাব ও অন্যান্য বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে চুক্তি সম্পাদিত হয়নি [১৩]

[১৩] । দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪৮ তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ফারাক্কার প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছিলেন "এই একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে গঙ্গা তথা পদ্মা অববাহিকায় আমাদের ৪ কোটি মানুষ আজ মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন । এ ছাড়া তিনি জাতি সংঘের ৫০ মত প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ১৯৯৪ সালের ২৩শে অক্টোবর বিশেষ অধিবেশনে বলেন, ১৯৯৩ সালের এই বিশ্ব সভায় দাঁড়িয়ে আমি এই গুরুত্বপূর্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলাম । কিন্তু দূভার্গ্যজনক ভাবে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও এই সমস্যা এখনও অমিমাংসিত রয়ে গেছে ।"

১৯৯১ সালের সংসদীয় সরকারের আমলে ফারাক্কার পানি বন্টন ও আমদানী রপ্তানী খাতিয়ান নিম্নরূপ ছিল।

	বিএনপি আমল ১৯৯১-৯২
ফারাক্কা পানি বন্টন	৯০০০- বাকী পানি ভায়ত পায় । কোন চুক্তি হয়নি।
	১৯৯৪-৯৫
পন্য আমদানী রপ্তানী টাকায়	রপ্তানী আমদানী বাংলাদেশ ভারত থেকে থেকে
	১১৫ কোটি ২৫.৬৭ কোটি

সূত্র ঃ সংবাদ, ১০ই মে, ১৯৯৬ইং

দেখা যায় যে ১৯৯১-৯৫ সময়ে কোন দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি হয়নি। এদিক থেকে বিএনপি সরকার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা । এটা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেছেন জাতি সংঘের ৫০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবসে । ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬ এই পাঁচ বৎসরে গড়ে পানির প্রবাহ হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে ছিল নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারী-	৫১,২০৯	
ফেব্রুয়ারী-	৩৪,৯০১	
মার্চ-	২১,৯২০	
এপ্রিল-	১৬,৯৩৬	
মে-	৩২,৯৮৮	
মোট	১,৫৭,৫৫৪	সূত্রঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
গড়	৩১,৫১০৮	

তবে বহু জরীপ গবেষনা ও তথ্যানুসন্ধানের পর পানি নিয়ে বিরোধী দুই পক্ষই অনুধাবন করেছে গঙ্গায় আসলে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । কিন্তু কি করে সেটা সম্ভব তা নিয়ে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত কোন ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি । ভারতের পক্ষ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে সংযোগ খাল সৃষ্টি করে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করতে হবে । কিন্তু বিএনপি সরকার এ প্রস্তাবে রাজী হয়নি। কারণ এজন্য বাংলাদেশের ১ লাখ ৬২ হাজার একর জমি নষ্ট হবে । খালের উজান দিয়ে প্রবাহিত ১১টি নদীকে এই খাল আড়াআড়ি ভাবে বিচ্ছিন্ন করবে । এসব কারণে বিএনপি সরকারের প্রস্তাব ছিল, সংযোগ খালের পরিবর্তে বাংলাদেশ ও নেপালের জলাধার নির্মাণ করা, যাতে বর্ষা মৌসুমে গঙ্গার পানি সেখানে সঞ্চয় করে রাখা যায় শুকনো মৌসুমে ব্যবহারের জন্য । কিন্তু এটি ভারত বিরোধীতা করে। এভাবে উভয়েই উভয়ের প্রস্তাবের বিরোধীতা করে । " ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে বেগম খালেদা জিয়ার গনতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় এলে গঙ্গার পানি সমস্যার সমাধানের জন্য নানান উদ্যোগ গ্রহন করা হলেও ভারতীয় গড়িমসির জন্য কোন সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। দ্বিপাক্ষিক ভাবে পানি সমস্যার সমাধান কল্পে ভারত এগিয়ে না এসে আদিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করলে ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বৈঠকে বিষয়টি বাংলাদেশ উত্থাপন করে। তবে এই প্রস্তাব জাতি সংঘে উত্থাপনের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্ররাষ্ট্র সমূহের উপর প্রয়োজনীয় গ্রাউন্ড ওয়ার্কের অভাবে বিষয়টি ব্যাপক ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয় ।[১৪]

[14] Daily Star, May 15, 1996

Dhaka University Institutional Repository

একটি উচচ ক্ষমতা সম্পন্ন টাস্কফোর্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৭৫-৭৬ থেকে ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত ফারাক্কার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষতির পরিমান ২২,০০০ কোটি টাকা । তাছাড়া রয়েছে উত্তরাঞ্চলে মেরুকরণ প্রক্রিয়া, দক্ষিণ অঞ্চলের লবনাক্ততা ও দেশের সার্বিক পরিবেশ বিপর্যয় ।

(৩)পুশব্যাক সমস্যাঃ খালেদা জিয়ার শাসনামলে অপারেশন পুশ ব্যাক এর মতো ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯২ সালে তিনি ভারতে নয়াদিল্লীতে মন্ত্রী পর্যায়ের এক বৈঠকে যোগদান করলে ঐ বৈঠকের এক যুক্ত ইশতেহারের ১১ নং অনুচ্ছেদে এই সম্পর্কে বলা হয় যে যারাই বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়েছে নয়াদিল্লী তাদের ফেরত পাঠাতে পারবে । এতে করে বাংলা ভাষাভাষি ভারতীয় মুসলমানদের বাংলাদেশে ঢেলে দেওয়া হয়েছে । অথচ বাংলাদেশ এদেরকে তার নিজের নাগরিক বলে মনে করে না । ভারতের বাবরী সমজিদ ভেঙ্গে ফেলা নিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে যে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় সেই সিদ্ধান্তকে অগ্রহনযোগ্য ও ভারতের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছিল । শুধু তাই নয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের মন্তব্য মৌলবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উপদেশ দেয়ার চেষ্টা বাংলাদেশ সরকারের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপের উপর মনোযোগ সহকারে নজর রাখবে প্রভৃতি বাক্য ব্যবহার করা হয়েছিল। [১৫] এই ঘটনায় দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয় এবং প্রধানমন্ত্রী রাও এর বাংলাদেশ সফর বাতিল করা হয়

এছাড়া ১৯৯১-৯৬ পর্যন্ত এই সময়ে চোরাচালান, চাঁদাবাজী ও দলীয় করণ হয় অসংখ্য। এই সময় ১৬৩ টি ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশের বাজার দখল করে নেয়। এগুলি চোরাই পথে এখানে আসে, এর ফলে দেশের শিল্প ও অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হয় । ভারতের যে সব পণ্য বাংলাদেশের বাজারে বেশী আসে তা হলো ডাল, চিনি , চাল , পিয়াঁজ বিভিন্ন ধরনের শাড়ী , প্রসাধনী সামগ্রী, ও বিভিন্ন ধরনের তৈরী পোশাক।

[১৫] Daily Star, January 2, 1993

Dhaka University Institutional Repository

বিডিআর কর্তৃক আটককৃত বিভিন্ন চোরাচালানী পণ্যের টাকার একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হলোঃ

১৯৯০ ৫১,৭৪,৬৮,৩৫৪টাকা

১৯৯১ ৭৪,৬৭,১১,৮২৯ টাকা

১৯৯২ ৭৯,৩০,৩৬,১৫৪ টাকা

১৯৯৩ ৮৫,৪৬,১৯,৫০৮ টাকা

১৯৯৪ ৫৯,৬৪,৯২,৪৫৩ টাকা সূত্রঃ সংবাদ ৮ সেপ্টেম্বর১৯৯৪।

১৯৯৪ সালের আগষ্ট মাসে চোরাচালান বিরোধী টাস্কফোর্স চট্টগ্রামের ১৫টি জেলায় অভিযান চালিয়ে ৩ কোটি টাকা মূল্যের আমদানী নিষিদ্ধ ভারতীয় মাল উদ্ধার করে । জেলা গুলো হলো ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর , কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগরাছড়ি, বান্দর বন, সিলেট, মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ জেলাগুলির বিভিন্ন শহরে ৮৪০টি অভিযান চালানো হয় ।

এই সময় বিভিন্ন দেশ থেকে অবৈধ ভাবে বিভিন্ন অস্ত্র, সোনা আনা হয়। "বর্তমান সরকারের শাসনামলে অবৈধ ভাবে আসা আগ্নেয়স্ত্রের সংখ্যা ৫০ হাজার। তার মধ্যে ৩০ হাজার রয়েছে রাজধানী জুড়ে । " [১৬] ২৫ শে ফেব্রুয়ারী জিয়া আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরে ৫০ লাখ টাকা মূল্যের ১ হাজার ভরি স্বর্ণ উদ্ধার করা হয় । সিঙ্গাপুর হতে রূপালী ব্যাংক ইসলামপুর শাখার নামে ক্যামিকেল পিসমেন্ট দ্রব্য হিসাবে উল্লেখ করে সোনা গুলি পাঠানো হয়েছিল ।[১৭]

[১৬] ২০ সংবাদ ৭ ই নভেম্বর ১৯৯৫।"

[১৭] "২১ দৈনিক ইত্তেফাক ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ "

Dhaka University Institutional Repository

৫ বৎসরের শাসনআমলে অবৈধমাল পাচারের এধনের বহু ঘটনা ঘটে। এছাড়া এসময় ভারতে নারী শিশু পাচারের ঘটনা ঘটে । ১৯৯৩ এর প্রথম তিন মাসে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে পুলিশ ও বিডিআর পাঁচ শতাধিক শিশু কিশোরকে উদ্ধার করেছে । এদের সকলকে ভারত অথবা ভারতের অন্য কোথাও পাচার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । এই সময় চোরাই পথে আসা ভারতীয় ছাপা শাড়ীতে দেশের বাজার দখল করে । প্রতি বৎসর ৬ কোটি পিস ভারতীয় শাড়ী বাংলাদেশে এসেছে । সরকারের ভ্রান্ত নীতি ও আমদানীকৃত মালামালের উপর অধিক হারে ভ্যাট আরোপের ফলে দেশের ছাপা শাড়ী বাজারে প্রতিযোগীতায় টিকেনি । এর ফলে ৯০ ভাগ দেশী কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লোকসান দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩ পাবত্য চট্রগ্রাম প্রসংগঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং এর ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত । আয়তন ৫০৯৩ বর্গমাইল অর্থাৎ বাংলাদেশের ১০ ভাগের ১ ভাগ । তিনটি জেলার সমন্বয়ে এই অঞ্চল গঠিত । যেমন খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন এই তিনটি জেলায় থানা আছে ২৫ টি । খাগড়াছড়ি তে ৮টি, রাঙ্গামাটিতে ১০টি এবং বান্দরবনে ৭টি । পার্বত্য এলাকার বৈশিষ্ট্য হলো ১৩টি ভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতীয় জনগোষ্ঠির বসবাস । এদের সংখ্যা ৫,০১,১৪৪ জন । উপজাতীয় সংখ্যা হলো ৪,৭৩,৩০১ জন এই অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতি জনগোষ্ঠী সুদূর অতীতে বাংলাদেশের মূল জনগোষ্ঠী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ী এলাকায় বসতি গড়ে তোলে। নিম্নে চিত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত লোকসংখ্যার তালিকা দেওয়া হলোঃ

চিত্র-২

নং	বিভিন্ন জন গোষ্ঠির নাম	মোট জন সংখ্যা	শতকরা
১	বাঙ্গালী	৫,০০,০০০	৫০%
২	চাকমা	২,৪০,০০০	২৪%
৩	মারমা মগ	১,৪০,০০০	১৪%
৪	ত্রিপুরা	৬১,০০০	৬৫
৫	মুরং	২২,০০০	২.২%
৬	তান চাঙ্গিয়া	১৯,০০০	১.৯%
৭	লুম	৭,০০০	০.৭%
৮	পুনক্কো	৩,৫০০	০.৩৫%
৯	চাক	২,০০০	০.২০%
১০	কেং	২,০০০	০.২০%
১১	কুলি	১২০০	০.১২%
১২	খুসাই	৬৬২	------
১৩	কুকি (মুর)	(৫০০-৮০০)	

সূত্রঃ আদম শুমারী প্রাথমিক রিপোর্ট, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা - ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

বসত এলাকাকে কেন্দ্র করে উপরোক্ত জনগোষ্ঠীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হলেও ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত বৈসাদৃশ্যের বিবেচনায় প্রত্যেকটি উপজাতিই আবার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী । ভাষাগত বৈসাদৃশ্য ছাড়াও উপজাতিদের ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা আছে। চাকমা, মারমা, চাক, খিয়াং ও তনজংগা উপজাতিরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। লুসাই, পাংখু ও বনযোগী উপজাতির জনগোষ্ঠী সর্ব প্রাণবাদী বা বিভিন্ন মুখী বৈশিষ্টের কারণে তাদের জীবন ধারাও বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত ।[১৮] এরা সমতল ভূমির বাঙ্গালী জনজীবন হতে বিভিন্ন দিক থেকে বিচ্ছিন্ন । তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত বাংলাদেশের উপজাতিরা রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত নয় এবং তারা অসচেতন, বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাদের দ্বারা রাজনৈতিক ভাবে একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সংহতি বিপন্ন হওয়ার কোনো বাস্তব সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতিরা যদিও ভিন্ন সংস্কৃতি ও জীবন ধারায় অভ্যস্থ তথাপি দীর্ঘ দিন একই অঞ্চলে পাশাপাশি বসবাস করার কারণে তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বা সংহতি গড়ে উঠেছে । অধিকন্তু অঞ্চলগত বিবেচনায়ও তারা নগন্য নয় । যার জন্য তাদের উত্থাপিত রাজনৈতিক দাবী বা তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা বাংলাদেশের অখন্ড জাতিসত্তার বিষয়কে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে।

[১৮] : Syed Nazrul Ahasan & bhumitra chakma, Problems of National Integration in Bangladesh: "The Chittagon Hill tracts", *Asian Survey* Vol 1, 29, No 1, October, 1989

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন নিপীড়ন ও শোষনের শিকার হয়েছে । যার ভয়াবহ পরিনাম ক্ষয়িষ্ণু জাতীয় সংহতি। কিন্তু এই জাতীয় সংহতি ব্যতিত জাতি বা রাষ্ট্র গঠন কোনটাই সম্ভব না। জাতি সংঘ মানবাধিকারের সার্বজনীয় ঘোষনাপত্রের ধারা ২ -এ উল্লেখ রয়েছে "যেকোন প্রকার পার্থক্য যথাঃ জাতি গোত্র, বর্ণ, নারী, পুরুষ, ভাষা, ধর্ম রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পর্ক ও জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ঘোষনা পত্রে উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধিকার স্বত্ত্বান । অধিকন্ত কোন ব্যক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী তা স্বাধীন অছিভূক্ত এলাকা, অস্বায়ত্ত্ব শাসিত অথবা অন্য যে কোন প্রকার সীমিত সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকুক না কেন, তার রাজনৈতিক, সীমানাগত ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন পার্থক্য করা চলবে না ।"[১৯]

পার্বত্য উপজাতিয়দের দীর্ঘ দিনের অসন্তোষ ক্ষোভ এবং বৈষম্যের যন্ত্রনা ধীরে ধীরে পুঞ্জিভূত হয়ে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিশেষ করে জাতিগঠন ও সংহতি হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে । স্বাধীনতা উত্তর কালে বিভিন্ন শাসনামলে রাজনৈতিক দল গুলি তাদের স্বতন্ত্র মতাদর্শের ভিত্তিতে এই সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন কর্মসূচী ও পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু ঘন ঘন সরকারের পরিবর্তন এবং দলগুলির বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ব্যাপক বৈপরিত্ব থাকায় সমস্যার কোন সুব্যবস্থা হয়নি । তবে গত ২রা ডিসেম্বর ৯৭ তারিখে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বৈষম্য ও জাতিগত অসন্তোষ নিরসনের জন্য, পার্বত্য জনসংহতির সাথে এক ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে । ব্রিটিশ আমল থেকে অদ্যাবধি এমন ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কিন্তু এই শান্তি চুক্তির বিপক্ষে বিভিন্ন দল ও মত থেকে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ এর সৃষ্টি হয় । ফলে সংকট দূরীভূত হয়নি এবং সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি।

[১৯] ডাঃ দিলীপ দে সম্পাদিত, *'হ্রানি'* প্রকাশনা পরিষদ, চট্টগ্রাম, আগষ্ট ১৯৯২ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম সংসদীয় সরকার আমলের চিত্র(১৯৭২-৭৫): স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তান সরকারের ভারত বিরোধী মনোভাবের প্রভাব পড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ সংখ্যালঘু জাতি সত্তা সমূহের উপর । অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধের সময় দুর্বল আইন শৃংখলা পরিস্থিতির কারণে এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অনুপস্থিতির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্তিযোদ্ধের স্বপক্ষে উপজাতীদের সুসংগঠিত করা সম্ভব হয়নি । ফলে এই সময় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রবলস্রোতে পাহাড়ী জনগন নিজেদের স্বাতন্ত্র রক্ষায় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে । "পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ রাজা ত্রিদিব রায় কে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কাজে ব্যবহার করেন । তৎকালীন স্পর্শ কাতর অনিছিশ্চত০ পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষা না হওয়ায় রাজা ত্রিদিব রায় দেশান্তরিত হন। তিনি চীন হয়ে পাকিস্তানে চলে যান এবং রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন । পরে তিনি জাতিসংঘে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতায় জড়িয়ে পড়েন ।[২০]

আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধে বিরোধীতাকারী বা পাকিস্তান সহযোগীতাকারী উপজাতীদের সাধারন ক্ষমা ঘোষনা করলেও রক্ষীবাহিনী সদস্যরা অস্ত্র উদ্ধার করার নামে কিছু উপজাতীয় গ্রামে সন্ত্রাস ও হামলা চালায় । এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিবাদে তৎকালীন সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ১৯৭২ সালের ২৪শে জুন রাঙ্গামাটিতে গঠন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি নামে এক রাজনৈতিক সংগঠন । এর অঙ্গ সংগঠন হিসাবে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি নামে একটি ছাত্র সংগঠনও আত্মপ্রকাশ করে । ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে একটি উপজাতীয় প্রতিনিধি দল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে চার দফা দাবী পেশ করে।

[২০]. জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা. *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় পরিষদ*, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠাঃ ৪৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

দাবী গুলি ছিল নিম্নরূপঃ

(1) Autonomy for the Chittagong Hill Tracts and the establishment of a special legislative body (পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে)।

(2) Retention of the regulation of 1900 in the new constitution of Bangaladesh (উপজাতীয় জনগনের অধিকার সংরক্ষনের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসন তন্ত্রে থাকবে)।

(3) Continuation of the offices of the tribal chiefs (উপজাতীয় রাজাদের দফতর পূর্বের মতই বহাল থাকবে)

(4) A constitutional provision restricting the amendment of the regulation of 1900 and imposing a ban of Bengal settlement CHT. (সংবিধানে ১৯০০ সালের রেগুলেশনের সংশোধন নিরোধ সংক্রান্ত বিধি রাখা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।)*

প্রধানমন্ত্রী উপজাতীয়দের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আখ্যায়িত করে উপরোক্ত দাবীগুলোকে প্রত্যাখান করেন যেটি ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর চরম অবজ্ঞা। হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠী যে একই বন্ধনে আবদ্ধ এটি সরকারের পক্ষ থেকে পাহাড়ীদেরকে ভালভাবে বোঝানো হয়নি। ফলে তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র বজায় রাখা নিয়ে একটি ভয় ও অবিশ্বাস দানা বাধে যেটি জাতীয় সংহতি রক্ষায় মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করে। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ গন পরিষদে এক অধিবেশনে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা খসড়া সংবিধানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ মুজিবের বৃহত্তর বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধচারণ করে বলেন "এ সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের কথা নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিগন ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী আমল থেকে নির্যাতিত ও বঞ্চিত হয়ে আসছে। অথচ আমরা বাংলাদেশের মানুষের সাথে একাত্ব হয়ে বসবাস করতে চাই। আরত ও সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতি সত্তার স্বীকৃতি রয়েছে। আমি সংবিধানে উপজাতীয় জনগনের অধিকার

* Azizul Haque in 1981: Strains and stress, *Asian Servey*, Vol-21, No-2.

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকার করে নেওয়ার আহবান জানাচিছ ।[২১] ১৯৭৪ সালের ২৩ শে জানুয়ারী জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ এক ভাষা এক সংস্কৃতি ভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র,এই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাশ হলে মানবেন্দ্র লারমা এর প্রতিবাদ করে বলেন "I am a Chakma.............I am not a Bengali. I am citizen of Bangladeshi, you are also Bangladeshi but national identity is Bengali.........*They (tribal) can never be Bengalis.*[২২]

জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক হিসাবে চিহ্নিত না করে অর্থনৈতিক হিসাবে চিহ্নিত করেন। জিয়া সরকার ১৯৭৬ সালে ২০শে অক্টোবর এক অধ্যাদেশ জারী করে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর আওতায় কিছু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহন করেন। যেমন বৌদ্ধ খামার পদ্ধতি, বিশেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পশু ও মৎস সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, ষ্টেডিয়াম নির্মান প্রভৃতি। এভাবে রাজনৈতিক সমস্যাকে চাপা দিয়ে অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহনে উপজাতীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় । জিয়া সরকারের আর একটি রাজনৈতিক কৌশল জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় মারাত্মক বিপর্যয় এনে দেয় । উপজাতি বিদ্রোহ দমনে পার্বত্য অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক সামরিক ও আধা সামরিক পুলিশ ও আনসার বাহিনী মোতায়েন সহ রাজস্ব আয়ের একটি বড় ধরণের অংশ সেখানে ব্যয় করা হয় ।[২৩] অন্যদিকে শান্তি বাহিনীও পাল্টা প্রতিরোধ আক্রমন শুরু করে। এভাবে ১৯৭৬-৮১ পর্যন্ত উভয়ের দাঙ্গা হাঙ্গামায় আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হয় এবং অনেক উপজাতি ভারতে আশ্রয় গ্রহন করে ।

[২১] প্রদীপ্ত খীসা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৯৯ ।

[২২] Abul Fazal Haque ...... "The Problem Of National Identity In Bangladesh", *Journal Of Social Studies*, No-24, *April 1984, P-250.*

২৩. আবু মোহাম্মদ, "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে বাধা কোথায়?" *প্রিয় প্রজন্ম*, জানুয়ারী, ১৯৯২ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২-৯০ পর্যন্ত এরশাদ শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় পরিষদ গঠন। ১৯৮৯ সালের ২৫শে জুন ৩টি স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল প্রথমবারের মত পার্বত্য জেলা তিনটির প্রশাসনিক আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালনায় উপজাতিদের প্রাধান্য দেওয়া । পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতিসহ বৃহত্তর চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র ঐক্য পরিষদ, পাহাড়ী গনপরিষদ, পাহাড়ী পেশাজীবি পরিষদ নামের কয়েকটি সংগঠন স্থানীয় সরকার পরিষদ গুলোর বিরোধীতা করে একে গনবিরোধী ও ষড়যন্ত্রমূলক বলে আখ্যায়িত করে [২৩] এই বিরোধীতার প্রধান কারণ ছিল এই জেলা পরিষদে ব্রিটিশ প্রদত্ত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি লংঘন করে লক্ষাধিক বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী ভাবে বসবাসে করার আইনানুগ অধিকার দেওয়া হয়েছে । এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় প্রশাসনে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি ।

১৯৯১-৯৬ সময়ে বিতর্কিত স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিলের পরিবর্তে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা গ্রহন করা হয় । এই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ১৯৯২ এর ১৩মে খাগড়াছড়ি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন । এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন "শান্তিপূর্ণ আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব।" [২৪] এই লক্ষ্যে সরকার তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমদ কে আহবায়ক করে ৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন । কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সর্বজনাব শাহজাহান চৌধুরী এম পি, সৈয়দ অহিদুল আলম এম পি, মোস্তাক আহম্মদ চৌধুরী এম পি, রাশেদ খান মেনন এম পি, আবদুল মতিন খসরু এম পি। [২৫]

[২৪] দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ১৪ মে ১৯৯২।

[২৫] দৈনিক সংবাদ, তারিখ ১০ই জুলাই ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯২ সালের ১০ই এপ্রিল খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানাধীন লোগাং গ্রামে বাঙ্গালী ও উপজাতীয় বালকদের মধ্যে মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালীরা, ডি ডি পি, আনসার বাহিনী ও বি ডি আর সদস্যদের ছত্রচছায় এক হত্যাকান্ডে প্রায় ৩০০ পাহাড়ী নিহত, ৫৭৮টি ঘরবাড়ী জালিয়ে দেওয়া হয় । এই ঘটনার জন্য শান্তি বাহিনীকে দায়ী করা হয় ।

কর্নেল অলি কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ৫ই নভেম্বর ১৯৯২ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে । ৫ই নভেম্বর হতে ৫ই মে ১৯৯৪ পর্যন্ত জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির মধ্যে ৭ দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় খাগড়াছড়িতে । ৫ই মে ১৯৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জন সংহতি সমিতির সাথে আলোচনা করার জন্য কমিটির সদস্য জনাব রাশেদ খান মেনন কে আহবায়ক করে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব কমিটি গঠন করা হয় । পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির এই সাব কমিটি ও জন সংহতি সমিতির মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৪ঠা জুন ১৯৯৪ তারিখে দুদুকছড়িতে এবং সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২৪মে অক্টোবর ১৯৯৪ তারিখে একই স্থানে । মোট ছয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে কর্নেল অলি কমিটি ও জন সংহতি সমিতির মধ্যে মোট ৭দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।[২৬] উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন বৈঠকের আলোচিত বিষয়ের সার সংক্ষেপ ছিল ভিন্ন রূপ ঃ-

(১) অস্ত্র বিরতি লংঘন সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক উত্তাপিত অভিযোগ এবং এ বিষয়ে জন সংহতি সমিতির পাল্টা অভিযোগ ।

(২) জন সংহতি সমিতি কর্তৃক চাঁদা আদায় ও অপহরনকৃত ব্যক্তিদের মুক্তি প্রদান ।

(৩) সাধারন ক্ষমা ও অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি ।

(৪) উপজাতীয়দের জমি বলপূর্বক দখল ।

(৫) পার্বত্য এলাকায় ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে এবং

(৬) শরনার্থী প্রত্যাবর্তন ও পুনবার্সন । *

২৬. আলহাজ্ব সৈয়দ আকুল হোসেন, *শেখ হাসিনার সফল কীর্তি, পার্বত্য শান্তি চুক্তি*, সাকু ইন্টারন্যাশনাল, আমিনকোর্ট ১৯৯৮ পৃষ্ঠা- ২০ ।
* ঐ

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে অলি কমিটির সাব কমিটি ও জন সংহতি সমিতির মধ্যে দফাওয়ারী আলোচনা না হলেও প্রধান বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছিল। নিম্নে উল্লেখ করা হল ।

(১) অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি ।

(২) অস্ত্র বিরতির লংঘন ।

(৩) জন সংহতি সমিতির আটককৃত সদস্যদের মুক্তিদান ।

(৪) শরনার্থী প্রত্যাবর্তন ও পুর্নবাসন ।

(৫) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ।

(৬) পার্বত্য অঞ্চলের স্বায়ত্বশাসন, সাংবিধানিক গ্যারান্টি সহ বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। *

এসব বিষয় নিয়ে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলাপ আলোচনা হলেও কার্যকরী কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯৪ কর্নেল অলি কমিটির উপ কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় যে, সাব কমিটি সরকারের সাথে আলোচনা করে একটি খসড়া ১৫ই মার্চ ১৯৯৫ এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির কাছে তাদের মতামতের জন্য পাঠাবে । কিন্তু এটি পরে আর পাঠানো হয় নাই।

এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উজ্জল। কিন্তু তারপরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে বৈষম্য, নিপীড়ন, বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র এবং অত্যাচার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে তার সুষ্ঠ সমাধান ব্যতীত জাতীয় সংহতি অর্জন সম্ভব নয় এবং গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় । বাংলাদেশে নৃতত্ত্ব গত দিক দিয়ে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় হলো উপজাতীয় সম্প্রদায়, বিশেষ করে পার্বত্য উপজাতীদের উপর বিভিন্ন আমলে অন্যায় অত্যাচার করা হয়েছে । বাংলাদেশের ১ম ও ২য় সংসদীয় সরকার কোনটাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান দিতে পারে নাই । তবে ১ম সংসদীয় সরকারের (১৯৭২-৭৫) আমলের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন । ব্রিটিশ আমল থেকেই তারা বঞ্চিত হয়ে আসছিল । স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় তারা পাকিস্তানীদের প্ররোচনায় স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে যায় ।

* স্পেশাল এফেয়ার্স ডিভিশন ।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা উত্তরকালে আওয়ামী লীগ সরকার তাদের সাধারন ক্ষমা ঘোষনা করে। কিন্তু তাদের দাবী ছিল পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন যেটি শেখ মুজিব মেনে নিতে পারেন নাই । সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্র গঠনের পাশাপাশি জাতি গঠন করতে যেয়ে উপজাতীয়দেরকে জাতির মর্যাদা দেন এবং বাঙ্গালী জাতি সত্তার সাথে মিশে যেতে বলেন । কিন্তু এতে সমস্যার সুরাহা না হয়ে আরও বৃদ্ধি পায় । উপজাতীয়রা নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। এজন্য জন সংহতি নামে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে এবং ১৯৭৪ সাল থেকে এর অধীনে গঠিত শান্তিবাহিনী সশস্ত্র সংঘাতের পথ বেছে নেয় । এর জবাবে সরকারও নিরাপত্তা বাহিনী প্রেরণ করে । এ ভাবে উভয়ের সংঘর্ষে হাজার হাজার লোক মারা যায়। সামরিক শাসনামলে এই সংঘাত আরও বৃদ্ধি পায় ।

দীর্ঘ ১৬ বৎসর পর ১৯৯১ সালে সামরিক শাসনের অবসান হয়ে আর একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে সকলের প্রত্যাশা ছিল যে পার্বত্য সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান হবে । এই সময়ে অলি কমিটি ও মেনন কমিটির মাধ্যমে মোট ১৩টি বৈঠক হয় এই সমস্যা সমাধানের জন্য । কিন্তু এই বৈঠকগুলি আলোচনার মধ্যে সীমিত ছিল, কোন সমাধান দেওয়া হয় নাই । শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে উপজাতীয় কোঠা প্রবর্তন করা হলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য তাহা বৈষম্যের স্বীকার হয়েছে । শেখ মুজিব আমলের সময়ে উপজাতীদের সংসদে প্রতিনিধিত্ব ছিল । কিন্তু খালেদা জিয়া সরকারের সময় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পার্বত্যবাসীদের কোন প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়নি । সামরিক বাহিনীতে কমিশন পদে কোন উপজাতীয়কে নিয়োগ দান করা হয়নি। উপরন্তু যোগ্যতা সম্পন্ন কোন পাহাড়ীকে জেলা প্রশাসন পদে নিয়োগ করা হয়নি । ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে অলিখিত বৈষম্য সৃষ্টি করা হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪ আইন শৃংখলা পরিস্থিতি

উন্নয়শীল বিশ্বের নতুন রাষ্ট্রগুলি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর স্বাধীনতা অর্জন করলেও একটি সুসংগঠিত জাতি হিসাবে আজও নিজেদের স্থান করে নিতে পারেনি । কেননা এখানে জাতি ও একটি উন্নত রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া আজও ক্রিয়াশীল রয়েছে। "Many states in Asia and Africa are not nation in being, but only nation in hope" [27] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও একটি সুশৃংখল জাতি হিসাবে আজও গড়ে উঠতে পারেনি, পারেনি সমাজে আইনের শাসন , ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে এবং সন্ত্রাস ও দূর্নীতি দমন করতে । সরকার এসেছে আবার চলে গেছে । পুনরায় আব এক সরকার এসেছে । এভাবে ক্ষমতার বহু হাত বদল হয়েছে । কিন্তু কোন সরকারই এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেনি বরং অসৎ ব্যবহার করেছে । অর্থাৎ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজেদের স্বার্থে সমাজে দূর্নীতি ও সন্ত্রাসকে লালন করছে । ১৯৯১সালে গঠিত ২য় সংসদীয় সরকারও এর ব্যতিক্রম ছিলনা। In the face of escalating social and economic problems the failures of our civil leaders to act with urgency could progressively undermine our infeebled democratic structures and put the polity into a phase of mounting enarchy manifastion of which are only to evident today in the progressive degnaration in the state of law and order in civil society. [28]

27 Rupert Emerson, *From Empire To Nation*, Boston: Beacon Press. 1960, P-94.

28. Dr. Nazrul Islam, *Ibid*, Page 8/9.

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী ও বিরোধী দলের অংশ গ্রহনের মাধ্যমে ৫ম জাতীয় সংসদকে কার্যকর করে সংসদীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রক্রিয়া দরকার তা থেকে অনভিজ্ঞতা প্রসূত পদক্ষেপের দ্বারা প্রতিনিয়তই ব্যাহত হতে দেখা যায়। এ প্রসংগে দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে সরকার কতৃর্ক গৃহীত পদক্ষেপ উল্লেখ করা যেতে পারে । সরকার ও বিরোধী দলের সমন্বিত প্রচেষ্টা, যা জাতীয় সংসদের মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব, যা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তার পরিবর্তে বিভিন্ন দমন মূলক আইন প্রনয়নের প্রচেষ্টার দ্বারা সরকার একক ভাবেই সন্ত্রাস দমনে ব্রতী হয়েছে। এ প্রসংগে সন্ত্রাস দমন আইন ১৯৯২ এর কথা উল্লেখ করা যায়। অপর পক্ষে প্রধান বিরোধী দল আওলীগের বহুল আকাংখিত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স রদের জন্য প্রয়োজনীয় সংসদীয় প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়ে বিরোধী দলের অংশ গ্রহন বিলম্বিত করেছে।

সন্ত্রাস দমন বিল ৯২ ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে ক্ষমতাবলে সন্ত্রাস দমন বিল নামে এক অধ্যাদেশ জারী করেন এবং ঐ তারিখ হতেই অধ্যাদেশটি কার্যকর ও বলবৎ করা হয়। অধ্যাদেশটি প্রকাশিত হবার পরই একমাত্র বিএনপি বাদে সকল রাজনৈতিক দল, সংগঠন, বুদ্ধিজীবি , আইনজীবি সহ সকল পেশাজীবি ছাত্র সংগঠন এর তীব্র বিরোধীতা ও নিন্দা করে। বিরোধী নেত্রী হাসিনা এই অধ্যাদেশের তীব্র বিরোধীতা করে বলেন " বিরোধী দলকে দমন করার জন্যই বিএনপি সরকার জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে নৈরাজ্য মূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশ জারী করেছে।"[২৯] ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টির পলিট ব্যুরোর স্ট্যান্ডিং কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় " যেখানে প্রচলিত আইনেই অপরাধী ও সন্ত্রাস দমন সম্ভব সেখানে জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে এ ধরনের বিশেষ অধ্যাদেশ জারীর অর্থ হলো বিশেষ ক্ষমতা আইনের চেয়েও নিকৃষ্টতম অধ্যাদেশের অক্টোপাশে দেশ ও জাতিকে আবদ্ধ করা। প্রকৃত পক্ষে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে দূর্নীতি ক্ষমতাসীন দলের তাবেদারী থেকে মুক্ত করা গেলেই প্রচলিত ফৌজদারী আইনেই সন্ত্রাস দমন সম্ভব।" [৩০]

২৯. দৈনিক ইত্তেফাক - সেপ্টেম্বর।

৩০.দৈনিক সংবাদ, ১০ সেপ্টেম্বর, ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

নৈরাজ্য মূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশের ২নং ধারায় ৩ অনুচ্ছেদে এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় ঃ-

ক) কোন প্রকার ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বা বে বেআইনী বল প্রয়োগ করে কোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে চাঁদা বা সাহায্য বা অন্য কোন নামে অর্থ বা মালামাল আদায় বা অর্জন করা।

খ) স্থলপথ, রেলপথ, জলপথ বা আকাশপথে যান চলাচলের প্রতিবন্ধকতা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করা বা কোন চালকের বিরুদ্ধে যানের গতি ভিন্ন পথে পরিবর্তন করা এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন যানবাহনের ক্ষতি সাধন করা।

গ) ইচ্ছাকৃত ভাবে সরকার বা সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন কোন প্রতিষ্টান, আইনের অধীন গঠিত, স্থাপিত বা সৃষ্ট কোন সংস্থা কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান বা কোন কোম্পানী ফার্ম বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কোন দূতাবাস বা কোন ব্যাক্তির অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি বিনষ্ঠ বা ভাংচুর করা।

ঘ) কোন ব্যক্তির নিকট হতে কোন অর্থ, অলংকার , মূল্যবান জিনিষপত্র বা অন্য কোন ধাতু বা যানবাহন ছিনতাই করা বা জোর পূর্বক কেড়ে নেওয়া।

ঙ) রাস্তাঘাটে, যানবাহনে বা প্রতিষ্ঠানে বা উহার আশেপাশে বা জনসাধারনের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন বালিকা, কিশোরী, তরুনী সহ যে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্কা বা প্রাপ্ত বয়স্কা নারীকে উতক্ত্য বা হয়রানি করা।

চ) কোন স্থানে, বাড়ীতে, দোকানে, হাটে বাজারে রাস্তাঘাটে, যানবাহনে বা প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পিত বা আকস্মিক ভাবে, একক বা দলবদ্ধ ভাবে শক্তির মহড়া বা দাপট প্রদর্শন, ভয়ভীতি বা ত্রাস সৃষ্টি করা বা বিশৃংখলা বা অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা ।

Dhaka University Institutional Repository

ছ) কোন প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় ক্রয়ে বা দখলে জোর পূর্বক বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা কাহারও দরপত্র বিধি বর্হিভূত ভাবে ব্যবহার করা।[৩১]

অধ্যাদেশের ৪নং ধারায় উক্ত অধ্যাদেশের শাস্তি শিরোনামে বলা হয় "কোন ব্যাক্তি নৈরাজ্য মূলক অপরাধ করলে তিনি মৃত্যু দন্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা অনধিক ২০ বৎসর বা নুন্যতম পাঁচ বৎসর সশ্রম কারদন্ডে দন্ডনীয় হবেন । অধ্যাদেশের ৫ নম্বর ধারায় অপরাধ সংঘটনে সহায়তায় শাস্তি শিবোনামে বলা হয় "কোন ব্যক্তি নৈরাজ্য মূলক অপরাধ সংঘটনে সহায়তা তিনি ধারা ৪এ উল্লেখিত দন্ডে দন্ডনীয় হবেন। নৈরাজ্য মূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশ এর ১৩নং ধারায় আপীল শিরোনামে বলা হয় "ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রদত্ত কোন দন্ডাদেশ বা খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে কোন ব্যাক্তি আদেশ প্রত্যাহারের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে ধারা ১৪ এর বিধান নৈরাজ্য মূলক অপরাধ দমন আপীল ট্রাইবুনালে আপিল দায়ের করতে পারেন। এই অধ্যাদেশের ১৪ নং ধারার আপীল ট্রাইবুনাল শিরোনামে বলা হয় "এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরনকল্পে সরকার সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এক বা একাধিক আপীল ট্রাইবুনাল স্থাপন করবে যা আপীল ট্রাইবুনাল নামে অভিহিত হবে। সুপ্রীমকোর্টের বিচারক আছেন বা ছিলেন এইরূপ দুই ব্যক্তি এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা রাখেন এইরূপ একজন কর্মকর্তা জেলাজজ সমন্বয়ে আপীল ট্রাইবুনাল গঠিত হবে এবং তারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবে। অধ্যাদেশের ৮ নম্বর ধারায় নৈরাজ্য মূলক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল স্থাপন শিরোনামে বলা হয় ঃ-

১। এই অধ্যাদেশের উদ্দোশ্য পূরনকল্পে সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রত্যেকটি জেলায় এক বা একাধিক ট্রাইবুনাল স্থাপন করতে পারবে। যেটি নৈরাজ্য মূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশ ক্রমে অভিহিত হবে।

২। প্রত্যেক ট্রাইবুনালে একজন করে বিচারক থাকবেন এবং কেবল একজন চাকুরীচ্যুত বা অবসর প্রাপ্ত সেশন জজ এই ট্রাইবুনালে বিচারক হবার যোগ্য হবেন।

৩১. এম,এ ওয়াজেদ মিয়া , *বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র*, ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

৩। ট্রাইবুনালে বিচারক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং সরকার প্রয়োজন বোধে একজন সেশন জজ বা অতিরিক্ত সেশন জজ কে নিযুক্ত করতে পারবেন।

3। প্রত্যেক ট্রাইবুনাল জেলা সদরে অবস্থিত থাকবে তবে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হলে অন্য কোন স্থানেও পরিচালনা করতে পারে।[৩২]

সংসদের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য ৯২এর ২৭শে অক্টোবর তারিখে অধ্যাদেশটি জাতীয় সংসদে পেশ করা হয় সংসদের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য। বিলটির কতিপয় বিধি বিধান ধারা ও উপধারা ক্ষেত্র ভেদে প্রত্যাহার ও সংশোধনের জন্য বিরোধী দলের কতিপয় সদস্য প্রস্তাব রাখলে সেটি বিএনপির কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে আওয়ামীলীগ সহ জাতীয় পার্টি , ন্যাপ, জাসদ সিরাজ এর সাংসদরা বিলটিকে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী ও মানবতা বিরোধী বলে সংসদ থেকে একযোগে ওয়াক আউট করে এবং সপ্তম অধিবেশন পর্যন্ত বর্জন অব্যাহত রাখে। ১৯শে নভেম্বর ৯২ তারিখে বিলটির সামান্য কিছু রদবদল করে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব রাখলে সেটি সরকারী দলের কণ্ঠভোটে পাশ হয়। বিলটি পাশের সময় জামাতে ইসলামীর সদস্যরা ও ইসলামী ঐক্যজোটের একমাত্র সাংসদ ওয়াক আউট করলেও সপ্তম অধিবেশনে যোগদান অব্যাহত রাখে। ঐদিনই যে পরিবর্তন গুলি করা হয় তা হলো -

১। নৈরাজ্য মূলক অপরাধ দমন শিরোনাম পরিবর্তন করে সন্ত্রাস মূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশ রাখা হয়।

২। অধ্যাদেশটির ১৪নং ধারা মোতাবেক আপীল ট্রাইবুনাল গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে তার এখতিয়ার দায়িত্ব ও ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগের উপর ন্যাস্ত করা হয়।

৩২. এম এ সামেদ মিয়া - প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

৩। বিলটির ২নং ধারায় ২নং উপধারায় সংশোধন করে বলা হয় "এই আইনটি অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং সংসদ কর্তৃক মেয়াদ বর্ধিত করা না হলে আইনটি ২ বৎসরের জন্য বলবৎ থাকবে। ৬ই নভেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পরই সন্ত্রাস দমন বিলটি আইনে পরিনত হবে এবং জনসাধারনের অবগতির জন্য ঐ তারিখেই সরকারি বাংলাদেশ গেজেট এ প্রকাশ করা হবে।

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় যাবার পর পূর্বের সকল অগনতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী অধ্যাদেশ গুলি বাতিল না করে বরং জাতীয় সংসদকে পাশকাটিয়ে অতিজরুরী ভিত্তিতে ৯২এর ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশটি জারী করে জঘন্যতম একটি কাজ করেছে। অধ্যাদেশ জরুরী ভিত্তিতে জারী করার পর ২৭শে সেপ্টেম্বর ৯২ তারিখে সংসদে অনুমোদনের জন্য পেশ করে। অর্থাৎ অধ্যাদেশ আগে জারী করা হয়, পরে সংসদে উথাপন করা হয়, যেটি সংসদীয় রীতি সম্মত ছিলনা। বিলটি তারা প্রথমেই (অধ্যাদেশ জারীর পূর্বে) সংসদে প্রস্তাব আকারে উথাপন করতে পারতো, অধ্যাদেশ জারী করার পর আইনে পরিনত করার জন্য সংসদে উথাপন করা হয় এবং অন্যান্য দলগুলি এতে বাধ সাধলে সরকারী দল ১৯শে নভেম্বর ৯২ নিজেদের কণ্ঠভোটে বিলটি পাশ করিয়ে নেয়। এতে করে সরকারী দলের স্বৈরাচারী মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু সন্ত্রাস দমনের জন্য দলগুলির সদিচ্ছাই যথেষ্ট ছিল। বড় দলগুলি সন্ত্রাসীদের লালন করে এবং তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায় । সরকার যদি মনে করে থাকে যে সন্ত্রাস দমনের জন্য কঠোর আইনের প্রয়োজন তাহলে তাদের যুক্তিকে মেনে নেওয়া যায় এই অর্থে যে সমাজের অশুভ শক্তিকে দূর করার জন্য একমাত্র কঠোর আইনও তার প্রয়োগেই সম্ভব। এর প্রমান পাওয়া যায় এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় । এক সময় দেশে এসিড নিক্ষেপের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পায় । কিন্তু যখন আইন করা হলো যে এর জন্য মৃত্যু দন্ড পর্যন্ত সাজা ভোগ করতে হবে তখন থেকেই এর প্রবনতা কমে যায়।

কিন্তু সন্ত্রাস দমনের জন্য বিএনপির সন্ত্রাস দমন বিলটি প্রনয়নের প্রক্রিয়া যেমন সঠিক ছিলনা তেমনি প্রয়োগেও স্বৈরাচারী নীতি অবলম্বন করে। বিরোধীদের মতে এই আইনটি কেবল তাদের উপর প্রয়োগ হয়েছিল। কিন্তু বিরোধীদের দমন করার জন্যই এই আইনটি প্রয়োগকরা হয়। ১লা জুলাই ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয় "বিশেষ ক্ষমতা আইন ও সন্ত্রাস বিরোধী আইনের আওতায় বাংলাদেশ সরকারের শত শত সমালোচক ও বিরোধীকে আটক করা হয়েছে। পুলিশী হেফাজতে নির্যাতনের ফলে কমপক্ষে ৪ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করেছে। কমপক্ষে তিন ব্যক্তিকে মৃত্যু দন্ড দেওয়া হয়েছে। আর তিন জনের মৃত্যু দন্ড কার্যকরী হয়েছে। সরকার বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে হাজার হাজার লোক আহত হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে শত শত লোক। সেপ্টেম্বর নাগাদ নিরাপত্তা বাহিনী ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সংঘর্ষে ৩০ জনের বেশী ছাত্র নিহত হয়েছে। ৩২,২৫০ জন আহত হয়েছে। সাবেক সরকারের সদস্যদের বৈঠক অব্যাহত রয়েছে। দূর্নীতির দায়ে সাবেক এয়ার চীফ মার্শাল মমতাজ উদ্দিন আহম্মদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জুনে আইন মন্ত্রী আইন সংস্কারের জন্য আইন কমিশন গঠনের ঘোষনা দেয়, কিন্তু বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা গঠন করা হয়নি।[৩৩] । যার জন্য দেখা যায় যে, যে উদ্দেশ্যে আইনটি প্রনীত হয় হিতে তার বিপরীত হয় অর্থাৎ সন্ত্রাস কমেনি বরং আরো বৃদ্ধি পায়। ৯৪ সালে অনুষ্ঠিত দুটি উপনির্বাচনে (মিরপুর ও মাগুরা) ব্যাপক সন্ত্রাসী তৎপরতা এর প্রমান বহন করে। ১৯৯৫ সালে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনায় ১৩ জন ছাত্র নিহত হয় । এর মধ্যে রয়েছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন, প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন ছাত্র, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, আভ্যন্তরীন কোন্দল, রাজনৈতিক মতবিরোধ, চাঁদা ও টেন্ডার সম্পর্কীত বিরোধ এবং ছাত্রাবাসে হামলা ও সিট দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সন্ত্রাসী ঘটনায় প্রান হারাতে হয় এসব ছাত্রকে। কয়েকটি মামলার তদন্ত ভার পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থার হাতে দেয়া হলেও তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে তদন্ত কাজের কোন অগ্রগতি হয়নি। কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যাক্তিকে আটক করা হলেও পরবর্তী পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে।[৩৪]

৩৩. সংবাদ , ৭ই জুলাই, ৯৪।

৩৪.সাপ্তাহিক জনমত, লন্ডন, ১৫ই এপ্রিল , ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে সন্ত্রাস দমন ও আইনশৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কঠোর আইনের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সন্ত্রাস দমন আইন ছিল সঠিক। কারন যেসব সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য এই আইনটি তৈরী হয়েছিল সেগুলি দমন করা ছিল খুবই জরুরী। সন্ত্রাস দমন বিলের ২ নং ধারায় এর ব্যখ্যায় এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। যা ইচ্ছা তাই করাকেই গনতান্ত্রিক অধিকার বলা যায় না। চাঁদা বাজি করা , নারী নির্যাতন করা, হরতালের নামে যানবাহনের ক্ষতি করা, ভাংচুর করা , অবরোধ সৃষ্টি করা, জনগনকে হয়রানি করা প্রভৃতি হলো সেচ্ছাচারিতার নামান্তর । বরং এখানে সৃষ্ট গনতান্ত্রিক পরিবেশকে বিপন্ন করা হয়। তবে এই আইনটি সকলের মতামতের ভিত্তিতে পাশ করা উচিৎ ছিল। এতে কিছু অগনতান্ত্রিক বিধি বিধান এর সংযোজন করা হয়েছিল, যেগুলি পরিবর্তনের কথা বিরোধী দলগুলি বলেছিল। কিন্তু তার কোন পরিবর্তন না করে সংসদে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাশ করিয়ে নেয়। সন্ত্রাস দমন বিলের মাধ্যমে যে বিচার ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয় সেটি সম্পূর্ন সরকারী নিয়ন্ত্রনে রাখা হয়। যেমন প্রত্যেক জেলায় একটি ট্রাইবুনাল থাকবে যেখানে সরকার কর্তৃক বিচারক নিযুক্ত হবেন। অর্থাৎ এখানে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা হরন করা হয়। অথচ আইনের শাসন ও সন্ত্রাস দমনের জন্য প্রয়োজন নিরেপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা। এছাড়া বিধিতে আছে যে, সরকার প্রয়োজন বোধে একজন সেসন জজ কে অতিরিক্ত সেসন জজের দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে কোন ট্রাইবুনালে বিচারক নিযুক্ত করতে পারবেন। এতে প্রমানিত সরকার সন্ত্রাস দমন বিলের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে যারা কথা বলেন তাদের দমন করার ব্যবস্থা করে। এতে করে সরকারের সেচ্ছাচারের পথ সুগম হয়। সরকার ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল না করে দুই বৎসরের মাথায় আর একটি অধ্যাদেশ জারী করে যেটি ছিল সকলের কাছে অপ্রত্যাশিত। দীর্ঘ স্বৈরশাসনের পর প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় সরকার কেবল কাঠামোগত ভাবেই গনতান্ত্রিক ছিল কিন্তু কার্য কারিতার দিক থেকে ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। কেননা গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র কখনই অগনতান্ত্রিক রীতি নীতির মাধ্যমে চলতে পারে না। ১৯৯২ সালের ৬ ই নভেম্বর সন্ত্রাস মূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশ প্রনয়নের পর থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ৯৪ পর্যন্ত এই আইনের অধিনে ১৩৯৪টি মামলা হয়েছে। ৩৯২ টি মামলার মোট ২৬০৭ জন আসামী খালাস পেয়েছে। [৩৫]

৩৫.সংবাদ, ১১ই অক্টোবর, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের হিসাবে সাল ভিত্তিক অপরাধের সংখ্যা হলো-

১৯৯১ সালে - ৭৮,০১০টি

১৯৯২ সালে - ৭৮,২১৭টি

১৯৯৩ সালে - ৭৯, ১০১টি

১৯৯৪ সালে - ৭৯, ৪০৯ টি

১৯৯৫ সাল -৮০,০০৫ টি

১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত- ২১১০৪। উপরের পরিসংখানে দেখা যায় যে, অপরাধের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় পরবর্তীতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় । খালেদা জিয়ার ৫ বৎসরের শাসন আমলের অপরাধ সংঘঠিত হয়েছে ৪লাখ ১৬ হাজার ৮শ ৩৬ টি । এর মধ্যে খুন হয়েছে ১৩ হাজার ২শ ৭৬ জন, রাজনৈতিক হত্যাকান্ড হয়েছে ১ হাজার জনের বেশী । ডাকাতি ছিনতাই হয়েছে ১০ হাজার ৪০২ টি । দাঙ্গা হাঙ্গামা রাহাজানি ৪০ হাজার ।[৩৬] সন্ত্রাস দমন আইনে নারী নির্যাতনের জন্য বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল । অথচ এই আইন পাশের পর নারী নির্যাতন আরও বৃদ্ধি পায় । নিম্নে পরিসংখানে হিসাব দেওয়া হলো :

১৯৯৩ সালে দেশে ৮৪০ জন নারী নির্যাতনের শিকার হন

১৯৯৪ সালে দেশে ১২৪০ জন নারী নির্যাতনের শিকার হন

১৯৯৩ সালে দেশে ২২৭ জন নারী ও শিশুর শ্লীলতাহানি ঘটে

১৯৯৪ সালে দেশে৩৩০ জন নারী ও শিশুর শ্লীলতাহানি ঘটে

১৯৯১ সালে নারী ও শিশু অপহরণ ও পাচারের সংখ্যা ৫২ জন

১৯৯২ সালে নারী ও শিশু অপহরণ ও পাচারের সংখ্যা ৩৪১

১৯৯৩ সালে নারী ও শিশু অপহরণ ও পাচারের সংখ্যা ৩০০ জন

১৯৯৪ সালে নারী ও শিশু অপহরণ ও পাচারের সংখ্যা ৩১৯ জন **

৩৬. জনকণ্ঠ .১৩এপ্রিল,১৯ ৯৬

** দৈনিক সংবাদ, ২৮শে জুন, ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে ৫২৩ টি ধর্ষনের ঘটনা ঘটে এবং ২ হাজার ২৯ টি নারী নির্যাতনের মামলা দায়ের করা হয়। এর সংখ্যা ১৯৯৪ সালের চেয়ে ৫'শ বেশী ।[৩৭] বিএনপি আমলে ৪ বৎসরে বিভিন্ন সংঘর্ষে কোন না কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একাধিকবার সহ প্রায় ৫০০ বার নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট চাপের জন্য বন্ধ ছিল। ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রায় ১০০ বার। ১৯শে সেপ্টেম্বর ৯৩ ছাত্র শিবিরের ঘাতকরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে ঘুমন্ত ছাত্রদের হাত ও পায়ের রগ কেটে দেয় । ঘটনা স্থলেই একজন ছাত্র মারা যায় । এসময় পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে ।"[৩৮] জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ৯৫এর এম এ পরীক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী না পাওয়ায় ১৪ ই অক্টোবর ৯৫, একদল ছাত্র নিয়ে গিয়ে শিক্ষা ও গবেষনা ইনষ্টিটিউটে ব্যাপক ভাংচুর করে ।"[৩৯] ২৬ শে নভেম্বর ১৯৯৫ চট্টগ্রাম বি আই টি দখলের জন্য সশস্ত্র অভিযান চালানোর সময় পুলিশ ছাত্রদের ৫ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে । তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমান অস্ত্র উদ্ধার করা হয় । গ্রেফতারকৃতরা হলেন , বি আই টি ছাত্র সংসদের ভি.পি. মেজবাউদ্দিন আহমেদ , সাবেক জি.এস. নিয়ামত হাসান মুকুল, বি আই টি ছাত্র দলের সভাপতি মমতাজুল ইসলাম টুকু, সদ্য ছাত্রদলে যোগদান কারী জাহাঙ্গীরুল ইসলাম ও বহিরাগত সন্ত্রাসী পুসকিন । তাদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে ছিল থ্রিনট থ্রি রাইফেল ১ টি, রিভলবারের গুলি ৪৬ রাউন্ড , বন্দুকের গুলি ৩৫ রাউন্ড, এস এম জি ম্যাগজিন ১টি "[৪০] ৭ই ডিসেম্বর ভোর রাতে ছাত্রদলের কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল হতে ছাত্র লীগের কর্মীদের মারধোর করে বের করে দিয়ে দখল নিয়েছে। তারা কয়েকটি কক্ষ ভাংচুর ও টাকা লুট করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে ।[৪১]

৩৭.ইত্তেফাক, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫ ।

৩৮.সাপ্তাহিক বিচিত্রা , ২৯ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

৩৯.সংবাদ, ১৫ ই অক্টোবর, ১৯৯৫ ।

৪০. সংবাদ, ২০ শে নভেম্বর, ১৯৯৫ ।

৪১. ইত্তেফাক, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

এই বিভিন্ন ঘটনায় দেখা যায় যে বিএনপি আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ দেশের সর্বত্র সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পায় । সন্ত্রাসী হলো ছাত্রনামধারী বহিরাগত বেকার যুবক যাদের রির্জাভ সোলজার হিসাবে ব্যবহার করেছে প্রতিষ্ঠিত দলগুলি। এই সন্ত্রাসের জন্য কম বেশী প্রত্যেকটি দলই দায়ী ছিল । ড. মিলন হত্যাকারী অভি-নিবু গোষ্ঠিকে বিএনপি বহিষ্কার করলেও আওয়ামী লীগ তাদের দলীয় সংগঠনে আশ্রয় দিয়েছে । এরা সন্ত্রাস চালিয়ে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে । বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মাঝে মধ্যে দলীয় শৃংখলার অভিযোগে তাদের দলের নেতাকর্মীদের বহিষ্কার করে কিন্তু দলীয় সন্ত্রাসী বা আর্মস ক্যাডারদের বহিষ্কারের ব্যাপারে তাদের যতবাধা ছিল । এই সন্ত্রাস বন্ধে সংসদে অনেক উত্তপ্ত আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হয় এবং এ ব্যাপারে একটি সংসদীয় কমিটিও গঠন করা হয় । কিন্তু নিজস্ব দলীয় ছাত্র সংগঠনের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কেউই পদক্ষেপ নিতেরাজী নয় বলে ঐ কমিটি কোন ঐকমত্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় ।

ইনডেমনিটি বিল বাতিল করনে সংসদীয় সরকারের ভূমিকা : তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ ১৯৭৫ সালের ২০ শে আগষ্ট একটি অধ্যাদেশ জারী করেন ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার রহিত করন ও সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের দায় থেকে মুক্তি দেবার জন্য। এই অধ্যাদেশ ২৬ শে সেপ্টেম্বর "ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ, ১৯৭৫" শিরোনামে বাংলাদেশ গেজেট এ প্রকাশিত হয়। ১৯৭৯ সালে জিয়ার শাসনামলে ২য় জাতীয় সংসদে নতুন দল বিএনপির উদ্যোগে এবং বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এর অংশ গ্রহনে ৫ ই এপ্রিল বিলটি আইনে পরিনত হয়। এতে করে শেখ মুজিব সহ অন্যান্যদের বিচারের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এরপর জেনারেল এরশাদের শাসনামলে (১৯৮১-৯০) আইনটির প্রয়োগ হয় সব চাইতে বেশী। তাই স্বৈরাচারের পতনের পর নবগঠিত সংসদীয় সরকারের জন্য সর্বাধিক জরুরি বিষয় ছিল এই কালো আইনটি বাতিল করা।

" তিন জোটের রূপরেখায় ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের অঙ্গীকার ছিল। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া স্পিকারের মাধ্যমে এই অধ্যাদেশ বাতিল সম্পর্কে সম্মতি জানিয়েছিলেন। ১৯৯১ সালের ৬ ই

Dhaka University Institutional Repository

আগষ্ট বিরোধী দলের চীপ হুইপ ও আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিম ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল বিল" সরকারী দলের আপত্তি ছাড়াই উত্থাপন করেন। ৮ ই আগষ্ট আইনমন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে বিরোধী দলের ৭ জন এবং সবকারী দলের ৭ জন সদস্যের সমন্বয়ে মোট ১৫ সদস্য বিশিষ্ঠ এক সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়। এরপর বিলটি বিবেচনার জন্য এই কমিটিতে পাঠানো হয়। [৪২] এই কমিটির দায়িত্ব ছিল বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক জটিলতা মুক্ত করে সংসদে উত্থাপনের জন্য পেশ করা। কিন্তু কমিটি সঠিক সময়ে দায়িত্ব পালনে ব্যার্থ হয় বিধায় এই জরুরী বিষয়টি বিল আকারে উত্থাপনের পরেও সংসদ এই ব্যাপারে কোন সমাধান দিতে পারেনি। ১৯৯২ সালের ১৪ই আগষ্ট এক সাক্ষাতকারে বিরোধী নেত্রী বলেন ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল না করলে বেগম জিয়া তার স্বামীকে খুনী হিসাবে প্রতিষ্টিত করবেন। কারন, বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনী ফারুক ও রশীদ বলেছে, তারা জিয়ার সাথে আলোচনা করে ১৫ আগষ্টের হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার বেনিফিসিয়ারি হচ্ছেন জিয়াউর রহমান ..... খুনীরা আজ দল করছে। তারা দাবী করছে জিয়া তাদের সঙ্গে ছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল না করে তার স্বামীকে খুনী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চান? বঙ্গবন্ধু ও শিশুপুত্র রাসেল সহ নারী হত্যার সাথে খালেদা জিয়া তার স্বামীকে দায়বদ্ধ রাখতে চান। [৪৩]

১৯৭৬ সালে ব্রিটেনের আই টিভিকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে ফারুক বঙ্গবন্ধু হত্যায় জেনারেল জিয়া জড়িত ছিলেন বলে দাবী করে। উল্লেখিত কারনে বিএনপি সরকার শংকিত বোধ করে। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হলে বঙ্গবন্ধুর হত্যা সম্পর্কিত মামলায় হত্যাকারীদের সহায়ক হিসাবে জিয়ার নাম যোগ করার সম্ভবনা উড়িয়ে দেওয়া যায়না। একারনেই বিএনপির তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন "এই অধ্যাদেশটির ব্যাপারটি এখন অন্য রকম আঙ্গিকে দেখার প্রশ্ন আসতে পারে। এটা একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির মাধ্যমে হতে পারে। তথ্য যেহেতু বের হচ্ছে সেটা আইনগতভাবে হওয়া উচিৎ। এটার উপর আর বিচারের প্রশ্ন নাও উঠতে পারে। পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ন নতুন দিকে যাচ্ছে। এই অবস্থায় কার ভূমিকা কি হবে না হবে সেটার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। [৪৪]"

৪২. আবদুল মতিন, *খালেদা জিয়ার শাষন কাল একটি পর্যালোচনা*, রেডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশনস, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৪৭।
৪৩." দৈনিকভোরের কাগজ, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৯২।
৪৪." দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা, ৩০ শে ডিসেম্বর ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

তার বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাক্তন বিচার পতি কে,এম সোবহান বলেন "আত্মস্বীকৃত খুনীরা হত্যাকান্ডের বিভিন্ন দিক এবং বিভিন্ন হত্যারকেন্দ্র ভূমিকার কথা বলেছে ,অথচ বিচারের কথা উঠছেনা । কার কি ভূমিকা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, এটা কোন ধরনের আইনগত পরামর্শ তিনি সরকারকে দিচ্ছেন, তা বোঝা মুশকিল। তিনি এটা বুঝেছেন যে, এইসব বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি একটা জিনিস পরিস্কার করে দিয়েছে। তা হচ্ছে ঐ হত্যাকান্ড বা খুনের বিষয়ে আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেওয়া উচিৎ এবং তা সম্ভব যদি ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিল বিলটি এই (আসন্ন) অধিবেশনে পাশ করা হয়। তাতে অন্তত মানবধিকার বিরোধী একটি বর্বরতা দূর করার কৃতিত্ব হবে বিএনপির "[৪৫]

১৯৯৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৪ বৎসরে সংসদীয় কমিটির ২৫টি বৈঠক হলেও সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত 'বিল' টির বিষয়ে ঐক্যমত হয়নি। সরকারী দলের সদস্যরা বৈঠকে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তাদের পক্ষেও এই অধ্যাদেশ বাতিল করা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত কমিটির রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়নি।

বিএনপি আমলে সংবিধান নির্দেশিত পথে নয় বরং হরতাল, অবরোধের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খোজায় আইনশৃংখলা পরিস্থিতি দারুন অবনতি হয় । এই সময় হরতালের রেকর্ড পূর্বের সকল রেকর্ডকে ভঙ্গ করে । একনাগারে ১৯০ ঘন্টা পর্যন্ত হরতাল করা হয় । হরতাল মানেই রেল লাইন উপড়ে ফেলা , গাড়ী ভাংচুর করা, অফিস আদালতে হামলা ও আতংক সৃষ্টি করা। তাই হরতাল ভয়তালে পরিনত হয়েছে । স্বতস্ফূর্ত ভাবে নয় বাধ্য হয়েই মানুষ হরতাল পালন করে । একদিনের হরতালে ক্ষতির পরিমান ৪০ কোটি টাকা যার বোঝা জনগনকে বহন করতে হয়। বিরোধী দলের হরতাল ডাকার প্রধান কারণ গুলি ছিল ৯৩ সালের মিরপুর উপনির্বাচন এবং ৯৪ সালের মাগুরা উপনির্বাচনে সরকারী দলের ভোট ডাকাতি ও সন্ত্রাসী তৎপরতা ।

৪৫. দৈনিক সংবাদ, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফলকে সরকারী দলের অনুকূলে নেওয়া হয় । ১লা জানুয়ারী ১৯৯৩ মিরপুর উপনির্বাচন ও পৌরসভা নির্বাচন নিয়ে জাতীয় সংসদে তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ ও উত্তপ্ত বির্তক হয় । এ প্রসঙ্গে বিতর্কের সূত্র পাত করেন আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ । তিনি আইন শৃংখলা সম্পর্কে স্পীকারের একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন সরকার স্বীকার করুক আর না করুক , আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে । মিরপুর উপনির্বাচনের আগে এই এলাকায় ১৫০ টি মসজিদের প্রত্যেকটির জন্য সাড়ে ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । জাতীয় পার্টির নেতা এবং বিএনপি প্রার্থীর বাবা এম এ খালেক মসজিদে এই চেক বিলি করেছেন । তোফায়েল সাহেব আরো বলেন, মিরপুরের নির্বাচনে বিএনপি সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে । এরশাদ যেভাবে নির্বাচন করেছে বিএনপি সেভাবেই নির্বাচন করেছে । [৪৬]

মিরপুর উপনির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে ৬ ও ১০ ই ফেব্রুয়ারী সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল ডাকে । এই নির্বাচনে ১৪ মাস পর ২০শে মার্চ ১৯৯৪ মাগুরা উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । সরকার মনে করেছিলো মাগুরা উপনির্বাচনে পরাজিত হলে তারা জনগনের আস্থা হারাবে এবং এতে ক্ষমতা থেকে বিচ্যুতি হবে। তাই এই উপনির্বাচনে বিজয়ের প্রশ্ন তাদের কাছে জীবন মরণ সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। এতে বিএনপি সরকার স্বৈরাচারী হাইলে যে ভাবে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায় তাতে তাদের মুখোস জনগনের সামনে উন্মোচিত হয় । মাগুরা উপনির্বাচটি ছিল বিরোধীদলের চোখের সামনে প্রধানমন্ত্রী সহ ক্ষমতাসীন বিএনপির মন্ত্রী, এমপি, প্রশাসন,পুলিশ বাহিনী, সর্বহারা পার্টির, সশস্ত্র ক্যাডার মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের এক যৌথ অভিযান । অভিযানের লক্ষ্য ছিল নির্বাচনে জয়ী হওয়া, যার ফলাফল সম্পর্কে বিএনপি ঢাকা থেকে নীতি নির্ধারক করে নিয়ে ছিল। [৪৭] নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে আওয়ামী লীগ ২১শে মার্চ মাগুরায় অর্ধ দিবস হরতাল, ২২শে মার্চ রাজধানী সহ সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল এবং ২৩শে মার্চ সারা দেশে হরতাল পালন করে ।

৪৬. ভোরের কাগজ, ২ রা ফেব্রুয়ারী , ১৯৯৩ ।

৪৭. সংবাদ, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের আলোচনায় দেখা যায় বিরোধী দলগুলি সরকারের উপনির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে হরতাল পালন করে । তাদের এই কর্মসূচীর পিছনে যুক্তি থাকলেও হরতাল অবরোধের নামে যে বিশৃংখলা পরিবেশ সৃষ্টি করেএবং জনগনকে বাধ্য করে হরতাল পালন করতে সেটি কোনমতেই গনতন্ত্র সম্মত ছিলনা । মাগুরা উপনির্বাচনের পর থেকেই আইনশৃংখলা পরিস্থিতির দারুন অবনতি হয় এবং সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক দাকুমড়ার পরিনত হয়। এই অবস্থায় একটি সংসদীয় সরকার পরিচালনা করা খুবই কঠিন । কেননা সংসদীয় সরকার পরিচালনার পূর্ব শর্তই হলো সরকারও বিরোধী দলের মধ্যে বন্ধু সুলভ ও সহযোগীতা মূলক মনোভাব । এরপর বিরোধী দলগুলি বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে লাগাতার হরতাল, ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ কর্মসূচীর ঘোষনা দেয় । বিরোধী দলের এই কর্মসূচীর জবাবে সরকারী দলও সন্ত্রাসী তৎপরতার আশ্রয় নেয় । "১৯৯৪ সালের ২৮শে নভেম্বর ঢাকায় শাপলা চত্বরে ছাত্রদলের মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, হরতাল , অবরোধ , পদত্যাগ ও অচল করে দেয়ার হুমকি দেখিয়ে জনগনের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে সরানো যাবে না । জনগনের প্রতি আস্থাহীনতায় যারা এমন প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন । তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই , আপনাদের পয়াছ করতে ছাত্রদলই যথেষ্ট ।[৪৮] প্রধানমন্ত্রীর উক্ত বক্তব্যে ছাত্রদলকে সন্ত্রাস ও মারামারি করার জন্য উস্কানি দেওয়া হয়েছে যেটি দলের নেত্রী ও দেশের নেত্রীর জন্য ছিল সম্পূর্ণ বেমানান । এই অবস্থায় সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা কঠিন কাজ । কেন না বড় বড় বক্তৃতা দিলেই সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয় এজন্য প্রয়োজন সে অনুযায়ী কাজ করা ।

বিএনপি সরকারের আমলে দূর্নীতি ও স্বজন প্রীতিকে বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে । এই সময় বেশ কয়েকজন মন্ত্রী , দলীয় সদস্যের বিরুদ্ধে দূর্নীতি ও স্বজন প্রীতির বহু অভিযোগ পাওয়া যায় । দূর্নীতি দমন ব্যুরো সূত্রে প্রকাশ সবচেয়ে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ, ডাক ও টেলিফোন যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, অর্থ মন্ত্রনালয়ের ব্যাংকিং ডিভিশন, গৃহায়ন ও গনপূর্ত, শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, স্থানীয় সরকার,বেসামরিক বিমান ও চলাচল এবং নৌ পরিবহন এই ১৫টি মন্ত্রনালয় ও বিভাগে ।

৪৮. দৈনিক ইত্তেফাক ,২৯ শে নভেম্বর, ১৯৯৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

বহুক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পাওয়া যায়নি বলে তদন্ত কাজে অগ্রগতি হয়নি । বিএনপি আমলে দুর্নীতির ক্ষেত্রে ৩ টি ঘটনা যেমন (১) কৃষি মন্ত্রী ও তার মন্ত্রনালয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ (২) সার সংকট এবং (৩) প্রধানমন্ত্রীর পরিবার পরিজনের অবৈধ পথে টাকা উপার্জন বেশী আলোচিত হয়েছে।

যার ফলে সংসদীয় সরকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি দুর্নীতি ও সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ গড়তে পারেনি । বরং এই সময় আইন শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয় । সরকার পূর্বের স্বৈরাচারী অধ্যাদেশ গুলি বাতিল না করে নতুন নতুন অধ্যাদেশ জারি করে সন্ত্রাস আরও বৃদ্ধি করে । সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইনটি বাতিলের প্রতিশ্রুতি করলেও এটি বাতিল করেনি বরং এই আইন প্রয়োগ করে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয় । হাইকোর্ট বিশেষ ক্ষমতা আইনে ডিটেনশনের ৮০% আদেশ অবৈধ বলে ঘোষনা করে । ৯৪এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকারী হিসাবে ৬৬৩ জনকে সন্ত্রাস দমন আইনে আটক করা হয় । ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১,৪৯৮ জনকে আটক রাখা হয় । ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সর্ম্পকে এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল এর সঠিক রিপোর্টে বলা হয় ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে বাংলাদেশের বিরোধী দল গুলি নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে সংসদ বর্জন করে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া" অসাংবিধানিক ও অগনতান্ত্রিক আখ্যায়িত করে তাদের এ দাবী প্রত্যাখান করে। বিরোধী দল এবং ইসলামী দলগুলি ক্রমাগত প্রতিবাদ মিছিলের কারণে রাজনৈতিক সহিংসতা অনেক বেড়ে যায় ।

ডিসেম্বর মাসে সবগুলি বিরোধী দল সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে আইন সংস্কার কমিশন গঠনের ঘোষনা দেওয়া হলেও বছরের শেষ নাগাদও তা গঠন করা হয়নি । মৌলবাদীদের হুমকির স্বীকার লেখক, সাংবাদিক এবং এনজিও কর্মীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশানাল বাংলাদেশ সরকারকে বার বার অনুরোধ জানায় ।[৪৯]

৪৯. দৈনিক আজকের কাগজ ৭ই মার্চ ১৯৯৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

আইন শৃংখলা পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে সন্ত্রাস দমন অপরাধ আইন ১৯৯২ জারী করার পর সন্ত্রাসী মূলক অপরাধ হ্রাস পেয়েছে । অপরদিকে এই ধারণাকে ভুল প্রকাশ করে দিয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী অসোন্তষ শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে প্রধানমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে এই সময় বিভিন্ন ধরণের অপরাধ যেমন, চাদাবাজি, চোরাচালান, দূর্নীতিও সন্ত্রাসের প্রসার ঘটে । কলম্বোতে সার্ক সম্মেলন বাতিল হওয়া সত্বেও প্রধানমন্ত্রী ৩ কোটি টাকা ব্যয় করে সে দেশ সফর করেছেন অথচ তার কোন হিসাব সংসদকে দেননি ।

প্রধানমন্ত্রীর অফিসের আপ্যায়ন ভাতা, মন্ত্রিদের ভাতা, এমনকি সংসদ সদস্যরা ঐক্য মতের ভিত্তিতে নিজেদের বেতন বৃদ্ধি করে । এ ব্যাপারে সরকার বা বিরোধী দলের কোন দ্বিমত হয়নি । অর্থাৎ নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ ব্যাপারে তারা সকলেই এক পক্ষ । দলীয় করণের ফলে প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থার অরাজকতা সৃষ্টি হয় । প্রশাসনে দলীয়তন্ত্র কায়েমের উদ্দেশ্যে বিএনপি সরকার অবসর প্রদান সংক্রান্ত আইনের ব্যাপক অপপ্রয়োগ করে। ক্ষমতায় থাকাকালে বিএনপি সরকার ৫ বৎসরে বিভিন্ন মন্ত্রনালয় দপ্তর ও সংস্থায় ৩৮৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর প্রদান করে । দলীয় আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রশাসনের সকল পর্যায়ে ব্যাপক রদবদল হয় ।[৫০] রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যারা শত কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে তাদের বিরূদ্ধে সংসদ কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারেনি।

"আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের অনেকের আচার আচরনে শিক্ষনীয় কিছুই নেই । ভারতে সরকারী ও বিরোধী দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের বিরূদ্ধে দূর্নীতি মামলায় কোর্ট থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা হয় । আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতা, নেত্রী ও কর্মীরা আইন আদালত মেনে চলেন না। প্রেসার গ্রুপ সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের ফিকিরে থাকলে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার অনীহা থাকবেই।" [৫১]

[৫০] জনকণ্ঠ, ১৮ই মে, ১৯৯৫ ।

[৫১] আলহাজ্ব এডভোকেট বদিউল আলম - *রাজনীতির সেকাল একাল প্রসঙ্গে বাংলাদেশের রাজনীতি*, প্রশাসক অধ্যাপক এম, এম, হাবিবুল্লাহ, বাংলাদেশ কো - অপরেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ সিরাজ মইনুল হাবিলি রোড, চট্টগ্রাম-১৯৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

যারা রাষ্ট্র বা সরকারের পরিচালক তারাই যদি দুর্নীতি পরায়ন লোভী ও স্বার্থ পর হন তাহলে রাষ্ট্র ও সমাজ কখনই দুর্নীতিমুক্ত হবে না । আর মানুষ যদি খারাপ হয় তাহলে সেই কদার্য বা খারাপ মানুষ দিয়ে একটি গনতান্ত্রিক সরকার বা সংসদীয় সরকার পরিচালনা করা সম্ভব না । সংসদীয় সরকার পরিচালনায় পূর্বশর্তই হলো সংসদ সদস্যদের মধ্যে রাষ্ট্রেরপ্রতি থাকবে প্রগাঢ় ভালবাসা। ক্ষুদ্র স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে দেশও জাতির কল্যাণে কাজ করবে। তাদের মধ্যে থাকবে পারস্পরিক সহযোগীতা ও সহমর্মিতার মনোভাব।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৫ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসংগ এবং আন্দোলনের গতিধারা ও প্রকৃতি :

৫ম সংসদে যে বিষয়টি বেশী আলোচিত হয়েছে তা হলো সাংবিধানিক ভাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী । বিরোধী দলগুলি এই দাবী উত্থাপন করে। কিন্তু সরকারী দল কর্তৃক প্রথম দিকে এই দাবীর প্রতি ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ার উত্তরের মধ্যে বৈরি সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত সংসদকে অকার্যকর করে দেয় । এই দাবী উত্থাপনের পিছনে দু'টি কারণ কাজ করে । (ক) মাগুরা উপনির্বাচনে ব্যাপক ভোটডাকাতি ও কারচুপি। এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে কাজ করেছে। (খ) অপরটি হলো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান, যেটি পরোক্ষ কারণ হিসাবে কাজ করে। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

(ক) প্রত্যক্ষ কারণ (মাগুরা উপনির্বাচন-২): বিএনপির আমলে দুটি উপনির্বাচন এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের মেয়র ও ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । ৩০শে জানুয়ারী ৯৩ অনুষ্ঠিত ঢাকা চট্টগ্রাম পৌরসভার মেয়র নির্বাচনে আওলীগ প্রার্থীর কাছে বিএনপির প্রার্থী পরাজিত হয়। বিরোধীদল এই নির্বাচনে কারচুপির কোন অভিযোগ আনেনি। ১৯৯২ সালের ৪টা নভেম্বর সংসদ সদস্য হারুন মোল্লা মারা যান। তিনি আওলীগ প্রার্থী ডঃকামাল হোসেনকে পরাজিত মিরপুর (১১) এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন । ১৯৯৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী এই আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মহসীনের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আওলীগ প্রার্থী কামাল মজুমদার। এতে বিএনপির প্রার্থী ৮০,১২৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন । এই নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য কোন সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেনি তবে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু উত্তেজনা, সংর্ঘস, সংঘাত ভোটারদের হয়রানি এবং কিছু জায়গায় জালভোট দেওয়া হয় । বিরোধী দলগুলি এই নির্বাচনে ফল গণনায় কারচুপির অভিযোগ আনে। অর্থাৎ তাদের মতে তাদের প্রার্থীকে জোর করে পরাজিত করা হয়েছে । রাত ৮ টায় ঘোষিত ফলাফলে ১০৫ টি কেন্দ্রে আওলীগ প্রার্থী বিপুল ভোটে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু এর পর অজ্ঞাত কারণে ফলাফল স্থগিত ঘোষণা করা হয় । বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে নির্বাচন কমিশন তাদের পাওয়া ফলের বিপরীতে ঘোষণা দিতে আপত্তি জানালেই বিপত্তি ঘটে। নির্বাচনের পরেরদিন সরকারী ভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

"নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনা সম্পর্কে "হাসিনা বলেন, এই আসনে আঃ লীগ প্রার্থীর বিজয় ছিল সুনিশ্চিত। বিএনপি সরকার মিডিয়া ক্যু করে এই বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে । ১৮টি কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচন দাবী করে তিনি বলেন, নির্বাচনের পর ৭৮টি কেন্দ্রের ফলাফল নির্বাচন কমিশন জানতে পারে। এই ফলাফলে আমাদের আপত্তি নেই। জেলা প্রশাসকের পরিবর্তে বিভাগীয় কমিশনারকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে এবং ডি এম পির কমিশনার হাবিবুল খুদার সাহায্যে আঃলীগ প্রার্থীকে পাঠানো হয়েছে।" [৫২]

ঢাকার পৌরসভার মেয়র নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভের পর আওয়ামীলীগ ভেবেছিল মিরপুর আসনে তাদের প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত । অন্যদিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর বিএনপি মনে করেছিল মিরপুর উপনির্বাচনে পরাজিত হলে দেশ শাসন করা তাদের জন্য সম্ভব হবে না । অতএব যে কোন উপায়েই হোক এই নির্বাচনে তাদের জয়লাভ করতে হবে।

মিরপুর নির্বাচনের পর বিরোধীরা তত্ত্বধায়ক সরকারের দাবী করলেও মাগুরা উপনির্বাচনের আগ পর্যন্ত তা জোড়ালো আকার ধারণ করেনি। তত্ত্বধায়ক সরকার দাবী আন্দোলনে রূপ নেয় ২০শে মার্চ অনুষ্ঠিত ও মাগুরা ২-আসনের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে । নির্বাচনের পূর্বে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছিলেন "উপনির্বাচন যাতে সুষ্ঠু ও শান্তি পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে সে জন্য নির্বাচন কমিশনের সচিবালয়ে অস্থায়ী ভাবে মাগুরায় স্থানান্তর করা হয় ।

৫২. সংবাদ ৫ই ফেব্রুয়ারী ৯৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

ভোট গ্রহনে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনী এলাকার আওতাধীন প্রতিটি ইউনিয়নে নির্বাচন কমিশনের কর্মকতা, চারটি রাজনৈতিক দলের সংসদ সদস্য ও নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে দুটি কার ভ্রাম্যমান টীম গঠনের ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন এই টীম গুলো ভোট গ্রহন কালে ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করে কমিশনারের নিকট সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রির্পোট দাখিল করবে । মধ্যাহ্ন ভোজের পর অনুষ্ঠিত আলোচনাকালে বিএনপির নির্বাচন কার্যালয় টীম গঠনের অসম্মতি জানায়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সন্ধ্যা ছয়টায় সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ে ঘোষনা দিয়েও শেষ পর্যন্ত হঠাৎ করে নির্বাচন কমিশনের লোকজন সহ মাগুরা ত্যাগ করেন ।" [৫৩]

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ভোট গ্রহনকালে নজিরবিহীন সংঘর্ষ, বোমাবাজী, গোলাগুলি, আওলীগ সমর্থকদের ভয়ভীতি, জীবন নাসের হুমকি প্রদর্শন, পেশী ও অস্ত্র বলে ভোট কেন্দ্র দখল ইত্যাদি নির্বাচন বিধি লংঘনের ঘটনা ঘটে । এই ঘটনায় কমপক্ষে ৫০ব্যক্তি আহত হয় এবং ভোট গ্রহন শেষে ১০ জনকে আশংকাজনক ভাবে মাগুরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐ আসনের আওলীগ সমর্থিত প্রার্থী শফিকুল হাসান বাচচু সাংবাদিকদের বলেন "নির্বাচন কমিশনের ওয়াদা অনুযায়ী ভোট কেন্দ্রগুলোতে বিডিআর মোতায়েন না করার কারণে বিএনপির মস্তি এমপিরা ৪/৫ টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সসস্ত্র সন্ত্রাসী সহ অধিকাংশ ভোট কেন্দ্র দখল করে নেয়। এসব ভোট কেন্দ্রে নজিরবিহীন সন্ত্রাস চলাকালে নির্বাচনী দায়িত্বরত ম্যাজিষ্ট্রেটদের পক্ষে দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। কেননা প্রতি ৩টি ভোট কেন্দ্রের জন্য একজন করে ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করা হলেও তাদেরকে গাড়ী দেওয়া হয়নি। ফলে তারা তাৎক্ষনিক ভাবে ঘটনাস্থলে যেতে পারেনি। [৫৪]

৫৩. আজকের কাগজ, ২০শে মার্চ ,১৯৯৪।

৫৪. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র*, পৃষ্ঠা-১৪৫, ১৯৯৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামীলীগ দলীয় সদস্য এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জমানের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়েছিল। ৯১ সালে তিনি ৬১,৭২৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন । ১৯৫৪ সাল থেকে এযাবৎ মাগুড়ায় অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্রার্থী পরাজিত হননা । ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পরই বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন "মাগুড়া, মুহাম্মদপুর, শালিকা নির্বাচনী এলাকায় ভোট কারচুপি করে বিএনপি সর্বকালের রেকর্ড ভেঙ্গে চেম্পিয়ান হয়েছে । প্রধান নির্বাচন কমিশনারও সব কিছু বুঝে শুনে মাগুড়া এসে ঢাকায় ফিরে গেলেন। কিন্তু সুষ্ঠু ভাবে দায়িত্ব পালন না করে তার এই চলে যাওয়াকে আমরা কিসের ইঙ্গিত বলে মনে করবো। তিনি এই আসনে পুনর্নির্বাচন দাবী করেন ।

অনেক গুলি ভোট কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন বিএনপি দলীয় কর্মীরা অস্ত্রের মুখে আওয়ামী লীগ এজেন্টদের তারিয়ে দিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো সীলমেরে ব্যালট পেপার বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়। এর প্রতিবাদে তিনি প্রতিবাদসভা বিক্ষোভ ও হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করে বলেন জনগনের মৌলিক অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে আজ থেকে আন্দোলন শুরুহলো"।[৫৫]

মাগুড়া উপনির্বাচনে বিএনপির কারচুপির ফলে কয়েকটি ঘটনার সৃষ্টি হয় যেটি পরবর্তী নির্বাচনে বিএনপির পরাজয়ের প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়। নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ-

প্রথমতঃ একটি নির্বাচিত সরকার যারা গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় এসেছে তারা ১৯৮৬সালে এরশাদ যেভাবে নির্বাচন করেছে ঠিক সেভাবে স্বৈরাচারী কায়দায় নির্বাচন করে অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছে ।

দ্বিতীয়তঃ এই নির্বাচনে সরকারী প্রশাসন ও রাজনৈতিক শক্তিকে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে নির্বাচনী কারচুপির একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন ঘটিয়েছে । ফলে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে প্রশাসনের উপর কিরকম হস্তক্ষেপ হতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় ।

৫৫. আজকের কাগজ, ২১শে মার্চ, ১৯৯৪.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়তঃ এই প্রথম প্রকাশ্যে এবং সব ধরনের নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে এবং আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে সরকার জেল থেকে সাজাপ্রাপ্ত খুনী ও সশস্ত্র ক্যাডারদের বের করে এনে নির্বাচনের কাজে লাগিয়েছে ।

চতুর্থতঃ এই প্রথম কোন নির্বাচনী ময়দান থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পালিয়ে আসতে হয়েছে ।

"মাগুরা উপনির্বাচনে বিএনপি যে ধারা সৃষ্টি করেছে তার মোদ্দা কথা হলো, ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনের ফলাফল আগে নির্ধারণ করে নির্বাচনে যেতে পারে এবং এই পূর্বনির্ধারিত ফলাফল প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন বেআইনী অর্থনৈতিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে। বিএনপি প্রতিষ্ঠিত এই ধারা বর্জন করতে হবে। দলীয় সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচনে নয়, নির্দলীয় ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই নির্বাচন হতে হবে এবং এটাই রাজনৈতিক বাস্তবতা"।[৫৬]

১৯৯১ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে আওয়ামীলীগের আসাদুজ্জামান পেয়েছিলেন ৬১,৭২৯ ভোট এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি বিএনপির মেজর জেনারেল (অব) মজিদ-উল-হক পেয়েছিলেন ৩১,৫৯০ ভোট । অন্যদিকে বিএনপি সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে (একই আসনে) বিএনপির কাজী সলিমুল হক কামাল পান ৭৩,৬২৩ ভোট এবং আওয়ামীলীগের শফিউজ্জামান বাচচু পান ৩৯,৬২৩ ভোট। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । অথচ এই নির্বাচনে যদি সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতো তাহলে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য বিরোধীদের তত্ত্বাবদায়ক সরকারের দাবী জনগনের কাছে তেমন গুরুত্ব পেতনা । কিন্তু মাগুরা উপনির্বাচনে বিএনপির যেকোন উপায়ে জয় লাভের চেষ্ঠা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীকে জোড়ালো করে এবং এই দাবীর ভিত্তিতে বিরোধী দলগুলির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে সংসদ বর্জনের একটি ভাল ক্ষেত্র তৈরী করে দেয় । কেননা তারা ত্রয়োদশ অধিবেশনে থেকেই সংসদ বর্জন শুরু করে তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদার একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ।

৫৬. (গোলাম রসুল) দৈনিক সংবাদ ২৬ শে ডিসেম্বর ১৯৯৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

(২) **পক্ষে কারণ ঃ** (সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান) বাংলাদেশে এই ধারণা এখন স্বতঃসিদ্ধ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনই সুষ্ঠু ও অবাধ হবে না। কেননা এপর্যন্ত যে কয়টি সরকার গঠিত হয়েছে তাদের অধীনে কোন নির্বাচনই সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়নি। তবে ৯১এর সংসদীয় সরকার তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ায় এই সরকার নিয়ে সকলের অন্যরকম প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু এই সরকারও গতানুগতিক সরকারের মত আচরণ করে। যেমন এই সরকারের আমলে একমাত্র প্রথম নির্বাচন হিসাবে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় । এতে দুটি বড় বিভাগে আওয়ামীলীগ প্রার্থী বিজয় লাভ করে। এই নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানিকে মুছার জন্য বিএনপি পরবর্তী সকল নির্বাচনকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। যেমন মিরপুর ও মাগুরা উপনির্বাচনে কারচুপি ও সরকারের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসী তৎপরতা, যশোরে উপনির্বাচনে কৌশলগত ভাবে পুরানো পরাজিত প্রার্থীকে হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে বিজয়ের ঘোষনা এসবই হয়েছে ক্ষমতাকে আকড়ে থাকার গতানুগতিক প্রবনতা থেকে ।

তত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে বিরোধী দল গুলির ঐক্যবদ্ধ জোট এবং তত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষনা ঃ

ব্যাপক রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্বেও উক্ত সরকারের দাবীতে ৫ম সংসদের তিন বিরোধী শক্তি আওয়ামীলীগ, জাতীয়পার্টি, ও জামাতে ইসলামী একজোট হয় । সর্ব প্রথম জামাতের শেখ আলসার আলী এই সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসদে বিল উত্থাপনের চেষ্টা করলে সরকার বাধা দেয় । পরে এটি সাবজেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয় । এই কমিটি প্রস্তাবটির আইনগত দিক বিবেচনার জন্য সংসদে প্রেরণ করে । কিন্তু সংসদ বিলুপ্তি পর্যন্ত প্রস্তাবটি আর ফিরে আসেনি। এর পর আওয়ামী লীগ এর আবদুর রহিম এম পি, জাতীয়পার্টির মনিরুল হক চৌধুরী এম পি বিল উত্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এর প্রতিবাদে তিনজোট সম্মিলিত ভাবে, অবরোধ, বিক্ষোভ, লাগাতার সংসদ বর্জন, হরতাল, ভাংচুর, সন্ত্রাস, প্রভৃতির মাধ্যমে সরকার পতনের আন্দোলনে নামে। ১৯৯৪ সালের ২৭শে জুন বিরোধী দল সম্মিলিত ভাবে তত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে ।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ ঘোষনায় বলা হয় -

(ক) একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দেবার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন ।

(খ) রাষ্ট্রপতি ঐ অন্তবর্তীকালীন তত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনার জন্য সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলনরত রাজনৈতিকদল সমূহের পরামর্শক্রমে একজন নির্দলীয় গ্রহনযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং সেই প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে তার দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) ঐ অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন ও নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করবেন ।

(ঘ) অন্তবর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হবে একটি অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধান প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধুমাত্র জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা ।

(ঙ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেবার ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ।

(চ) সংসদ নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সাথে সাথে অন্তবর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে ।**

সরকারী দল কর্তৃক বিরোধী দলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও নিজস্ব রূপ রেখা ঘোষনা ঃ বিরোধীদলের উক্ত রূপরেখা সরকারী দল কর্তৃক প্রত্যাখান করা হয় । কারণ এতে দুটি বিষয় ছিল যেটি গনতান্ত্রিক ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না ।

** তত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষনা, দৈনিক সংবাদ, ১৯৯৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত ঃ মনোনয়ন দানের প্রথা গনতান্ত্রিক রীতিনীতির বিরোধী।

দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রস্তাবের ২ নং ধারায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে বিরোধী দলগুলির মনোনীত প্রার্থী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করবেন এবং সরকারী দলের এতে কোন ভূমিকা থাকবেনা। এটি কোন মতেই গ্রহণ যোগ্য ছিল না ।

সরকারী দলের প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপঃ

''প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে স্বপদে বহাল রেখে সংসদের সাধারণ নির্বাচনের ৩০ থেকে ৪৫ দিন পূর্বে তার নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী সহ সরকারী দলের ৫ জন সাংসদ এবং বিরোধী দলের ৫ জন সাংসদের সমন্বয়ের অন্তবর্তী কালীন ক্ষুদ্র মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের কারও সরাসরি অধীনে কোন মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব থাকবেনা। মন্ত্রনালয়গুলো পরিচালিত হবে মন্ত্রিসভার যৌথ নেতৃত্বের ভিত্তিতে । তবে মন্ত্রনালয়গুলোর দৈনন্দিন নিয়মিত কাজের ক্ষমতা থাকবে সচিবদের হাতে। তারা নিয়মিত দাপ্তরিক কাজ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি মন্ত্রিপরিষদের বিবেচনাও সিদ্ধান্তের জন্য পাঠাবেন। মন্ত্রিপরিষদের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে । সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী তার নির্বাচনী বা কাষ্টিং ভোট দেওয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেননা । মন্ত্রিপরিষদ প্রয়োজন বোধে যেকোন বিষয়ে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং যে সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের সচিবদের কাছে কার্যকর করার জন্য পাঠানো হবে। সকল মন্ত্রনালয় ও বিভাগের সচিবগন যৌথ মন্ত্রিপরিষদের কাছে জবাবদিহি করবেন, কোন একজন একক মন্ত্রির কাছে নয়। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা সংসদের নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী দেশের সর্বত্র তার দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারাভিযান করতে পারবেন ।

কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের অন্য সদস্যরা নিজ নির্বাচনী এলাকার বাইরে অন্য কোন প্রচারভিযানের অংশ নিতে পারবেন না । প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সদস্যরা নির্বাচনী প্রচারভিযানে যানবাহনসহ রাষ্ট্রীয় কোন সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে প্রধানমন্ত্রী তার নিরাপত্তা সম্পর্কিত যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাবেন।'' [৫৭]

৫৭. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী দলের উক্ত প্রস্তাবটিও বিরোধী দল কর্তৃক প্রত্যাখান করা হয় । এর পিছনে মূলত ৩টি কারণ ছিলঃ-

প্রথমতঃ উক্তরূপরেখাটি তত্বাবধায়ক সরকার ধারনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলনা;

দ্বিতীয়ত ঃ প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের সকলমন্ত্রী দফতর বিহীন হওয়ায় অন্তবর্তীকালীন রাষ্ট্র পরিচালনায় অচলাবস্থা এবং প্রশাসনে জবাবদিহিতা শূন্য অবস্থার সৃষ্টি হবে ।

তৃতীয়ত ঃ প্রধানমন্ত্রী কার্যনির্বাহীকভাবে ক্ষমতাবিহীন হয়েও তিনি সরকারপ্রধান হিসাবে সংসদের নির্বাচনের ফলাফল নিজের দলের অনুকূলে নিতে পরোক্ষভাবে প্রশাসন সহ নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করতে পারেন ।

এরপর বিরোধী দল ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯৪ তারিখে তত্বাবধায়ক সরকারের চূড়ান্ত রূপরেখা পেশ করে । যেটি নিম্নরূপ ছিল ।

(ক) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে পদত্যাগ করতে হবে।

(খ) ৫ম জাতীয় সংসদ বাতিল করে অবিলম্বে নতুন জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন দিতে হবে।

(গ) রাষ্ট্রপতি একটি অন্তবর্তীকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকার গঠনকল্পে লক্ষ্যে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি অথবা একজন নির্দলীয় গ্রহনযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে তার কার্যপরিচালনা করবেন। অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করবেন ।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) অন্তবর্তীকালীন সরকারের মুল দায়িত্ব হবে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধানে বর্ণিত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সহ শুধু জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা ।

(ঙ) সংসদ নির্বাচনের অব্যবহিত পরে সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩নং দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সাথে সাথে অন্তবর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে ।

(চ) আগামী নির্বাচনের পর গঠিত নতুন জাতীয় সংসদ সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনীর মত একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে উপরোক্ত ব্যাবস্থাকে আইন সম্মত করবে এবং একই সাথে ভবিষ্যতে আরও অন্তত ৩টি সাধারণ নির্বাচন এরূপ ভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সংবিধানে সংযোজিত করা হবে ।[**]

তত্ত্বাবধারক সরকার প্রশ্নে সংকট নিরসনের জন্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগ: ৫ই অক্টোবর ১৯৯৪ তারিখে কমনওয়েলথ সচিবালয়ের সেক্রেটারী জেনারেল এমেকা আনিয়াউকু এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সরকারী দল ও বিরোধী দল গুলির মধ্যে আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজনে কমনওয়েলথ এরপক্ষে সহায়তা করার জন্য অস্ট্রেলিয়ার সাবেক গর্ভনর স্যার স্টিফেন নিনিয়ানকে বিশেষ দূত হিসাবে নিয়োগের কথা ঘোষনা করেন। তাঁর এই মধ্যস্থতার ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী দল উভয়েই সম্মতি জানায় । ১৩ই অক্টোবর ১৯৯৪ তারিখ স্যার নিনিয়ান তার দুজন সহযোগীকে নিয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং ঐদিনই অতিথি ভবন পদ্মায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন "আমার মিশনের কাজ হবে আয়োজকের ভূমিকায়, অবশ্যই মধ্যস্থতা কারীর ভূমিকায় নয়। সহায়তাকারীর ভূমিকা কখনোও হস্তক্ষেপ করার পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি সংশ্লিষ্ট দুপক্ষকে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করছি মাত্র ।[৫৮]

** তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা।

[৫৮] ১৯৯৪ দৈনিক ইত্তেফাক ,১৪ ই অক্টোবর ।

Dhaka University Institutional Repository

১৪ই অক্টোবর সকাল ১১টায় জাতীয় সংসদ ভবনে স্থায়ী কমিটির পক্ষে আওয়ামীলীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামী সাথে স্যার নিনিয়ান প্রায় ২ঘন্টা বৈঠক করেন এবং ১৫ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী তেজগাওস্থ কার্যালয়ে তার সাথে প্রায় দেড়ঘন্টা বৈঠক করেন । তার সাথে দলের অন্যান্য কর্মকর্তা ছিলেন । বৈঠকের শেষ পর্যায়ে স্যার নিনিয়ানকে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে আমাদের মনে হয় যে বর্তমান সংকটের একটা সমাধান খুঁজে পাব। এভাবে ২৯শে অক্টোবর পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে পৃথক পৃথক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । ২০শে অক্টোবর বিরোধীদল ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করার বিষয়টিকে আলোচনার মূল এজেন্ডা নিয়ে সরকারের সাথে আলোচনায় বসতে সম্মত হন ।

২০শে অক্টোবর তারিখে রাত ৬টা ৫০ মিনিটে সংসদ ভবনে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু হয় সরকারী দলের ১৪ জন ও বিরোধী দলের ১৫ জনের অংশ গ্রহনে । এভাবে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলে কোন ইতিবাচক ফলাফল ছাড়াই । আলোচনায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে সরকার বিরোধীদল ও গ্রুপ গুলোর নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থার অধীনে সংসদের ভবিষ্যৎ সকল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী নীতিগত ভাবে মেনে না নেওয়া পর্যন্ত বিরোধীদল সরকারীদলের সাথে আর কোন বৈঠক করবেন না। অপরদিকে বিরোধী নেত্রী স্যার নিনিয়ানকে জানান যে আলোচনার পাশাপাশি আন্দোলন অব্যাহত থাকবে । বিরোধীদল তাদের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত গনতান্ত্রিক রীতি নীতি অনুযায়ী আন্দোলন ও আলোচনা চালিয়ে যাবে । তবে সরকারকে ইতিবাচক প্রস্তাব নিয়ে আসতে হবে । নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নে ইতিবাচক প্রস্তাব ছাড়া শুধু আলোচনায় বসা অর্থহীন । এদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সরকারী দল দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিএনপির এক অংশ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিক ভাবে মেনে নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দেন । অপর অংশের নেতারা দলের নীতি নির্ধারকের সাথে পরামর্শ না করেই একতরফা ও ব্যক্তিগত ভাবে নিজস্ব মতামত দেবার জন্য তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার জন্য অনুরোধ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তারই প্রেক্ষিতে নাজমুল হুদা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রি পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন ৫ই নবেম্বর ১৯৯৪ তারিখে । এর আগে নাজমুল হুদা ২রা নবেম্বর ১৯৯৪ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক এর কাছে দেওয়া এক সাক্ষাকারে ৫ বছর মেয়াদ পর্যন্ত সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচার পতির নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের ৪ জন বিচার পতির সমন্বয়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিক ভাবে প্রবর্তনের প্রস্তাব দেন । কিন্তু সে রাতেই তার দেওয়া প্রস্তাব প্রত্যাখান করে নেন । তা সত্বেও তার ঐ বক্তব্যে ঢাকার কূটনৈতিক মহল ও আন্দোলনরত দলগুলির মধ্যে কৌতুহল সৃষ্টি হয় এবং তাবা বলেন যে উক্ত প্রস্তাবের মাধ্যমে আলাপ আলোচনা হলে একটি সমঝোতায় পৌছানো সম্ভব । কিন্তু দলীয় শৃংখলার বিধান এব জন্য তথ্যমন্ত্রী কে পদত্যাগ করতে হয় ব্যক্তিগত ভাবে মতামত দেবার জন্য ।

বিরোধীদলের বিপরীতে দেওয়া সরকারীদলের তত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখা সম্বলিত সর্বশেষ প্রস্তাব স্যার নিনিয়ান ১৩ই নভেম্বর ৯৪ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করেন । কিন্তু উক্ত প্রস্তাবে ত্রুটি থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও অষ্ট্রেলিয়ার কুটনৈতিক মিশনের প্রধানগন আরও গ্রহন যোগ্য প্রস্তাব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন । কিন্তু তাদের পক্ষে আর ছাড় দেওয়া সম্ভব নয় । এই মন্তব্য করে বিরোধীদলের সাথে আলাপ আলোচনার পথ বন্ধ করে দেয়। এভাবে সরকারীদল বিরোধীদলের প্রস্তাব বিবেচনা করার অসম্মতি জানালে নিনিয়ান ১৯শে নভেম্বর তার মিশন সমাপ্তির ঘোষনা দেন । ৩৯ দিনের ব্যর্থ মিশনেব পর ২১শে নভেম্বর সোমবার ঢাকা ত্যাগ করেন । যাবার প্রাক্কালে বিরোধীদল তাকে পক্ষপাতিত্ব করার জন্য দোষারোপ করেন । দু'পক্ষের সংকট নিরসনে বিদেশী মিশন ব্যর্থ হলে ঢাকায় অবস্থিত বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা ও দেশের চেম্বার্স অব কমার্স এর ব্যবসীরা উদোগ গ্রহণ করে তারাও ব্যর্থ হন । এরপর প্রাক্তন তথামন্ত্রী নাজমুল হুদার নেতৃত্বে মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা ও জাতীয় সংসদের স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলীর নেতৃত্বে আর একটি কমিশন অচলাবস্থা নিরসনে উদোগ গ্রহণ করে । কিন্তু তাও ফল প্রসূ হয়নি ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম সংসদের সমাপ্তি, ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সংসদ গঠন এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ :

১৯৯৪ এর ৮ই নভেম্বর তারিখে পৃথক পৃথক সমাবেশে ৩টি বিরোধী দল ঘোষনাদের যে ২৭ শে ডিসেম্বর ৯৪ তারিখের মধ্যে তাদের দাবী মেনে না নিলে ২৮শে ডিসেম্বর একযোগে পদত্যাগ করবে। এদিকে ১১ই ডিসেম্বর ১৯৯৪ তারিখে হাইকোর্ট বিরোধীদের সংসদ বর্জন অবৈধ বলে ঘোষনা করে। "The Supreme Sourt stayed the High Court verdict. The opposition members of parliament had been boycotting its settings since the Magura by election of 19th March 1994. Sheikh Hasina by din't of her inherited qualities of leadership unified all the opposition MP's to abstain from attendig the session of the parliament, because the BNP did not agree to hold the election under a care taker government." [৫১] এদিকে সমস্যার কোন সুরাহা না হওয়ার ২৮ শে ডিসেম্বর বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি চুড়ান্ত রূপ রেখা ঘোষনা দেয় এবং ঐ দিনই আওয়ামীলীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর ১৪৩ জন সাংসদ স্পীকারের নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করে। তবে এই পদত্যাগ পত্র একই তারিখে পেশ করা হলে পৃথক পৃথক ভাবে স্পীকারের কাছে জমা দেওয়া হয়। আওয়ামীলীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ৯৩ জন সাংসদের মধ্যে ৯১ জন সাংসদের পদত্যাগ পত্র রাত ৯ : ৪০ মিনিটে স্পীকারের নিকট হস্তান্তর করেন । আওলীগের এক জন সাংসদ হেমায়েত উল্লাহ আওরঙ্গ জেলে থাকায় এবং অপর এক জন সাংসদ গুরুতর অসুস্থ থাকায় তাদের পদত্যাগ পত্র পরবর্তীতে জমা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

৫১. The Daily Star, 19th December, 1994.

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের নেতা ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ তার দলের ৩৫ জন সাংসদের মধ্যে নিজের সহ ৩৪ জনের পদত্যাগ পত্র স্পীকারের কাছে হস্তান্তর করেন রাত ৯টা২২ মিনিটে । জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ জেলে থাকায় তিনি তার পদত্যাগ পত্র ডিজিপ্রিজনের মাধ্যমে পাঠাবেন বলে জানানো হয়। জামাতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা মতিউর রহমান নিজামী নিজে সহ দলের ১৯ জনের পদত্যাগপত্র স্পীকারের কাছে হস্তান্তর করেন রাত ৯টা ২৫ মিনিটে। সর্বশেষ এনডিপির একমাত্র সাংসদ সালাউদ্দিন কাদের চৌধরী তার পদত্যাগ পত্রও হস্তান্তর করেন। ৫ম জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় অপর তিনজন সাংসদ যথাক্রমে ওয়ার্কাস পার্টির একমাত্র সাংসদ রাশেদ খান মেমন। ইসলামী ঐক্য জোটের একমাত্র সাংসদ মওলানা ওবায়দুল হক এবং গনফোরামের একমাত্র সাংসদ পদত্যাগপত্র পরবর্তীতে জমা দিবেন বলে জানানো হয় । এভাবে তিন বিরোধী দলের ১৪৩ জন সাংসদ একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা গনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত হয়। তার ফলে জনমনে সৃষ্টি হয় দারুন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা।[৬০]

২৯শে ডিসেম্বর ১৯৯৪ তারিখে খালেদা জিয়া ঘোষনা দেন যে বিরোধী দলের কথা অনুযায়ী তিনি নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে ক্ষমতা ছেড়ে দিবেন। কিন্তু বিরোধীরা জানায় যে তাদের পদত্যাগ পত্র পেশ করার পর ঐ ঘোষনা দেওয়া হয় বলে ঐ প্রস্তাব তারা মেনে নিতে পারেনা। " Had she announced the proposal only a day before, thing would have been different. Sheikh Hasina announced that the Awami league was ready to participate in the election under an interim government headed by the priesident." [৬১]

৬০.এ,ম এ ওয়াজেদ মিয়া, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র*,ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা, ৩১৪- ৩১৫।

৬১. Shiraj Uddin Ahman, ***Sheikh Hasina Prime Minister Of Bangladesh***, Golam Mostafa , Hakkani Publishers 1999, page-194.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ এর ২৩শে ফেব্রুয়ারী সংসদের ১৮দল অধিবেশনে স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী বিরোধী দলের পদত্যাগের বিরুদ্ধে রুলিং জারী করে প্রধানতঃ দুটি কারনে। প্রথমতঃ স্পীকার বলেন যে সাংসদের পদত্যাগপত্র ব্যক্তিগত ভাবে পেশ করা উচিৎ ছিল কিন্তু তা না করে দলগুলি একত্রে পদত্যাগপত্র জমা দেয়। দ্বিতীয়ত তিনি বলেন এই ধরনের পদত্যাগের রীতি সংসদীয় ব্যবস্থায় নাই বলে তারা সংসদীয় গনতন্ত্রের চেতনাকে অবমাননা করেছে। বিরোধীরা স্পীকারের রুলিং এর বিরোধীতা করে বলে যে এই রুলিং জারী করার ক্ষমতা তাঁর নাই এবং তিনি সংসদ ডাকায় আদালতের অবমাননা করেছেন বলে বিরোধী নেত্রী তাঁর বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক ভাবে মামলা দায়ের করে। ১৯ শে জুন ১৯৯৫ প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ১০৬ ধারা মোতাবেক পদত্যাগকৃত সদস্যদের আইনগত অবস্থান সম্পর্কে সাংবিধানিক ব্যাখ্যা চান ১৯৯৫ এর ২৭ শে জুলাই প্রধান বিচারপতি ও ৫ জন বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত আপীল বিভাগ সিদ্ধান্ত দেয় যে বিরোধী সদস্যদের ওয়াক আউট, বয়কট, অনুমতি বিহীন সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত হবে এবং ঐদিনই উক্ত সদস্যদের পদ শুন্য ঘোষনা করে। এজন্য ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা দেখা দেয়।

প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে সাংবিধানিক সংকট দূর করার আহবান জানান। কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ.কে.এম. সিদ্দিক উপ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রীর সাথে দ্বিমত পোষন করেন। বিরোধী দলের সাথে তিনিও একমত পোষন করেন যে তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। বিরোধী দল গুলি এভাবে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান ঘোষনা প্রত্যাখান করে। প্রধানমন্ত্রী এর উত্তরে ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ তারিখে বলেন যে তত্বাবধায়ক সরকারের ধারনা যেহেতু সংবিধানে নেই সেহেতু তিনি সংবিধান বহির্ভূত কোন কাজ করতে পারবেন না এবং এই প্রশ্নে তিনি অটল থাকেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রাজনৈতিক সংকট দূর করার জন্য দুই নেত্রীর মধ্যে চিঠি আদান প্রদান শুরু হয়। এদিকে ১৯ শে নভেম্বর সংসদের ২২তম অধিবেশনে সংসদ সমাপ্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষনা দেন এবং বিরোধী দলকে সামনাসামনি আনুষ্ঠানিক ভাবে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেন। প্রধানমনন্ত্রী বিরোধী নেত্রীকে পরপর তিনটি চিঠি পাঠান। কিন্তু তাতে তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোন উল্লেখ ছিলনা।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হাসিনা তার শেষ চিঠিতে সংসদ বাতিল করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা প্রস্তাব করেন যে , খালেদা জিয়া যেন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সুপারিশ করেন রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের কাছে। এর এক ঘন্টা পর বেগম জিয়া পাল্টা টেলিফোন করেন শেখ হাসিনাকে। বেগম জিয়া আবারও পূর্বের ন্যায় তার অনঢ় ও অনমনীয় মনোভাব ব্যক্ত করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী গ্রহনযোগ্য নয় বলে আওয়ামীলীগ প্রধান ও বিরোধী দলীয় নেত্রীকে জানিয়ে দেন। সুতরাং শান্তি পূর্ণ আলোচনার সকল পথই বন্ধ হয়ে যায় আন্দোলন ছাড়া আর কোন পথই খোলা থাকে না।[৬২]

ইলেকশন কমিশন প্রথমে ১৮ই জানুয়ারী উপনির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে। বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়ার সাথে খোলাখুলি আলোচনার প্রস্তাবে বলেন যে একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের পর আলোচনায় বসা যেতে পারে । এদিকে ১৯৯৬ এর ২রা জানুয়ারী বিএনপি সংসদীয় নির্বাচনের জন্য ২৯৯টি মনোনয়ন পত্র জমা দেয়। ৪ঠা জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ডেভিড এম মেরিন বিরোধী দলের সাথে আলোচনা শুরু করেন বিদ্যমান সংকট নিয়ে। ৫ই জানুয়ারী বিরোধীরা রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য অনুরোধ করে। ৭ই জানুয়ারী তারা ৪৮ ঘন্টা হরতালের ডাক দেয়। ৮ই জানুয়ারী ইলেকশন কমিশন নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে, ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্ধারন করে। এই ঘোষনার পর বিরোধী দলগুলি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় এবং নির্বাচন বয়কটের জন্য দেশবাসীর কাছে আহবান জানায়। দেশের আপামর মানুষ বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠন এমন কি সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী যে আহবানের প্রতি তাদের একাত্মতা ঘোষনা করে। বিরোধীদের এই অসহযোগ আন্দোলন ঠেকানোর জন্য এবং রাজনীতিকে অন্যদিকে মোড়দেবার জন্য সরকারী দল জেনারেল মঞ্জু হত্যা মামলা শুরু করে । " Begum Khaleda Zia started the General Monjur murder case. Major General Monjur was killed in Chittagong. She tried to entangle General Hossain Mohammed Ershad in the case. Ershad and few army officers ware charged with murder. The BNP wanted to divert the attentio of the pcople to the case and at the same time, put presure on Ershad to compromise with BNP". [৬৩]

৬২. আজকের কাগজ, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।
৬৩. Holiday 18th January 1996.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬ এর ১৯শে ফেব্রুয়ারী এক সমাবেশে শেখ হাসিনা ১৫ই ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের সাথে ১৯৭০ সালের উপনির্বাচনের তুলনা করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে উপনির্বাচনের ঘোষনা দেন। তিনি আরও বলেন যে যখন সমগ্র দেশ গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছে তখন সরকারি দল গনতন্ত্র হত্যাব নীল নকসা তৈরি করছে এবং দেশকে একটি দ্বন্দ সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলেদিচ্ছে। তিনি আরও বলেন একদলীয় নির্বাচন জনগন প্রত্যাহাব করবে । এই সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বিএনপি সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলে বিভিন্ন অভিযোগ ও সমালোচনা করে।

পূর্ব ঘোষনা অনুযায়ী ১৫ই ফেব্রুয়ারী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র বিএনপি এবং কিছু সাম্প্রদায়িক দলও স্বতন্ত্র প্রার্থী এতে অংশ গ্রহন করে। প্রধান বিরোধী দল সহ দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠি এবং বিভিন্ন পেশাজীবি সম্প্রদায় এই নির্বাচন বয়কট করে। এই নির্বাচন প্রতিরোধ করতে গিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে শতাধিক ব্যক্তি প্রান বিসর্জন দেয়। সর্বোচ্চ শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগের বেশী ভোটার ভোট কেন্দ্রে না গেলেও বিএনপি ভোট ডাকাতির আশ্রয় নিয়ে দলীয় কর্মী ও বসংবদ প্রশাসনের সহায়তায় জাল ভোট দিয়ে ভোটের বাক্স ভর্তির অপচেষ্টা চালায়।[৬৪] এই নির্বাচনে বিএনপি ১২৮টি আসনে জয়লাভ করেন । ১০০টি কেন্দ্রের ফলাফল স্থগিত ঘোষনা করা হয় । নির্বাচন চলাকালীন সময় ১৩ ব্যক্তি নিহত হয় । ২৭শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব ১০৫ জন শিক্ষক এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেন যে ১৫ ই ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তারা নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখান করে। এছাড়া বিভিন্ন পেশাজীবি যেমন আইনজীবি, সাংবাদিক, কবি সাহিত্যিক, লেখক সকলেই এই নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখান করে। কেবল দেশবাসীই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র এই একদলীয় ভোট ডাকাতির প্রহসনের নির্বাচনে হতাশ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের মুখপাত্র নিকোলাস বার্নস ২৭ শে ফেব্রুয়ারী এক বিবৃতিতে বলেন" The recent election in Bangladesh had a lot to be desired and those election had flaws in administration" .[65] মার্কিন প্রেসিডেন্ট পরিষদের সদস্য বিল রিচার্ডসনও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

৬৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬।
65. Dhaka Courier , 13th March, 1996.

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলের লাগাতার হরতাল অবরোধের মুখে বিএনপি সরকার ৩রা মার্চ ১৯৯৬ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে ৩টি প্রস্তাব দেয়। এগুলি ছিল :-

(১) জনগনের চাহিদা মাফিক ভবিষ্যতের সকল সাধারণ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে। প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর নির্দিষ্ট কাজের বাইরে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিতে পারবেনা।

(২) ষষ্ঠ সংসদের প্রথম অধিবেশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল উথাপন করা হবে। এবং যতশীঘ্র সম্ভব সেটি পাশ করা হবে।

(৩) খুব শীঘ্র ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হবে।

বিরোধী দল সরকারী দলের উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখান করে এবং প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার করে। ৪ঠা মার্চ বিএনপি জিয়াকে ষষ্ঠ সংসদের প্রধান হিসাবে ঘোষনা করে। ৭ই মার্চ বিরোধী নেত্রী হাসিনা সরকারের সামনে পাঁচটি প্রস্তাব দেয়।

(১) ৯ই মার্চের মধ্যে বিরোধী সকল নেতা ও কর্মীকে মুক্তি দিতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা তুলে নিতে হবে।

(২) ১৫ ই ফেব্রুয়ারীর প্রহসন মূলক নির্বাচন বাতিল করতে হবে এবং অবিলম্বে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে।

(৩) প্রেসিডেন্ট আন্দোলনরত দলগুলির সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন প্রসঙ্গে আলোচনা করবেন এবং শীঘ্র ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন পরবর্তী মে মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

(৪) যারা জীবন হারিয়েছে, সম্পদ হারিয়েছে তাদের ক্ষতি পূরণ দিতে হবে।

(৫) আইন শৃংখলা পরিস্থিতি রক্ষা করতে হবে এবং জনগনের জানমালের নিরাপত্তা দিতে হবে।**

** Shiraj Uddin Ahmed, op-cit, Page – 162.

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত দাবীর প্রতি বিএনপি সাড়া না দেওয়ায় ৯ই মার্চ থেকে বিরোধী দল শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। দেশের সমগ্র জনগন এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে অগনতান্ত্রিক বিএনপি সরকারের পতন দাবী করে এবং ষষ্ঠ সংসদ বাতিলের কথা বলে । প্রেসিডেন্ট সংকট নিরসনের উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হন। কারণ তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের বাইরে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারেন নাই । তিনি নিজেই একথা স্বীকার করেছেন। ৬ জন বিশেষজ্ঞ প্রেসিডেন্টকে উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে "আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট । এটা সত্যি যে আপনার ক্ষমতা সীমিত । এই সংকটময় মূহুর্তে আপনিই একটা কিছু করতে পারেন। যদি আপনি গনতন্ত্রের বিজয় আনতে পারেন তবেই জনগনের বিজয় সূচিত হবে।" [৬৬] নির্বাচনের দীর্ঘ ৩২ দিন পর প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস ১৯শে মার্চ খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে ২৭ সদস্যের মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। কেবল মাত্র ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদুত ছাড়া আর কোন বিদেশী রাষ্ট্রদুত ও মিশন প্রধান উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। ২০শে মার্চ শিক্ষা মন্ত্রী আমানুল্লাহর সাথে তার কর্মচারীর দন্দ্ব হলে সচিবালয়ে এক বিক্ষুব্ধ পরিবেশের সৃষ্টি হয় । এই ঘটনার পর থেকে মন্ত্রিরা তাদের দপ্তরে যাওয়া বন্ধ করেন। সরকারী কর্মচারীরাও সরকার পতনের আন্দোলনে যোগদেয় । তারা দাবী করেন যে এই মন্ত্রি পরিষদের অধীনে তারা কাজ করবে না।

২১শে মার্চ তথাকথিত ষষ্ঠ সংসদে তত্বাবধায়ক সরকার বিল উথাপন করা হয়। এতে প্রধান উপদেষ্টাসহ ১১ সদস্যের নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাব করা হয়। ২৩শে মার্চ থেকে বিরোধীদের অসহযোগ আন্দোলন নতুন দিকে মোড় নেয়। সচিবালয়ের সামনে ও প্রেস ক্লাবের সামনে জনতার মঞ্চ তৈরি করা হয় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ হানিফ এর নেতৃত্বে।

৬৬. দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৫ই মার্চ, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

মেয়র ঘোষনা দেন যে তাদের অসহযোগ আন্দোলন রাতদিন এক নাগারে চলবে যতক্ষন না প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবে। ২৫শে মার্চ পুলিশ সেই মঞ্চে লাঠি চার্জ করে ব্যর্থ হয়। এর পর সকল জেলায় এই মঞ্চ তৈরি করা হয় । একদিকে সরকারী কর্মচারীরা ২৭শে মার্চের মধ্যে ষষ্ঠ সংসদের বিলুপ্তি দাবী করে। অন্যথায় তারাও সরাসরি আন্দোলনে যোগ দিবে বলে ঘোষনা দেয়। সচিবালয়ের সামনে পুলিশ বাহিনী , বিডিআর বাহিনী এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। সচিবালয়ের হাজার হাজার কর্মী জনতার সাথে যোগ দেয়। "It was unique in the history of the subcontinent that government officials and other employees directly two part in the overthrowing the government. Secretaries of diffrent ministries their unity with the movement. About 1.9 million officials and employees from the grassroot level to the highest level of the republic took part in the movement and demanded the resignation of the BNP government and election of the national assembly under a neutral care taker government".[৬৭]

২৭শে মার্চ সকাল ছটায় সংসদের ত্রয়োদশ সংশোধনী তথা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ হয় । এবং ২৮শে মার্চ প্রেসিডেন্ট এ বিলে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর প্রদান করেন। বিলটি যেহেতু তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল বিএনপি সংসদে উত্থাপন করে ও পাশ করে তাই এই বিলের প্রতি বিএনপির ইতিবাচক সম্মতি আছে বলে বিশ্বাস করা যায়। " The BNP Government had to yield under pressure and finally acquised the caretaker Government though the 30th amendment to the constitution passed in the six parliament. The 6th parliamentary election was held in Feburuay 15 , 1996, which was boycotted by all the major opsition political parties had a life expectency only for four working days." [৬৮]

৬৭. The Daily Star, Dhaka, 20-26 March , 1996.
৬৮.M Syefullah Bhuyan . Arun Kumar Goswami, BCS(ED) The July 1996 Parliamentary Election in Bangladesh : *A Review S S R* Vol XV, No-2 (1999) : 1937

Dhaka University Institutional Repository

"তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা কেয়ার টেকার সরকার এর দাবী নিয়ে যেহেতু আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামী দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছে। তাই সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাশ হওয়ায় এই দলগুলি সন্তুষ্ট হবারই কথা। কিন্তু এই বিল পাশ হবার পরও আন্দোলন অব্যাহত থাকে। জনতার মঞ্চ গনতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিনত হয়। এই আন্দোলন ঠেকানোর জন্য সরকারি দল গনতন্ত্রের মঞ্চ তৈরি করে কাকরাইল অফিসের সামনে। তারা সরকারী কর্মচারী ও সচিবদের উপর হামলা করে। এথেকে তারা জনগন থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।"[৬৯]

অনেক সংগ্রাম ও জানমালের ক্ষতি ও জনরোষের মুখে ৩০শে মার্চ ১৯৯৬ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন। বিচার পতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ও উপদেষ্টা হিসাবে শপথ গ্রহন করেন। ৩০ শে মার্চ পযর্ন্ত বিরোধী দল গুলির সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচী বলতে থাকায় নির্দিষ্ট ভাবে ত্রয়োদশ সংশোধীন বিষয়ক কোন বক্তব্য বা মন্তব্য এদলগুলোর পক্ষ থেকে করা হয়নি। ৩০শে মার্চ রাত ৯টা ৪৩ মিনিটে প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহনের পর সাংবাদিকদের আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় পার্টি নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী ও জামাতে ইসলামী নেতা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের আন্দোলন সাফল্যের প্রথম স্তর।[৮০] একই দিনে একই বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, " নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনগত মর্যাদা সম্পর্কে অনেকের মনে নানা প্রশ্ন রয়েছে। এই সব প্রশ্নে আমরাও সচেতন। তাই জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এই সব আইনগত প্রশ্ন সমাধানের বিষয়টি পরবর্তী জাতীয় সংসদের নিকট অর্পন করাই সমীচিন হবে। শেখ হাসিনার এই বিবৃতির প্রায় ২ সপ্তাহ " আওয়ামী লীগ এর সভাপতি মন্ডলীর সভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার হাতে ন্যস্ত করার দাবী জানানো হয়েছে।[৭০]

৬৯. আবেক এম টি রেহমান, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ, *বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর*, সম্পাদনা আবেক সামছুর রেহমান, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ১৫১।

৭০. সংবাদ, ঢাকা, ৩১শে মার্চ, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

সভায় এক প্রস্তাবে এসম্পর্কে বলা হয় যে , প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় রাষ্ট্রপতি হাতে রেখে প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রপতি তত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞপন করেছেন। কারণ এটা সংসদীয় গনতন্ত্র ও সংবিধানের মৌল চেতনার পরিপন্থি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় রাষ্ট্রপতি হাতে থাকলে সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করা হবে। [৭১]

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ সংশোধনীতে সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের (সর্বাধি নায়কতা) সংশোধন করে বিধান করা হয়েছে : " সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের - নিয়ন্ত্রিত হইবে শব্দগুলির পরিবর্তে এবং যে মেয়াদে ৫৮ খ অনুচ্ছেদের অধীন নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে সে মেয়াদে উক্ত আইন রাষ্ট্রপতি কতৃর্ক নিয়ন্ত্রিত হইবে, শব্দ গুলি প্রতিস্থাপিত হইবে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে কার্যত তত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ কালে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় ও সসস্ত্রবাহিনী বিভাগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্পন্ন প্রধান উপদেষ্টার আনুষ্ঠানিক পরামর্শ ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ ছাড়াই রাষ্ট্রপতি এই নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। একই সাথে সংবিধানের ১৪১ক(১ ও ১৪১গ(১) অনুচ্ছেদের কার্যকারীতা রহিত করার (৫৮ঙ অনুচ্ছেদ) রহিত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে একক ভাবে জরুরী অবস্থা ঘোষনা ও সে সময় মৌলিক অধিকার সমূহ স্থগিত করণের অধিকার দেয়া হয়েছে। " **

প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় ও সসস্ত্রবাহিনী বিভাগের নির্বাহী ক্ষমতা বিষয়ক আ:লীগ ও তিন দলের দাবি সম্পর্কে বিএনপির মহাসচিব আবদুস সালাম তালুকদার বলেছেন " কোন দলীয় উদ্দেশে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় রাষ্ট্রপতির হাতে রাখা হয়নি রাষ্ট্রপতি এক জন নির্বাচিত ব্যক্তি শুধুই নন, তিনি সুপ্রিম কমান্ডার। কাজেই সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের মত একটি স্পর্শ কাতর মন্ত্রনালয় রাষ্ট্রপতির হাতে রাখা হয়েছে। এতে সেনাবাহিনীর সুনাম ক্ষুন্ন বা অবমাননা হয়নি।" [৭২]

৮১.সংবাদ ঢাকা ১৩ এপ্রিল ১৯৯৬।
** তারেক এম টি রহমান , প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা- ১৫১-১৫২ ।
৭২.সংবাদ ঢাকা ২১শে এপ্রিল ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যন্ত প্রতিরক্ষা বিষয়ক নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতেই ছিল । নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ..... এসব আইনগত প্রশ্ন সমাধানের বিষয়টি পরবর্তী জাতীয় সংসদের নিকট অর্পন করা সমীচিন হবে বলে বিরোধী নেত্রী অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। অথচ এই আওয়ামীলীগই জাতীয় সংসদের অপেক্ষা না করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনগত প্রশ্ন নিয়ে একটি স্পর্শ কাতর বিতর্কের সৃষ্টি করে। এটি স্পর্শ কাতর এই জন্য যে এই বিতর্কের সাথে দেশের সসস্ত্রবাহিনীর অবস্থানকে প্রশ্নের মুখোমুখি করা হয়েছিল ।

নিজস্ব মতামত : আমরা দেখি যে ৯১ এর সংসদীয় সরকার অকার্যকর হয়ে যায় বিরোধীদলের তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবী কে কেন্দ্র করে । বিএনপি সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি । তাই ধারণা করা হয় যে নির্বাচিত সরকারের অধীনে নয় বরং মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে । এই ধারণা থেকেই বিরোধী দলগুলি উক্ত দাবী তুলে । তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে তারা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নাকি সরকারকে অকার্যকর করে দেবার জন্য সাংবিধানিক ভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবী তুলে এবং এই দাবীকে বিরোধী আন্দোলনের প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে । এই প্রশ্নের প্রমান পাওয়া যায় দু'ভাবে ।

প্রথমত : বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে এক মাত্র নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ হবে। অথচ ১৯৯১ সালে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন এর নেতৃত্বে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় যাতে বিএনপি জয়লাভ করে সরকার গঠন করে । ঐ নির্বাচনে সূক্ষ্ম কায়চুপি হয়েছে বলে শেখ হাসিনা দাবী করেন । কিন্তু বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি যারা নির্বাচন পর্যবেক্ষনে এসেছিলেন তারা এবং দেশের বুদ্ধিজীবি ও পেশাজীবি, রাজনৈতিক সকলেই এই নির্বাচন কে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মডেল হিসাবে প্রশংসা করেন । আওয়ামীলীগও এই নির্বাচনের প্রশংসা করে এক মাত্র শেখ হাসিনা ব্যতীত । এই নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ বলায় দলের প্রধান নেতা ডঃ কামাল হোসেনকে পদত্যাগ করতে হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত :- সুষ্ঠ নির্বাচনের জন্য তাদের তত্বাবধায়ক সরকারের দাবী সঠিক থাকলেও এই দাবী আদায়ের প্রক্রিয়া সঠিক ছিল না । দেখা যায় যে তারা ত্রয়োদশ অধিবেশন থেকেই তথ্যমন্ত্রীর একটি উক্তিকে কেন্দ্র করে সংসদ বর্জন শুরু করে । কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল সংসদে আর ফিরে না যাওয়া । কিন্তু এজন্য কোন দৃঢ় ইস্যু খুজে পাচ্ছিল না । ১৯৯৪ এর ২০শে মার্চ অনুষ্ঠিত মাগুড়া উপনির্বাচন তাদের সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় । " বিএনপি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয় এই নির্বাচনে । অর্থাৎ স্বশস্ত্র মাস্তানদের দিয়ে ভোট নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় । সরকার যদি এই নির্বাচন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে দিত তাহলে বিরোধীদের তত্বাবধায়ক সরকারের দাবী এতো জোড়ালো হতো না । এই দাবীকে তারা প্রধান ইস্যু করে লাগাতার সংসদ বর্জন শুরু করে।" [৭৩]

তৃতীয়তঃ তত্বাবধায়ক সরকারের দাবী সাংবিধানিক ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য হরতাল, অবরোধ, ভাংচুর, অর্থাৎ রাজপথের মাধ্যমে ধ্বংসাত্মক পথ বেছে নেয় । কিন্তু তাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য যদি সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হতো তাহলে সংসদকেই বেছে নিত রাজপথকে নয় । তারা তত্বাবধায়ক সরকারের দাবী উত্থাপনের আগেই সংসদ ত্যাগ করে এবং এই দাবী উত্থাপনের জন্য আর সংসদে ফিরে যায় নি । তারা যদি সংসদে বসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিত এবং সরকারী দল যদি তাদের সেই সুযোগ করে দিত তাহলে পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোর নিতে পারতো।

তত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম যে রুপরেখা বিরোধীদল ও সরকারীদল উভয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় সেটি তত্বাবধায়ক সরকার ধারনার সাথে সঙ্গতি পূর্ণ ছিল না । "১৯৯৪ সালে ২৭শে জুন বিরোধীদল সম্মিলিত ভাবে যে রুপ রেখা ঘোষনা করে তাতে তত্বাবধায়ক সরকার গঠনে সরকারের ভূমিকা রাখা হয়নি । তাতে বলা হয় কেবল বিরোধীদলের মনোনীত প্রার্থীই সরকার গঠন করতে পারবে । অর্থাৎ রূপরেখাটি একতরফা ও অগনতান্ত্রিক ছিল । এই প্রস্তাবটি সংবিধানে সংযোজন করার জন্য তারা ২৮শে ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত আন্দোলন করে । ২৮শে ডিসেম্বর ৯৪ তারা সর্বশেষ যে প্রস্তাব দেয় সেটি তত্বাবধায়ক সরকার ধারনার সাথে সঙ্গতি পূর্ণ থাকলেও সেখানে সরকারের পদত্যাগের কথা উল্লেখ করা হয় । অর্থাৎ উভয় প্রস্তাবই সরকারের জন্য গ্রহন যোগ্য ছিল না । [৭৪]

৭৩. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, জানুয়ারী, ১৯৯৬ ।

৭৪.এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় প্রস্তাবে মেয়াদের পূর্বেই প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সংসদীয় ব্যবস্থায় অনাস্থা ভোটে পরাজিত ব্যতীত সরকারের পদত্যাগের কোন রীতি নাই। এতে প্রমানিত হয় যে বিরোধী দলগুলি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে আন্দোলন করলেও তাদের প্রস্তাব ত্রুটিপূর্ণ ছিল । অপর দিকে তাদের প্রস্তাবের বিপরীতে দেওয়া সরকারী দলের প্রস্তাবও ত্রুটিপূর্ন ছিল । সেখানে নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা থাকায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দলীয় করণ করা হয় । তারা উভয় দল থেকে সদস্য নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করার কথা বলে। অথচ নিয়মানুযায়ী ঐ সরকার গঠিত হবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সদস্যদের নিয়ে । অতএব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী আদায়ের প্রক্রিয়া, সরকারের রূপ রেখা ঘোষনা কোনটিই সঠিক ছিল না ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে উদ্ভুত রাজনৈতিক সংকট নিরসনে উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও সংলাপ অনুষ্ঠানের জন্য বাইরের রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয় যেটি ছিল বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য নেতিবাচক ঘটনা । কমনওয়েলথ সেক্রেটারী স্যার নিনিয়ান কে আসতে হয় উভয় পক্ষের মধ্যে সংলাপ অনুষ্ঠানের জন্য। তার মাধ্যমে সংকট নিরসন হলে ইতিবাচক কিছু আশা করা যেতো । কিন্তু তাও হয়নি। তিনি ৪০ দিন বাংলাদেশে অবস্থান করেন এবং ঐ সময় উভয় দলের মধ্যে ২০ এর অধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সকল বৈঠকই ব্যর্থ হয় । এতে সংকট আরও ঘনিভূত হয় ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সরকারী দলের মনোভাব অস্পষ্ট ছিল। তারা ঐ বিলটি পাশ করে ঠিকই অগ্রহনযোগ্য ষষ্ঠ সংসদে, সর্বজন গৃহীত পঞ্চম সংসদে নয় । ১৫ই ফেব্রুয়ারী একটি প্রহসন মূলক নির্বাচন করে তারা জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এটি তাদের পরবর্তী নির্বাচনে পরাজয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাড়ায় । প্রশ্ন থেকে যায় বিলটি তারা ৫ম সংসদে কেন উত্থাপন করলো না । তবে বিশেষজ্ঞদের মতে বিরোধী দলের পদত্যাগ পরবর্তী ৫ম সংসদের কার্যক্রম বৈধ ছিল না । এক্ষেত্রে বিরোধীদলের উচিত ছিল সংসদে ফিরে আসা এবং এই সংসদেই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল সাংবিধানিক ভাবে আইনে প্রতিষ্ঠা করা ।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সীমিত অর্থে অন্তবর্তীকালীন সরকার। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর মূল দায়িত্ব হলো একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং কিছু ক্ষেত্রে এই সরকারকে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহনে বাধা দেওয়া হয়েছে । এই সরকারের ধারণা বাংলাদেশেই প্রথম ছিলনা। সংসদীয় গনতন্ত্রের ভিত্তিভূমি ইংল্যান্ডে ১৯৪৫ সালের ২৩শে মে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নেতৃত্বে গঠিত হয় এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বৃহত্তর গনতান্ত্রিক দেশ ভারতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রয়োজন পড়ে ১৯৭৯ সালে আগষ্ট মাসে । আবার পাকিস্তানেও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ৩৭(৯) অনুচ্ছেদে পদত্যাগী মন্ত্রিসভাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে পরিনত করার বিধান ছিল । এরপর ১৯৭৩ সালে এই সরকারকে সংবিধানভূক্ত করা হয় । ১৯৮৮ সালে পাকিস্তানের ১ম বারের মত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় ।

এসব দেশের কোনটিতেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংজ্ঞা বা কালের পরিধি কতটুকু হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি । প্রশ্ন থেকে যায় যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারনার সাথে গনতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্পর্ক কতটুকু। ইংল্যান্ড ও ভারতে যে দুজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা পূর্বে জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন । পাকিস্তানেও একই ঘটনা ঘটে। দেখা যায় এসব দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছে দলীয় এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে [৭৫]

কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে কোন দলীয় বা রাজনৈতিক ব্যক্তি সরকার গঠন করতে পারবে না এবং এর সদস্যরা রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত নির্দলীয় সদস্য । এই ধারণা কোন ক্রমেই গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি পূর্ণ না । কারণ যেখানে নির্বাচিতদের উপর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না সেখানে মনোনীত ব্যক্তি সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করবে এই ধারনা ঠিক না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা হলেই যে নির্বাচন সুষ্ঠ ও অবাধ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই । এই সরকারের অধীনে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিছু নির্বাচনী বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল । নির্বাচনী কর্মকর্তা আচারণ বিধি জারী করে বিধি লংঘনকারীর বিরূদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আইন জারী করা হয়।

৭৫. ডাক্তর এম.টি রহমান, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ১৫৬, ডাক্তর শামসুর রেহমান সম্পাদিত বাংলাদেশ রাজনীতি ২৫ বছর, প্রথম খন্ড থেকে নেয়া, ১৯৯১)

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদকে নিরপেক্ষ রাখার জন্য অধ্যাদেশ জারী করে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারন করে দেওয়া হয় । কিন্তু আইনগুলি কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল । অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলেও কয়েক জায়গায় দুর্নীতি ও কালো টাকার ছড়াছড়ি হয়েছে । ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নির্বাচনী ব্যয় ধরা হলেও খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার নির্বাচনী ব্যয় কোটি টাকার উপরে ছাড়িয়ে যায় । ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা সন্ত্রাসী কার্য কলাপের জন্য কয়েক জায়গায় ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয় ।

অতএব এটি প্রমানিত যে তত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই নির্বাচন সুষ্ঠ হবে না । এ জন্য দরকার রাজনৈতিক দলগুলির জন্য গনতন্ত্রের চর্চা ও জাতীয় স্বার্থে কাজ করার মানসিকতা । তাছাড়া তত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা গনতান্ত্রিক সরকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় । কারণ এটি একটি মনোনীত সরকার । প্রশ্ন থেকে যায় যেখানে নির্বাচিত সরকারকে বিশ্বাস করতে পারছি না সেখানে মনোনীত সরকার সঠিক ভাবে নির্বাচন পরিচালনা করবে সেটা কিভাবে বিশ্বাস করা যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

সার্বিক মূল্যায়ন ঃ স্বৈরশাসক এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ৯০ এর গনঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন, বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের তিন জোটের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি, পরে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠান, সাধারণ নির্বাচন ও জাতীয় সংসদ গঠন এসব ঐতিহাসিক পটভূমির মাধ্যমে বাংলাদেশের ৫ম সংসদ বা দ্বিতীয় সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় বলে এই সরকারের প্রতি জনগনের প্রত্যাশা ছিল অনেক । দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় ১৯শে নভেম্বরের যৌথ ঘোষনা বা তিন জোটের রূপ রেখার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশী। সার্বভৌম সংসদ, সরকারী নিয়ন্ত্রন মুক্ত গনমাধ্যম, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জনগনের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল কালাকানুন বাতিল করা, নির্বাচিত সরকারকে মেয়াদের পূর্বে অপসারণ না করা, জনগনের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা প্রভৃতি ছিল এই রূপ রেখার পূর্ব শর্ত বা মৌলিক বৈশিষ্ট্য। ৫ম সংসদ এই লক্ষ্যে কতটুকু কাজ করতে পেরেছে সেটিই প্রধান বিবেচ্য বিষয় ।

প্রথম দিকে এই সংসদ ইতিবাচক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায় । রাষ্ট্রপতি সরকারের পক্ষে রায় দিয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করে । "সরকার ও বিরোধী দল সংসদীয় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত রচনায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে । বিশ বৎসর আগে এমনি আবেগ

ভরে জাতি সংসদীয় গনতন্ত্রের বন্ধুর পথ শুরু করেছিল গর্বিত পদভারে যাত্রা । তা কিন্তু লক্ষ্যের স্বর্ণতোরণ স্পর্শ করেনি। মাত্র ক'বৎসরে তার গতি হয় স্তব্ধ। অতীতের তিক্ত স্মৃতি নিয়েই তাই আমাদের পথ চলতে হবে । এ ব্যবস্থা সাফল্য মূলক নির্ভর করে সরকারীর সহনশীলতার উপর, নির্ভর করে বিরোধীদলের গনতান্ত্রিক চেতনার উপর " ।[১]

১. অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশে সংসদীয় গনতন্ত্র, প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা, ঢাকা করিম বুক কর্পোরেশন, ১৯৯২ ।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববর্তী চারটি সংসদের তুলনায় এই সংসদ ছিল সুদীর্ঘ এবং অধিক কার্যকরী । ৫ম সংসদ ২২ টি অধিবেশন সম্পন্ন করে প্রায় ৫ বৎসরের কাছাকাছি টিকে থাকে । পরিমানগত ভাবে সফল হলেও গুনগত ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পারেনি । বিরোধী দলে ২২ মাস অনুপস্থিতিতে এটি একটি একদলীয় সংসদে পরিনত হয় । " এই সংসদ প্রায় ৫ বৎসরের কাছাকাছি গেলেও কতটুকু বৈধ ছিল সেটাই বিবেচ্য বিষয় । কারণ সংবিধানের ৫৫ (৩) ধারা অনুযায়ী ৩শত নির্বাচিত সহ ৩০টি সংরক্ষিত আসন ও সম্মিলিত জবাবদিহিতার যে নিশ্চয়তা দেওয়া আছে বিরোধী দলের পদত্যাগে সেই ধারা আর বজায় থাকেনি ।[2] "৯০ থেকে ৯৬ পর্যন্ত পর্যায়টি গনতন্ত্রের দ্বিতীয় অভিযাত্রা হিসাবে চিহ্নিত । এ পর্যায়ের সূচনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঐতিহ্যে একটি অভিনব সংযোজন ছিল, যা ৯৬তে সংবিধানের তেরো নম্বর সংশোধনীর মাধ্যমে স্থায়ী রূপ পায়। অবশ্য ৯১ ও ৯৬ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যে কাঠামোগত পার্থক্য আছে। প্রথমটি যথার্থই একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার। দ্বিতীয়টি দলীয় সরকারের সম্প্রসারিত ভিন্নরূপ। এ পর্যায়ে ৯১তে সংবিধানের ১২নং সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন হলেও বিএনপি আমলটি ছিল গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূচনা মাত্র, গনতন্ত্রায়ন নয়। উপরন্তু, এ আমলে ছিল Prime Ministerial System, Parlimantery System নয় ।[3]

2. F Dhaka Courier, September 1995.
3. আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপট, প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা, [illegible] বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর গ্রন্থ থেকে নেওয়া, পৃষ্ঠা ১৪. ।

Dhaka University Institutional Repository

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও নির্বাচনের সময় সরকারী দল যে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেগুলি কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছিল তা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

(১) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিতকরণ, সর্ব প্রকার কালাকানুন বাতিল করাঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসন কে বিচার বিভাগ থেকে আলাদা করা হয়নি । এ ব্যাপারে সংসদে বিল আনা হলেও সরকারী দলের অনীহার কারণে সেটি বাতিল হয়ে যায় । বিশেষ ক্ষমতা আইন ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স সহ কোন কালাকানুনই বাতিল করা হয়নি । এসব অগনতান্ত্রিক আইনের মধ্যে মানুষ গনতন্ত্রের সুফল ভোগ করতে পারে না। সরকার এই সময় সংসদকে এড়িয়ে নতুন নতুন অধ্যাদেশ জারি করে । সন্ত্রাস দমন বিল ৯২ এর কথা উল্লেখ করা যায়।

(২) দূর্নীতি মুক্ত সৎ সরকার প্রতিষ্ঠা, শৃংখলা ভঙ্গকারী ও দূর্নীতিবাজ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহনঃ দূর্নীতি মুক্ত সরকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময় মন্ত্রী, এম.পি এমনকি খোদ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও দূর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায় । পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায় এরা দূর্নীতির মাধ্যমে শত কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। কৃষি সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন মন্ত্রী মাজেদ উল হক তার মন্ত্রনালয়ের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে তিনি পদত্যাগ করেন। "মেজর জেনারেল মাজেদ উল হক বিএনপির এক জন শীর্ষ স্থানীয় নেতা । ১৯৯৫ সালের গোড়ার দিকে সার কেলেংকারীর দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি কৃষি মন্ত্রীর পদত্যাগ করেন। কৃষি মন্ত্রীর পদ থেকে সরানো হলেও তিনি পানি সম্পদ দপ্তরের মন্ত্রি পদে বহাল থাকেন।"[৪] বিভিন্ন মন্ত্রনালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নির্বাচনী এলাকা থেকে এবং ব্যক্তিগত ভাবে মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ রয়েছে তা হলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের বিগত পাচ বছরের আর্থিক অনিয়ম, অর্থ ও গম আত্মসাত, বিপুল পরিমান টাকা চুরি করা হয়েছে। সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে তাদের এলাকায় দেওয়া এককালীন অর্থ ও গম আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে । তারা বিভিন্ন

৪. সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ৪ঠা জুলাই, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানের নামে সরকারী নিয়মনীতি ভঙ্গ করে অর্থ বরাদ্দ দিয়েছেন। যেসব প্রতিষ্ঠানের নামে নগদ অর্থ বরাদ্দ করা দেয়া হয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের হাতে আদৌ কোন টাকা পৌছায়নি । এভাবে সংসদ সদস্যরা দরিদ্র জনগনের কল্যাণে নিয়োজিত না থেকে বরং জনগনের বা রাষ্ট্রের অর্থ আত্মসাত করেছেন।

প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক কতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সরকার সম্পূর্ন ব্যর্থ হয়েছে । যার জন্য দেশে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের পরিবর্তে আমলা নির্ভর সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে । তবে সাংসদরা যদি দূর্নীতি পরায়ন হয় তাহলে আমলারাও দূর্নীতি গ্রস্থ হতে বাধ্য । খোদ প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও পোষ্টিং ও পদোন্নতিতেও দলীয় করণের অভিযোগ এনেছেন। দূর্নীতি বাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রমানিত হয়েছে যে সরকার নিজেই দূর্নীতি গ্রস্ত। দূর্নীতি দমন ব্যুরো অসৎ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের জন্য অনুমতি চায় তার বেশী ভাগই পাওয়া যায় না। এছাড়া এরশাদ সরকারের দূর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের দলে নেয়ায় প্রধানমন্ত্রীর আপোষহীন ভাবমুর্তিও ক্ষুন্ন হয়েছে।

(৩) বহুদলীয় গনতন্ত্র নিশ্চিত করণ, সব দলের ও মতের স্ব স্ব মতাদর্শ প্রচারের স্বাধীনতা নিশ্চিত করণঃ সাংবিধানিক ভাবে দেশে বহুদলীয় গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । তবে সংসদীয় কার্যকারীতার দিক থেকে এই বহুদলীয় গনতন্ত্র, একদলীয় গনতন্ত্রে পরিনত হয়। এ ব্যাপারে সরকারী ও বিরোধী দল উভয়ে উভয়কে দোষারোপ করেছে।

সংসদীয় সরকার যারা গঠন করবে সেই সব দলের অভ্যন্তরে গনতান্ত্রিক চর্চা হওয়া প্রয়োজন। অথচ বিএনপি এবং আঃ লীগ উভয়ের মধ্যেই গনতান্ত্রিক রীতি নীতির কোন চর্চা ছিল না । এখানে নেতা ও অনুসারীদের মধ্যে Vertical সম্পর্ক দেখা যায় । দায়িত্বশীল সরকারের জন্য প্রয়োজন সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সহযোগীতার পরিবেশ। অন্তত মৌলিক ইস্যু গুলির ব্যাপারে । ২য় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকারী দল বিএনপি ও বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এর মধ্যে অতীতের শত্রুতার কারনে মানসিক দূরত্ব ছিল অনেক । বঙ্গবন্ধু হত্যায় বিএনপির হাত আছে এই ধারনা থেকেই উভয়ের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই শত্রুতামূলক মনোভাব নিয়ে তারা ২য় সংসদীয় সরকার গঠন করে বলে সংসদের কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় । তারা সংসদকে দায়িত্বশীল করার জন্য বক্তৃতা বিবৃতি দিয়েছে অনেক কিন্তু কাজ করেছে তার উল্টো ।

Dhaka University Institutional Repository

হাসী শহরের ঘটনা সহ অন্যান্য ঘটনার জন্য প্রধানমন্ত্রী পরাজিত শক্তি অর্থাৎ আওয়ামী লীগ কে দায়ী করেছেন। অপরদিকে বিরোধী দলের নেত্রী সরকারের পতন ঘটনোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। উভয় ধরণের বক্তব্যই অগনতান্ত্রিক এবং অবাঞ্ছিত । সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দল পরাজিত শক্তি নয় বরং অপরিহার্য অংশ । অপরদিকে এই ব্যবস্থায় সরকারের পতন ঘটে না বরং পরিবর্তন হয় মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেও ।

৫ম সংসদের অধিবেশন গুলির দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে প্রথম অধিবেশন থেকেই বিরোধী দল ওয়াক আউট করে । এভাবে প্রথম তেরটি অধিবেশনে তারা সংসদে উপস্থিতি থাকলেও প্রতিদিনই ওয়াক আউট বয়কটের ঘটনা ঘটে। ত্রয়োদশ অধিবেশন থেকে তারা তথ্যমন্ত্রীর একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সংসদ বর্জন করে । এরপর আর সংসদে ফিরে আসেনি। " সরকার পদত্যাগ করলে নতুন করে নির্বাচন হয় । তৃতীয় বিশ্বের সংসদীয় গনতন্ত্রে কখনও সরকার স্বেচ্ছাচার হয়ে উঠলে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যায়। কিন্তু একযোগে পদত্যাগ করার দৃষ্টান্ত নেই । লাগাতার সংসদ বয়কট ও তারপরে একযোগে পদত্যাগ সংসদ বা গনতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করেনি। আমার মতে, এই ব্যাপারে আওয়ামী লীগ একটা বিরাট ভুল করেছে । লাগাতার সংসদ বয়কট ও পদত্যাগের ব্যাপারে তাদের সদস্যদের কাছ থেকে গোপন ব্যালটের মতামত চাইতে পারতো । রাজনীতিকে রাজপথে নিয়ে যাওয়া কঠিন কাজ নয় । কিন্তু কখন কতটা নেওয়া হবে তা বিবেচনার বিষয় । তবে রাজপথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মানুষের কাছ থেকে হাত তুলে সমর্থন চাওয়া গনতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে খাপ খায় না । এ জাতের পপোলিস্ট রাজনীতি ডিক্টেটরশীপের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ।"[৩]

(৪) সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ এবং গনপ্রচার মাধ্যম সমূহ কে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্য স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় পরিনত করার পদক্ষেপ যদিও প্রচার মাধ্যমের স্বায়ত্বশাসন প্রদান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার স্বৈরাচারী সরকারের মতই আচরণ করে । রেডিও ও টিভিতে কেবল সরকারী দলের খবর ফলাও ভাবে প্রচার করা হতো। এই সময় সংবাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও নিউজ প্রিন্ট কোটা ও বিজ্ঞাপন বন্টনে বৈষম্য মূলক নীতির কারণে সংবাদ পত্র গুলোর পক্ষে সব সময় স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি ।

৩. সৈয়দ আলী আকবর, সংসদীয় গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, পৃষ্ঠা- ৯৮-৯৯ । মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত গনতন্ত্র গ্রন্থ থেকে নেওয়া ।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) মুক্ত ও প্রতিযোগীতামূলক অর্থনীতি চালু এবং দেশী ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়নঃ বিএনপি সরকারের আমলে মুক্ত ও প্রতিযোগীতা মূলক অর্থনীতি চালু হয়েছে। তবে বিদেশী পন্যের সাথে প্রতিযোগীতায় দেশীয় পন্য টিকতে পারছে না। ফলে ৫ হাজার শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যায় । বিদেশী দাতা সংস্থার পরামর্শে মুক্ত অর্থনীতি চালুর ফলে দেশীয় শিল্প মার খেয়েছে। এভাবে দেখা যায় যে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদার নীতি গ্রহন এবং উদ্যোক্তাদের সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া সত্বেও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সাফল্য আসেনি বরং বিপুল সংখ্যক পুরানো শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে।

(৬) বাংলাদেশ কে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া, কৃষক কে সহজ শর্তে ঋণ দানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং গরীব চাষীদের ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুদ মওকুফ করাঃ সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ সুদ সহ মওকুফ করলেও সমবায়ী কৃষকদের কৃষিঋণ মওকুফ করেনি। কৃষিতে ভর্তূকী তুলে দেওয়ার ফলে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ দিন দিন কমেছে। খালখনন কর্মসূচী সীমিত আকারে চালু হলেও এসব কর্ম সূচীতে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময়ের মত সাধারণ জনগনকে সম্পৃক্ত করা যায়নি। সরকার নিজেই এ ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছে । সরকারী হিসাবে অগ্রগতি ছিল মাত্র ৩৪ ভাগ।

(৭) নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ ও সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, আধিপত্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় নীতি অবলম্বনঃ বিএনপির সরকারের আমলে দেশ জাতি আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে পারেনি। সংসদ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার সরকারের বৈদেশিক নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনটি মূল নীতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। (১) স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সু সংহত করা (২) শান্তি প্রগতি ও সমৃদ্ধ অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রাদায় বিশেষ করে মুসলিম উম্মার সাথে সহযোগীতা বৃদ্ধি।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগীতা জোরদার করা।[৬] এর আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেছিলেন তারা জিয়াউর রহমান অনুসৃত বৈদেশীক নীতি অনুসরণ করবে, এবং তারা তাই করেছিল। তারা একই ভাবে চীন, যুক্ত রাষ্ট্র ও মুসলিম বিশ্ব কেন্দ্রিক একটি বৈদেশিক নীতি রচনা করেছিল। কিন্তু এতে জাতীয় স্বার্থ কতটুকু অর্জিত হয়েছিল সেটিই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এই সময় চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার হয়। যুক্তরাষ্ট্র খালেদা জিয়ার আমলে সবচেয়ে বেশী আর্থিক সাহায্য দেয়। এটি একটি সফলতা বলা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ফার্ষ্ট লেডী হিলারী ক্লিনটন এই সময় বাংলাদেশে আসেন ব্যাংক পরিদর্শনে ও ব্যক্তিগত কাজে। অন্যদিকে ১৯৯৪ সালে ফেব্রুয়ারীতে চীনা উপপ্রধানমন্ত্রী জিয়ান চিয়েন বাংলাদেশ সফর করেন। তার এই সফর গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই কারণে যে তিনি ঢাকায় মন্তব্য করেন যে ফারাক্কা সমস্যা দ্বি-পাক্ষিক ভাবে সমাধান করা সম্ভব।[৭]

বিএনপি সরকার নিজেকে ভারত বিরোধী ও আওয়ামী লীগকে ভারত পন্থী বললেও ১৯৯১-৯৫ সময়ে চোরাই পথে বহু ভারতীয় মাল বাংলাদেশে আসে এবং বাংলাদেশ ভারতের বৃহত্তর বাজারে পরিনত হয়। এরসাথে খোদ মন্ত্রী, এম.পিরাও জড়িত ছিলেন। সরকার এই চোরাচালান রোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এবং এটি বিএনপি সরকারের একটি ব্যর্থতা বলা যায়।

৬. বিচিত্রা, ১লা জানুয়ারী, ১৯৯২।
৭. দৈনিক বাংলা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে সরকার ভারতের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রধান ইস্যু গঙ্গার পানি বন্টনের ক্ষেত্রে কোন মেয়াদী পদক্ষেপ নিতে পারেনি। "বঙ্গবন্ধু বা আওয়ামী লীগের শাসনামলে (১৯৭২-৭৫) বাংলাদেশ গঙ্গার পানির সর্বোচ্চ হিস্যা লাভ করে । অপরদিকে এ সময়ে ভারত বাংলাদেশ বানিজ্য বৈষম্যের অনুপাত যেখানে ছিল মাত্র ৬ : ১, সেখানে খালেদা জিয়ার সময় তা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ২৪ : ১ । সরকারী ব্যবস্থার বাইরেও বিভিন্ন অবৈধ পন্থায় ভারতীয় পণ্য প্রবেশ করে বাংলাদেশের বাজার সয়লাব হয়ে গেছে । সরকারী হিসাবেই বাংলাদেশ ভারতীয় একাদশ বৃহত্তর বাজার । গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে যারা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ তারাই আবার জাতীয়তাবাদী শক্তির এক নম্বর দাবীদার।"[৮]

১৯৯১-৯৫ সময়ে সার্ক ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ কমানো না গেলেও বেগম জিয়া সার্ক এর নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ১৯৯৩ এ বাংলাদেশে সাপটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি খালেদা জিয়া সরকারের আরও একটি সাফল্য ছিল ।

বাংলাদেশের ১ম সংসদ (১৯৭২-৭৫) ৫ম সংসদ (১৯৯১-৯৫) উভয়ই গনতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত হয়ে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করলেও পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায় মূলত দু'টি কারণেঃ (১) রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্য (২) যুগের পরিবর্তন বা সময়ের পরিবর্তনের কারণে। "One of the charactaristics features of a country's foreign policy is the elements of continuity and change over time..... But even in the case of change of government in a democratic way, if the party which comes to power represent a different one from that which it happens to replace, their may be discernible change in the foreign policy of that country."[৯]

৮. সংবাদ, ১০ মে, ৯৬।

৯. Md. Abdul Hakim, IBID Page-116.

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি সরকার পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্য দেখাতে না পারলেও ১ম সংসদীয় সরকারের তুলনায় এ ক্ষেত্রে তারা সফল হয়েছিল । কারণ শেখ মুজিব জোট নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের উপর বেশী মাত্রায় নির্ভরশীল ছিলেন । সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে নিজের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। তার এই সমাজতন্ত্র সংসদীয় গনতন্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলনা । তা ছাড়া এই সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলি ন্যাপ, জাসদ, সিপিবি বাংলাদেশের স্বাধীনতা কে অসমাপ্ত বলে উল্লেখ করে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় । এরা ছিল মস্কোপন্থী । শেখ মুজিব তাদের চাপে পড়ে এক দলীয় বাকশাল গঠন করে সংসদীয় সরকারের পতন ঘটায়। অর্থাৎ তার বৈদেশিক নীতি সংসদীয় সরকারের বিকাশে সহায়ক ছিলনা। এদিক তার সরকার ব্যর্থ হয়েছেন।

অন্যদিকে ৭৫ পরবর্তী যে ধারা পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় সে ধারাই ৯৫এর সংসদীয় সরকার অনুসরণ করে । এই ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও মুসলিম বিশ্ব ঘেষা । খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে এদের দ্বারা তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য না আসলেও জাতীয় স্বার্থক্ষুন্ন হয়নি বরং সহায়ক হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৮) মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদ পরিবারের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিঃ স্বাধীনতার পর আওয়ামীলীগ সরকার মুক্তিযোদ্ধদের পুণর্বাসন এর জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট গঠন করে । ১৯৯১-৯৫ সময় পর্যন্ত বিএনপি সরকার এই কল্যাণ ট্রাষ্টে শত কোটি টাকা লোকসান দেওয়ার যুক্তি দেখিয়ে ৩৩টি শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে ২৫ টি বিভিন্ন ব্যক্তি বর্গের কাছে লিজ দেয় । বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই নামে মাত্র টাকার বিনিময়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের উর্ধতন মহল এবং ট্রাষ্টের পরিচালনা বোর্ডের শীর্ষপদে দায়িত্ব প্রাপ্ত সাংসদদের আত্মীয় স্বজন ও পরিচিতদের কাছে লিজ দেওয়া হয় । এছাড়া কল্যাণ ট্রাষ্টের প্রায় ৪০০ কর্মচারীকে চাকরীচ্যুত করা হয় যাদের অধিকাংশই শহীদ পরিবারের সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা। প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমল থেকেই এটি লুটপাটের সম্পত্তিতে পরিনত হয় । ক্ষমতায় থাকাকালে তিনি এতে এমন সব লোকদের নিয়োগ করেন যারা মুক্তিযোদ্ধাদের স্বার্থ

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী কাজে লিপ্ত ছিল। এর ফলে ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে ট্রাষ্টের অসংখ্য শহীদ পরিবারের ভাতা বন্ধ হয়ে যায় । এরশাদ সরকারের আমলে ট্রাষ্টের রাজধানী ঢাকার প্রানকেন্দ্রে টিকাটুলিতে সবচেয়ে বিশাল সম্পত্তি হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরীর জায়গাতে "মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্তম্ভ" নির্মানের সিদ্ধান্ত নেয়। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর এ সিদ্ধান্ত বাতিল করে একটি সুপার মার্কেট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। বর্তমানে সেখানে নির্মাণ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এই একটি কর্মের মধ্য দিয়ে প্রমানিত হয় যে, বিএনপি সরকার মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট কে কোন চোখে দেখে।[১০]

(৯) শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন ও উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সুষ্ঠ শ্রমিক মালিক সম্পর্ক স্থাপন : ৯১-৯৫ সময়ে শ্রমিকদের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। প্রতিটি বাজেটেই শিক্ষা ও সামরিক এই দুটি অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করাতে বাড়তি কর এর বোঝা শ্রমজীবি জনগনের উপর পড়ে। উল্টো প্রবৃদ্ধির হার অতিনিম্ন এবং জাতীয় সঞ্চয় শতকরা ১ ভাগ হওয়ায় এই দায় দায়িত্ব শ্রমজীবিদের উপর চাপানো হয় । উপরন্ত সরকার বিশ্ব ব্যাংকের চাপে পড়ে শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস এবং শ্রমিক ছাটাই করে। বাৎসরিক উন্নয়ন বাজেটের নামে (ভ্যাট) জিনিস পত্রের উপর নতুন কর ধার্য করে এবং পুরাতন কর বহাল রেখে সরকার যে ভাবে নিজের ব্যয় বৃদ্ধি করে তা শ্রমজীবি জনগন ও অল্প আয়ের মানুষকেই বহন করতে হয় । স্কপের ৫ দফা বাস্তবায়নের যে চুক্তি সরকার একাধিক বার করেছিল সেই চুক্তিও বাস্তবায়ন হয়নি। বিরোধী দলগুলিও জনগনের মৌলিক এই দাবী গুলি নিয়েও আন্দোলনে যায়নি ।

১০. বাংলার বানী, ১০ই মে, ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) অনগ্রসর উত্তরাঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহন : খালেদা জিয়া সরকারের আমলে পার্বত্য জেলা সমস্যার অর্থাৎ উপজাতিদের দাবী দাওয়ার ব্যাপারে কোন স্থায়ী সমাধানে আসতে পারেনি । বরং এই সময় তারা পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে সমস্যা আরও বৃদ্ধি পায় । যেমন তারা ক্ষমতায় এসেই স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ এর মেয়াদ বৃদ্ধি করে। এই পরিষদের মেয়াদ ছিল প্রথম অধিবেশনের তারিখ হতে ৩ বৎসর। এর মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে পার্বত্য জেলা ৩টির (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দর বন) প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মকান্ড নির্বাহ করা অব্যাহত থাকে। তারা এরশাদ আমল থেকেই এই পরিষদের বিরোধীতা করে আসছিল কারণ এখানে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রনেই ছিল। অপরদিকে এই সরকারের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল কর্নেল অলি কমিটি ও সাব কমিটি (মেননের নেতৃত্বে) গঠন। এই দুই কমিটির দায়িত্ব ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার একটি সমাধান দেওয়া। এজন্য উভয়ের মধ্যে মোট ১৩ বার বৈঠক হয় । দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হলেও কোন মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

পার্বত্য বাসীদের সমস্যা, স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই শুরু হয় । এবং স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ এর নেতৃত্বের সংসদীয় সরকারের আমলে পার্বত্য সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে শেখ মুজিব কতৃক বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা এবং তাদের কে এই জাতীয়তার সাথে মিশে যেতে বলার জন্য । তারা তখন থেকেই মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে শান্তি বাহিনী গঠন করে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে । সেই থেকে ৯০এর আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বৎসর সেখানে রক্ত হানাহানি যুদ্ধ হয় । এরপর ৯১ তে ২য় সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পর আশা করা হয়েছিল যে এর একটি স্থায়ী সমাধান হবে । এই সময় কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা না হলেও হত্যাকান্ডে প্রায় ৩০০ পাহাড়ী নিহত হয় । এটি একটি দুঃখ জনক ঘটনা ছিল । এই পার্বত্য অঞ্চলের পিছনে ব্যয় হয়েছে কোটি কোটি টাকা । গত ১৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ ইং তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাংসদ মেহের আফরোজের এক প্রশ্নের উত্তরে জানান ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ২১ বৎসরে রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য এলাকায় শান্তি চুক্তির পূর্ব পর্যন্ত প্রতিরক্ষা খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ১০৫ কোটি ৯৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা।[১১]

১১. The Independent, Dhaka, 8th February, 1998.

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক বাহিনীর ছত্রছায়ায় গুটি কয়েক সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টি হলেও তারা পার্বত্য বাসীকে প্রতিনিধিত্ব তথা তাদের আশা আকাংখার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। জন বিচ্ছিন্ন তথাকথিত নেতৃত্ব সমস্যাকে জটিল ও দীর্ঘস্থায়ীত্ব করার মাধ্যমে হাজারো সমস্যার সৃষ্টি করে। জিয়াউর রহমান থেকে এরশাদ পর্যন্ত সময়ে সেনাবাহিনী দায়বদ্ধহীন সার্বভৌম শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। সাত্তার থেকে খালেদা জিয়া পর্যন্ত গনতান্ত্রায়ন প্রক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর কেন্দ্রিক শক্তিশালী অবস্থান বিশ্লেষন যোগ্য। [১২] ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দায়বদ্ধ সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু পার্বত্য বাসীদের প্রতি তাদের মনোভাব পর্বের স্বৈরাচারী সরকারের মতই ছিল ।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে প্রতিষ্ঠানগত ও কার্যকাঠামোগত দিক থেকে ৫ম সংসদ ব্যর্থ হয়। কেন না বিচার ব্যবস্থা, প্রতিযোগীতামূলক দলীয় ব্যবস্থা, নিরপেক্ষ আমলাতন্ত্র, প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা যা গনতন্ত্রের পূর্বশর্ত তা এখানে পরিলক্ষিত হয়নি। এই সরকারের আমলে দুটি উপনির্বাচনে পরিলক্ষিত হয়েছে দূর্নীতি, কালো টাকার ছড়াছড়ি, অস্ত্রবলে ভোট কেন্দ্র দখল ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই এর ঘটনা, আর এই ঘটনাই জন্ম দিয়েছে বিরোধী দলের তত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন। অর্থাৎ নির্বাচিত সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠ হবে না । তাই নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকার সাংবিধানিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে । এই দাবীর প্রতি সরকারী দল প্রথমে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে । অন্যদিকে বিরোধী দলের এই দাবী সঠিক হলেও, দাবী আদায়ের প্রক্রিয়া সঠিক ছিলনা। সংসদ থেকে নয়, রাজপথ থেকে তারা এই দাবী তোলে। তথ্যমন্ত্রীর একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সংসদ বর্জন করলেও এই দাবী আদায়ের জন্য আর সংসদে ফিরে আসেনি । তত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সরকারী দলের ভূমিকা ছিল অসম্পষ্ট।

১২. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের প্রবন্ধ "খালেদা জিয়ার জেহাদ" দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

তারা এই দাবীকে সাংবিধানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল ঠিকই কিন্তু একটি অগ্রহনযোগ্য ষষ্ঠ সংসদের মাধ্যমে। " বিরোধী দল গুলি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচনের দাবীতে দীর্ঘ দিন সংসদ বর্জন করে এবং এক পর্যায়ে বিরোধী সাংসদগন পদত্যাগ করেন । ফলে সংসদ এক দলীয় সংস্থায় পরিনত হয় । সংসদে থেকেও বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারতো । তেমনি ক্ষমতাসীন বিএনপির পক্ষে বিরোধী দল সমূহের দাবী উপেক্ষা করে প্রায় দুবছর (১৯৯৪-১৯৯৬) একদলীয় সংসদ চালানো গনতন্ত্র সম্মত ছিল না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে দাবী ১৯৯৬ সালে মেনে নেওয়া হলো তা ১৯৯৪ সালে মেনে নেওয়া হলে সংসদীয় গনতন্ত্রের পথ আরও সমৃদ্ধ হত।" [১৩]

বিএনপির অধিকাংশ সদস্য ছিল অনভিজ্ঞ যাদের সংসদীয় সরকার পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না । জেলা ও থানা পর্যায়ে তাদের নেতৃত্বের সংকট ছিল। অপরদিকে বেগম জিয়ার মধ্যে সংসদীয় নেত্রী বা সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতার যে সহনশীল মনোভাব ও বিচক্ষণতা থাকা দরকার সেটি ছিল না । তার মধ্যে এক ধরণের দাম্ভিকতা ছিল " ৯১এর ৫ই ডিসেম্বর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় । স্পীকারের অবস্থান প্রধানমন্ত্রীর নীচে। বর্তমান ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্স এ সাংসদদের স্থান চৌদ্দতম । তিন বাহিনীর প্রধান, ক্যাবিনেট সচিব ও মূখ্য সচিবের নীচে সাংসদদের স্থান। এই পরিস্থিতি সংসদীয় গনতন্ত্র পরিপন্থী " ।[১৪] ক্ষমতায় আসার আগে বেগম জিয়া অনেক স্বাভাবিক ছিলেন। গনঅভ্যূত্থানে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে গ্রামে গঞ্জে মাঠে ময়দানে পায়ে হেটে বেড়িয়েছেন। এভাবে তিনি সাধারণ মানুষের কাছাকাছি ছিলেন । কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হবার পর তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকা পালন করেন। রাজতন্ত্রের মতই রানীর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। অথচ উন্নয় গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, রাষ্ট্র প্রধানের সাথে সাধারণ মানুষের ও গন মাধ্যমের সম্পর্ক নিবিড়।

১৩. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের সংসদীয় গনতন্ত্রের কিছু সমস্যা ও সম্ভাবনা, পৃষ্ঠা ৩৪, মানজুর রেহমান সম্পাদিত বাংলাদেশে রাজনীতির ২৫ বছর গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

১৪. ভোরের কাগজ, ২৮ শে জানুয়ারী, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় সরকারকে কার্যকরী করার জন্য সরকারী দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ৫ম সংসদকে কার্যকরী করার জন্য প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এর হাতে সুযোগ ছিল অনেক । কারণ এদেশে তারাই সংসদীয় সরকারের জন্য আন্দোলন করে এবং ১৯৯৩ সালে প্রথম সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে, যদিও সঠিক ভাবে কাজ করতে পারেনি। নির্বাচনের পর থেকেই সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে পরস্পরকে গ্রহণ যোগ্যতায় না আনার মানসিকতা দেখা যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠ হয়েছে বলে দেশের ভিতরে ও বাইরে প্রশংসা অর্জন করে । কিন্তু আওয়ামী লীগ নেত্রী সূক্ষ কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করে। ১৮ই সেপ্টেম্বর গনভোটের রায়ে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯শে সেপ্টেম্বর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৪০সদস্য বিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিসভার শপথবাক্য পাঠ করান। উল্লেখ্য উক্ত শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানে দেশের এবং সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। ওয়ার্কাস পার্টির রাশেদ খান মেনন, জামাতে ইসলামীর আবদুস সোবহান ও আনসার আলী ব্যতীত, এরশাদের জাতীয় পার্টি, মুসলীম লীগ এবং গনতন্ত্রী পার্টির কোন এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। উল্লেখ্য বিরোধী দল যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাষন মেনে নিতে না পারে তাহলে সংসদীয় ব্যবস্থা কোন ভাবেই কার্যকর করা যাবেনা। তারা মন্ত্রিপরিষদ গঠনে উপস্থিত না থাকলেও সংসদের প্রথম অধিবেশন গুলিতে আশানুরুপ না হলেও কিছুটা গঠন মূলক ভূমিকা পালন করে।

সংসদে নিয়মিত অংশ গ্রহন , কমিটি গঠনে সহযোগীতা, অন্তবর্তী সময় অর্থনৈতিক নীতিশিক্ষা, সমাজ কল্যাণ, মুদ্রা পরিস্থিতি, পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা ও সেমিনারের মাধ্যমে সংসদকে অচল রাখে। কিন্তু মাঝ পথে এসে এধারা অক্ষুণ থাকেনি। ত্রয়োদশ অধিবেশন থেকে অবৈধ ভাবে সংসদ বর্জন শুরু করে, তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে । এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে লাগাতার সংসদ বর্জন করে। তারা এই দাবী সংসদে বসেই করতে পারতো। জনগন তাদের ভোট দিয়েছে সংসদে বসে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য, রাজপথ থেকে নয়। তাদের দায়িত্ব সরকারকে অকার্যকর করে দেওয়া নয় বরং গঠন মূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রন করা। "In normal times it is not the business of opposition to abstract government, its purpose is to criticise not to hinder." [১৫]

১৫. Ivor Jennings, The British Constitution, Page-90,London, UPL,1968

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে আওয়ামী লীগ যোগদেয় ৭২ এর পরাজিত শক্তি জামাত শিবির এবং ৯০ এর পরাজিত শক্তি জাতীয় পার্টির সাথে। এজন্য তারা বুদ্ধিজীবি এমনকি দলীয় সমর্থকদের কাছেও সমালোচনার সম্মুখীন হয়। অথচ এর আগে জামাত বিএনপিকে সরকার গঠনে সহায়তা করায় তারা জামাতের বিরুদ্ধে যায় । তিন জোটের কাছে দেওয়া তাদের একটি অন্যতম ওয়াদা ছিল নির্বাচন ব্যতিত অসাংবিধানিক পন্থায় নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না। সেদিন জামাত ও জাতীয় পার্টি এই জোটে ছিল না। " সম্প্রতি আঃ লীগের শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতা বলেছেন, শেখ হাসিনা চাইলে এই সরকাররর পক্ষে ১৫ দিনও ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভবনয় "।[১৬] সংসদীয় গনতন্ত্রে যেমন দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা যায়না তেমনি নির্বাচিত সরকারকে জোর করে ক্ষমতা থেকে সড়ানো যায় না। পাশাপাশি অন্য এক আওয়ামী লীগ নেতার বক্তব্য হলো, আমি কখনও মনে করি না যে বিএনপির সব কিছুই ভুল । আবার একথাও সত্য নয় যে সকল বিরোধীদল সবসময়ই নির্ভুল । এমন বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য গনতন্ত্রের জন্য সহায়ক। পঞ্চম সংসদ এর পূর্বে এখানে চারটি সংসদ গঠিত হয়েছিল। প্রথমটি ছিল সংসদীয় সরকার । দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থটি ছিল রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার । প্রথম সংসদ ৭ই এপ্রিল ১৯৭৩ থেকে ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত কার্যকরী থাকে । এর স্থায়ীত্ব ছিল ২ বছর ৭ মাস। ৮ টি অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল ১৩৪দিন। ২য় সংসদ গঠিত হয় ২রা এপ্রিল ১৯৭৯ এবং বিলুপ্ত হয় ২৪ শে মার্চ ১৯৮২ সালে । স্থায়ী কাল ছিল ৩ বৎসর । ৮টি অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল ২০৬ দিন। ৩য় সংসদ ১০ই জুলাই ১৯৮৬ সালে গঠিত হয় এবং সমাপ্তি হয় ৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৭ সালে। স্থায়ী কাল ছিল ১০ বৎসর ৫ মাস। ৪টি অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল ৭৫টি। ৪র্থ সংসদ ২৩শে এপ্রিল ১৯৮৮ তারিখে গঠিত হয় এবং বিলুপ্তি হয় ৩ই ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে। ৭টি অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল ১৬২ দিন। আর ৫ম সংসদ ৫ই জুলাই ১৯৯১ তারিখে গঠিত হয় এবং সমাপ্তি হয় ২৪শে নভেম্বর ১৯৯৫ তারিখে। ২২টি অধিবেশনে কার্যকাল ছিল ৩৯৬ দিন।[১৭]

১৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৯১ ।

১৭. জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারী শব্দকোষ, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৮০-৮৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ৫ম সংসদই ছিল একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী । মেয়াদ, অধিবেশন,কার্যদিবস, এসব দিক দিয়ে পূর্বের সকল সংসদের তুলনায় ৫ম সংসদকে একটি সফল সংসদ বলা যায়। এই সংসদে ১২ দশ সংশোধনীর মাধ্যমে গনতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত রচনা করা হয় । "বিএনপি বিগত ৫ বৎসরে ২২টি অধিবেশনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যায়ে জাতীয় সংসদকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করে এবং সংসদকে সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে ঘোষনা করে। কিন্তু তারা এ কাজে বিরোধী দলের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয় । বিরোধী দলের সম্মিলিত পদত্যাগের ফলে সুপ্রিম কোর্টের শরনাপন্ন হওয়া, বিধি মোতাবেক উপনির্বাচন ঘোষনা সংবিধানে নাই বলে বিরোধী দলের তত্বাবধায়ক সরকার দাবীর বিরোধীতা প্রভৃতি চেষ্টার পর, সংবিধান মোতাবেক সংসদ বিলুপ্তির ঘোষনা ইত্যাদি ছিল ক্ষমতাসীন বিএনপির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার প্রয়াস।" [১৮]

অপরদিকে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার দিক দিয়েও বাংলাদেশের ২য় সংসদীয় সরকার ১মটির তুলনায় অধিক দায়িত্বশীল ও কার্যকরী ছিল । সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্বশীলতা প্রধানত নির্ভর করে শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতি এবং তাদের কার্যকর ও গঠন মূলক ভূমিকার উপর। আমরা দেখেছি যে ৭৩-৭৫ সময়ে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অস্থিত্ব ছিলনা। সংসদে মহিলা সহ ৩১৫টি আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের আসন ছিল ৩০৯ টি। বিরোধী দলের মাত্র ৭টি আসন ছিল । এজন্য বিশেষজ্ঞরা এই সংসদকে 'এক দলের প্রাধান্য বিশিষ্ট দলীয় ব্যবস্থা' বলে উল্লেখ করেছেন। "Bangladesh started with a single party dominant system and the rulling party maintained its dominance in the first three years. The Awami League's supremacy dates back to 1970 elections which gave the party an overwhelming victory".[১৯] এই একক দলীয় আধিপত্য মূলক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছিল সংসদে দলীয় শৃংখলা সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধান। এই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য সরকারী দল স্বাভাবিক ভাবেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠে। এতে আওয়ামী লীগ এর প্রতিষ্ঠানিক ভিত দূর্বল হয়ে পড়ে এবং শেখ মুজিব তাঁর ক্যারিজমা দিয়েই রাষ্ট্র পরিচালনার চেষ্টা করেন। তিনি তার ব্যক্তিগত ক্ষমতার জোরে সংবিধানের ব্যাপক কাট ছাট করেন এবং ১৯৭৫ সালে সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন। এর পিছনে প্রধান কারণ ছিল নিজ দলের ভিতর কোন্দল ও অর্থনৈতিক সংকট

১৮. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৯৯৫।

১৯. Rounaq Jahan, Bangladesh Politics Problems and Issues, 1980, Page-105

Dhaka University Institutional Repository

"The regime performance in the econmic sector had been far from satisfactory and chronic economic problems compounded the country's political problems"[২০]

অপরদিকে ২য় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় ছিল একটি শক্তিশালী বিরোধী দল। ১৯৭৩ সালের সরকারী দল আওয়ামী লীগ ১৯৯১ সালের সংসদে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়। শাসক দল বিএনপি সামরিক শাষনের মাধ্যমে সৃষ্টি হলেও সংসদীয় সরকারের বিকাশ বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সারাজীবন সংসদীয় সরকারের জন্য আন্দোলন করেও, ১৯৭৫ সালে তারাই সংসদীয় সরকারের পতন ঘটায়। এদিক দিয়ে বিএনপি অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। তবে সংসদীয় সরকার পরিচালনার যে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার সেটি ছিলনা। ৭৩-৭৫ সময়েও সাংসদের উপর আর্থ সামাজিক জরিপ থেকে দেখা যায়,সাংসদের ৩৩%এর কোন পূর্ব সংসদীয় অভিজ্ঞতা ছিল না । মাত্র ১০% সদস্যের দুটো সংসদের এবং ৫৭% সদস্যদের কেবল গনপরিষদের সদস্যপদের অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু যেহেতু সেই গনপরিষদের আয়ুস্কাল ছিল মাত্র কয়েকমাস, কাজেই সেই গনপরিষদও উক্ত সদস্যদের অভিজ্ঞতা অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারেনি। বিএনপির সংসদীয় অভিজ্ঞতা না থাকলেও সংসদকে প্রায় ৫ বৎসরের কাছাকাছি পর্যন্ত টিকিয়ে রাখে। ১ম সংসদীয় সরকারের তুলনায় ২য় সংসদীয় সরকার দীর্ঘস্থায়ী হলেও এবং শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলেও দায়িত্বশীল সরকাররে ভূমিকা আশানুরুপ ভাবে পালন করতে পারেনি। এজন্য সরকারী ও বিরোধী দল উভয়ই দায়ী। উভয়ের মধ্যেই দেখা গেছে উভয়কে সহ্য না করার মানসিকতা। অথচ সংসদীয় সরকার সফলতার পূর্বশর্তই হলো সহনশীলতা। ১৩তম অধিবেশন থেকে বিরোধী দল সম্মিলিত ভাবে সংসদ থেকে পদত্যাগ করায় বিশেষজ্ঞদের মতে, সংসদ তার বৈধতা হারায়। তবে বিরোধীদের এভাবে একযোগে পদত্যাগ সংসদীয় রীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। কারণ তারা কোন মৌলিক ইস্যুতে পদত্যাগ করেনি ।

২০. Rounaq Jahan, IBID P-103

Dhaka University Institutional Repository

এরপর মাগুরা উপনির্বাচনে ভোট ডাকাতির অভিযোগে তারা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে লাগাতার সংসদ বর্জন শুরু করে। নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী সঠিক হলেও, দাবী আদায়ের প্রক্রিয়া সঠিক ছিল না । তাদের উচিত ছিল সংসদের ভিতরে বসে এই আন্দোলন করা, রাজপথ থেকে নয়। অপরদিকে সরকারীদল মিরপুর ও মাগুরা উপনির্বাচনে মিডিয়া ক্যু করে সংসদীয় রীতিকে ভঙ্গ করেছে। তারা ভোট চুরি করে ৯০এর গনঅভ্যুত্থানে যে ইমেজ তৈরি করে ছিল তা থেকে বিচ্যুতি হয় এবং পরবর্তী নির্বাচনে পরাজয় ডেকে আনে। ৭৩-৭৫ সময়ে সরকার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রন করতে ব্যর্থ হয়। দেশে কালোবাজারী, চোরাচালানী শুরু হয় এবং ৭৪ এ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় । পক্ষান্তরে ৯১-৯৫ সময়ে ১০ বৎসরের স্বৈরাচারের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য বিএনপি সরকার কিছু পদক্ষেপ নেয়। যার জন্য এক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য আসলেও রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য অর্থনীতির ক্ষেত্রেও অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় । ঘন ঘন হরতাল,ধর্মঘট ও রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির জন্য দেশের আর্থিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে।

১ম ও ২য় সংসদ সংসদীয় গনতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন করলেও সরকার প্রধান বা নির্বাহী প্রধানের ক্ষমতা ছিল চূড়ান্ত। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বের কোন হেরফের হয়নি। অন্যদিকে সংসদ ছিল দুর্বল। সংসদে দলের চেয়ে নেতা বা নেত্রীর মতামত প্রাধান্য পেয়েছে বেশী। কারণ একটি সার্বভৌম সংসদ ছিল ঠিকই কিন্তু সেই সংসদকে উপেক্ষা করে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারী করা হয়েছে। তারা ১ম সংসদীয় সরকারের মত কোন অগনতান্ত্রিক সংশোধনী না আনলেও এই সংশোধনী গুলি বাতিলের কোন পদক্ষেপ নেয়নি। উপরন্ত সংসদকে এড়িয়ে অধ্যাদেশ জারী করে যেটি ২য় সংসদীয় সরকারের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। "সংসদ ও আমাদের রাজনীতির মধ্যে অনেক দূরত্ব আছে। সে দুর্বলতা সবচেয়ে বেশী ধরা পরে যখন দেখা যায় যে দেশের সংসদকে সন্তোষজনক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। সংসদের অপর নাম আইন সভা । সাধারণ মানুষের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আইন পাশ করবে সেটাইতো গনতন্ত্রের মূল লক্ষ্য । অথচ আমাদের প্রবনতা অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রনয়ন করা। তারপর সেই আইনকে সংসদ বসলে সিদ্ধ করে নেওয়া। বর্তমান সংসদের আমলে নগন্যসংখ্যক আইন পাশ হয়েছে, সংসদে সরাসরি উপস্থিত হয়েছে। আর যেসব আইন পাশ হয়েছে তাও

Dhaka University Institutional Repository

তাড়াহুড়ার মধ্যে পাশ হয়েছে। সংসদকে অবহেলা করা হয় বলেই বহু গুরুত্বপূর্ণ আইন সম্বন্ধে মানুষ কিছুই জানেনা ও সে সব বিষয়ে জনমত প্রতিফলিত হয় না।[21] ৫ম সংসদের কমিটি ব্যবস্থা, প্রচার মাধ্যম, সংবাদ পত্র , দলীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি উপব্যবস্থাগুলি আশানুরূপ না হলেও ৭৩-৭৫ এর তুলনায় অধিক গনতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করে। কমিটি ব্যবস্থায় সকল সংসদ সদস্যের উপস্থিতির জন্য প্রতিনিধিত্ব মূলক হয়ে উঠে।

গনতান্ত্রিক ও নির্বাচিত সরকার হিসাবে বিএনপি মানুষকে হতাশ করলেও পূর্বের সকল স্বৈরাচারী সরকারের সাথে তুলনামূলক বিচারে তারা কিছু ইতিবাচক কাজ করেছিল । ৯১ সালে সরকারী দল বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বেই দেশে সংসদীয় সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।৫ম সংসদের অন্যতম একটি উল্লেখ যোগ্য অবদান হচ্ছে ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের প্রত্যাবর্তন। "One of the remarkable achievements of the 5 th parliament was that it scrapped the infamous constitution (4^{th} amendment) act of 1975 and substituted it by the famous constitution act 1991 (12^{th} amendment) and thus Bangladesh embarked on parliamentary democracy after long 16 years silence."[22]

সুষ্ঠু ও অবাধ মেয়র নির্বাচন, নির্বাচন কমিশনকে গনতন্ত্র উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাড় করানো সহ ভোটার পরিচয় পত্র প্রবর্তনের আইন পাশ, আট বৎসরের চাকমা সমস্যার সমাধান, স্বল্প সময়ে মেঘনা, গোমতী সেতু নির্মান, বড় পুকুরিয়ায় কয়লা উত্তোলন চুক্তি প্রভৃতি ছিল কিছু ভাল পদক্ষেপ যেটি সংসদীয় রাজনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । ৩০শে জানুয়ারী ৯৪ মেয়র নির্বাচনে তার দলের বিপর্যয়কে তিনি গঠন মূলক ও শেখার দৃষ্টি নিয়ে গ্রহন করেন। এই সহনশীল মানসিকতাই দায়িত্বশীল সংসদের পূর্বশর্ত। বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে সেশন জট নিরসন, নিরক্ষতা দূরীকরণ ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী ও নারী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া যা আগামী বৎসর গুলিতে জনসংখ্যার মধ্যে গুনগত পরিবর্তনের সূচনা করবে,

21. সৈয়দ আলী কবির, সংসদীয় গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, সম্পাদনা [illegible], [illegible] (22) Nazrul Islam, parliamentary democarciy in Bangladesh: An Assessment , *Social Science in Perspective Review*, Vol- 1 , No – 7 , 1997 , P.P- 8:9

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি বিএনপি সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগ ছিল । বিরোধী দলের লাগাতার হরতাল ও ভাংচুরের ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের পরিবেশ বাধা গ্রস্থ হলেও দেশে উৎপাদন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় সাফল্য অর্জন করে । ৯৪ সালে জাতীয় বার্ষিক বাজেটে স্থানীয় সম্পদের পরিমান ছিল ৩৮% যা এ যাবৎ কালের সর্বোচ্চ। একই সালে বাৎসরিক মাথা পিছু আয় বেড়ে দাড়ায় ৫,১৫০ টাকায়।

এরশাদের আমলে তা ছিল ৪,৮৪২ টাকা । রপ্তানী খাতেও আয় বাড়ে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সার্ককে সচল রাখতে বেগম জিয়ার ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। " ৯৫ এর ২০শে জানুয়ারী আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হয় যাতে বিভিন্ন দেশ অংশ গ্রহণ করে। বিনিয়োগ বোর্ড ও লন্ডনভিত্তিক প্রকাশনা ইউরোমানি যৌথভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করে। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের এত বড় সম্মেলন প্রথম হলো । এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশী বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য সম্ভাব্য খাত সনাক্ত করা, ঢাকা শেয়ার বাজারের সম্ভাবনা পর্যালোচনাসহ আঞ্চলিক বাজার গুলির সাথে তুলনা এবং বেসরকারী কর্মসুচীসহ যৌথপুঁজি বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা । আর একটি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা হলো দীর্ঘ ৪০ বৎসর পর চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ চালু করা । এ বৎসর সরকার ঋণ খেলাপীদের বিরুদ্ধে তৎপর ছিলেন। তারা যাতে আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। " [২৩]

বিএনপি সরকার শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনতে না পারলেও তত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সাংবিধানিক কাঠামোর ভিতর করতে হবে এ প্রশ্নে বেগম জিয়ার আপোষহীন মনোভাব জয়ী হয়েছে। ২১শে মার্চ ৯৬ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে বিল উত্থাপন এবং ২৫শে মার্চ ত্রয়োদশ বিল পাশের মধ্যে দিয়ে তত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হলে দীর্ঘ ২ বৎসরের রাজনৈতিক বিরোধীতার অবসান হয় । ক্ষমতা হস্তান্তরের এই নতুন ধারনা বাংলাদেশেই প্রথম প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় ট্রাজেডী হলো কোন সংসদই তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারে নাই। সরকার এবং বিরোধী দল যদি সব সময় জনগনের গনতন্ত্রের নামে ক্ষমতা দখল ও মারামারিতে লিপ্ত থাকে তাহলে কোন সংসদই সুষ্ঠু ভাবে কাজ করতে পারবে না।

২৩. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৯ শে ডিসেম্বর, ৯৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

একটি জাতি ও গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য যে কমিটমেন্ট, মৌল ও জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত ও অবাধ আলোচনা প্রয়োজন তা এখানে দেখা যায় না। একাধিক জাতীয় ইস্যুতে প্রধান দলগুলির মধ্যে আছে বিভক্তি । "রাজনীতি হলো সমঝোতায় পৌছার একটি কলা। গনতন্ত্র কার্যকর থাকে না যদি রাজনৈতিক দল গুলো কোন কিছু গ্রহণ করে কিছু প্রদান না করে। পারস্পরিক বিনিময়, আপোষরফা, সংলাপ দেয়া নেয়া এবং সমঝোতা- এগুলি গনতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুনাবলী ও চালিকা শক্তি। যখন রাজনৈতিক দল গুলি বৈরী খেলা খেলে কতটুকু খেলতে হবে এবং কোথায় গিয়ে শেষ করতে হবে সেটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়, তখন অপরিহার্য ভাবে গনতন্ত্র প্রচন্ড ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয় । বার বার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য আমাদের অনেক কিছু শেখার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না"।[২৪]

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ফারাক্কা সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে তখন উদ্যোগ নেন তখন তিনি আওয়ামী লীগ এর সমর্থন পাননি। একই ভাবে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার যখন ভারতের সাথে ৩০ বৎসর মেয়াদী পানি চুক্তি করে তখন বিরোধী দল এর বিরোধীতা করে। আবার পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বেলায়ও তারা ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেনি। বেগম জিয়া এর বিরোধীতা করতে গিয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত লং মার্চে যান। সরকার এ বিরোধীদলের এই যে পরস্পর বিরোধী অবস্থান এই বিষয়টি দাতাদের ভাবিয়ে তুলেছে। সরকার ও বিরোধী দলের সমস্যা নিরসনে দাতা গোষ্ঠী মধ্যস্ততা করে ব্যর্থ হয়েছে । তারা হুমকি দিয়েছে যে এভাবে যদি সংবিধান নির্দেশিত পথে না যেয়ে হরতাল, অবরোধের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খোঁজা হয় তবে এখানে সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। যার জন্য এখানে বিনিয়োগের পরিমান কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে ভিয়েতনাম ও কম্পুচিয়ায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৯৫ এর শেষের খবর ছিল পুলিশ হেফাজতে নারী ধর্ষন ও নির্যাতন এবং ইয়াসমীন হত্যাকান্ড। এই বৎসর প্রায় ৪০০ গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ রপ্তানী বানিজ্যে প্রধান খাত হলো পোশাক শিল্প যার মাধ্যমে ৬০০ কোটি টাকা আয় হয়ে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক ভীত রক্ষায় ও সুপরিকল্পিত নীতির জন্য নয়, আন্দোলন হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, গোলাম আজম বাংলাদেশের নাগরিক হবে কি হবে না, ব্লাসফেমী আইন হবে কি হবে না, কাদিয়ানীরা কি মুসলিম না অমুসলিম প্রভৃতি অবান্তর বিষয় নিয়ে যার সাথে সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্ক নাই। সরকার বা বিরোধী দলের সংসদে উপস্থিতি থাকাটাই বড় কথা নয়, জনগনের জন্য কি কাজ করেছে সেটাই বড় কথা। সংসদ চলাকালীন সময়ে সরকারী তহবিল থেকে প্রতি মিনিটে খরচ হয় ২০ হাজার টাকা । আর এই বিপুল ব্যয় আসে জনগনের টাকা থেকেই । অথচ তারা সংসদে উপস্থিত না থেকেও উপস্থিতির জন্য পারিশ্রমিক ভাতা গ্রহণ করেছেন।

২৪. ৯৫ এর ৩রা জানুয়ারী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বিচার পতি মোস্তফা কামাল প্রধান অতিথি হিসাবে Democracy, Constitutionalism and Compromise শীর্ষক বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

"It may be maintained that the mere presence of both the treasury and opposition members in the parliament is not enough for making it workable, meaningful. The politics devoid of honesty and sencerity is a politics without political ideology norms and a politics which is short of such political behaviour is not a politics at all as it is understood in the descipline of political science."[২৫]

৫ম সংসদীয় সরকারী ও বিরোধী দল জাতীর গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে দ্বিমত পোষন করলেও নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় সংসদে উঠলে সেটি পাশের ব্যাপারে কোন দ্বিমত হয়নি । ১৯৯১এর নভেম্বরে যখন উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ চলছিল তখন সাংসদরা ও মন্ত্রিবর্গ, স্পীকার ও রাষ্ট্রপতির সহায়তায় নিজেদের বেতন বৃদ্ধি করে । এছাড়া করমুক্ত গাড়ী কেনার সুযোগ, বৎসরে হাত খরচ বাবদ প্রতিজনের জন্য ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ এবং ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে যা দিয়ে ইচ্ছামত জিনিস আমদানী রপ্তানী করতে পারে । তারা নির্বাচিত হন জনগনের সঠিক নেতৃত্ব বা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য । কিন্তু যে দেশের ৬০% মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে সে দেশের শহরের এলিট সাংসদরা কতটুক প্রতিনিধিত্বশীল সেটিই বিবেচ্য বিষয় । "৫ম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সাংসদের আর্থ সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে শতকরা উনষাট ভাগ উচ্চবিত্তের মানুষ এবং ৭২ ভাগ বসবাস করে শহর এলাকায় । সুতরাং এমনি সংসদে যে আপামর জনগনের আশা আকাংখা উপেক্ষিত হবে তা বলাবাহুল্য । ৫ম সংসদের যাত্রার শুরুতেই সংসদের বিশেষ সুযোগ সুবিধায় বিল সর্ব সম্মতিক্রমে যে পাস হয়েছে, তা এমনি উপসংহারের পক্ষে যুক্তি দাড় করায় ।"[২৬]

বিএনপি সংসদীয় সরকার গঠন করার পর থেকেই বিভিন্ন দক্ষিন ও বাম বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল এই মর্মে বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান করে যে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বৈরতন্ত্রের অবসান হয়নি । জনগনের শোষন মুক্তি নির্যাতনের হাত থেকে পরিত্রান, সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থা, খাদ্য , বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা অর্থাৎ অবকাঠামোগত পরিবর্তন যতদিন না হবে ততদিন জনগনের গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না । "কাজেই কোন সরকার বৈধভাবে ক্ষমতায় আছে না অবৈধ ভাবে ক্ষমতায় আছে তার সাথে শ্রমজীবি জনগনের স্বার্থে তাদের জীবিকার ও জীবনের নিশ্চয়তার কোন সম্পর্ক নাই । এ ক্ষেত্রে অবৈধ্য সামরিক শাসন ও বৈধ সংসদীয় সরকারের মধ্যে কোন তফাৎ নাই এবং তফাৎ যে নেই বাংলাদেশের জনগন তা হারে হারে টের পাচ্ছে ।"[২৭]

২৫. Jaglul Haider, IBID, 1997.
২৬. Holiday, February 15, 1991
২৭. বদরুদ্দিন উমর, *বাংলাদেশের গনতান্ত্রিক বৈরাচক্র*, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ৩৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলগুলি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচন, নির্বাচিত জাতীয় সংসদ ইত্যাদি উপরি কাঠামোগত পরিবর্তনের নামে আন্দোলন করলেও অবকাঠামোগত পরিবর্তন তথা জনগনের মৌলিক আর্থ সামাজিক দাবী নিয়ে আন্দোলন করেনি । "চাল এবং সার সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানোর ও নিশ্চিত করার দাবীতে দেশে যদি ধর্মঘট ঘেরাও ইত্যাদি কর্মসূচী ঘোষনা করা হতো তার সাথে মানুষ একাত্ম বোধ করতো । মানুষ এটা বুঝতো যে সরকার মানুষের উপর জুলুম কমানোর ব্যবস্থা নিচ্ছে না । কিন্তু বিরোধী দলগুলি নির্বাচিত মানুষের পাশে আছে ।"[২৮]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে আওয়ামীলীগ আন্দোলন করে । যার ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাংবিধানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে । তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচিত ৭ম জাতীয় সংসদ বা বাংলাদেশের ৩য় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায়ও একই ভাবে সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে অসহযোগীতামূলক মনোভাব দেখা যাচ্ছে । অথচ পারস্পরিক সহযোগীতা ও সহনশীলতা না থাকলে সংসদীয় গনতন্ত্র পরিচালনা করা সম্ভব না। যতদিন সন্ত্রাস ও কালো টাকার ছড়াছড়ি হবে, রাজনৈতিক দলগুলির আচরন ও মানসিকতার পরিবর্তন না হবে ততদিন নির্বাচন সুষ্ঠ হবে না এবং নির্বাচিত সরকারও গনতান্ত্রিক হবে না ।

আর এজন্য সংসদীয় বা রাষ্ট্রপতির যে ধরনেরই সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল বানিজ্যিক বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য সেটি হবে সংসদীয় বা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির স্বৈরতন্ত্র । "The 12th amendment of the constitution was precisely aimed at converting a rubber stamp parliamant into a sovereign one. But experience with many developing countries including Bangladesh shows that even in a parliamantary system and ontensibly sovereign perliamant may in practice be subserviant to the personal whims of a despot ..... It can therefore be argued that a mere change in the form of government can contribute very little to usher in a era of parliamantary supremacy."[২৯]

২৮. বদরুদ্দিন উমর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৭,১৯৯৪ ।

২৯. Mohammad, A, Hakim, *Bangladesh Politics: The Shahabuddin Interregnum*, Page-79 UPL,1991

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় সরকারের মূল লক্ষ্যই হলো গনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্য যে শর্ত প্রয়োজন সেইসব শর্তের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন । যেমন : মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জীবন ধারণের স্বাধীনতা, শিক্ষার নিশ্চয়তা, বাসস্থানের নিশ্চয়তা, বহুদলীয় গনতন্ত্র, প্রচার মাধ্যমের স্বায়ত্বশাসন ও নিরপেক্ষতা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রভৃতি গনতান্ত্রিক সফলতার শর্তগুলি কোন সংসদীয় সরকার পূরণ করতে পারেনি। বাংলাদেশে আজও মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি । দূর্নীতি ও সন্ত্রাস আজও সমাজে ক্রিয়াশীল । তাই বলা যায় যতদিন উপরোক্ত ক্ষেত্রে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না, ততদিন সংসদীয় সরকার দায়িত্বশীল হতে পারবে না। একদল সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার করলেও তারাই আবার আর এক দলে আশ্রয় পাচ্ছে। সাংসদরাই সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। সংসদীয় সরকারের আর একটি লক্ষ্য হলো প্রশাসনিক দুর্নীতিকে প্রতিহত করা । কিন্তু ৫ম সংসদে দেখা গেছে যে প্রশাসনিক দুর্নীতির প্রবনতা পূর্বের মতই লক্ষ্য করা গেছে । এবং এই দূর্নীতির সাথে সরকারী ও বিরোধী দলের এম পি রা সরাসরি জড়িত ছিলেন । এমনকি মন্ত্রি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও দূর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। সংসদীয় সরকারের অন্যতম দায়িত্ব মানুষের জান মালের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং এজন্যে পুলিশ বাহিনীদের নিয়োজিত করা হয় ।

কিন্তু বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় দেখা যায় যে পুলিশ বাহিনী মানুষের সেবায় নিয়োজিত না থেকে বরং তাদের হাতেই অনেক নিরীহ প্রানীর জীবন যায় । এক্ষেত্রে ঢাকার রুবেল, দিনাজপুরের ইয়াসমিন হত্যার কথা উল্লেখ করা যায় । গনতন্ত্রের প্রধান শর্তই হলো জনগনের জানমালে নিরাপত্তা রক্ষা ও হেফাজত করা । কিন্তু পুলিশী নির্যাতনের জন্য ১৯৯১-৯৫ সময়ে বহু লোকের প্রান যায়। "*Little wonder therefore that one hardly sees these days any effective* parliamentary or civil authority control over police source. On the contray, the police remain epowered to the teeth by the special powers Act, the police safety (special provision), act procedure. The main fact of democracy is to establish the rule of law in the society but in the country like Bangladesh prevailing parliamentry system, the rule of law is not going to be established yet. It is a matter of sorrow and shame for the political leader and far us as a conscious citizens of the country."[৩০]

৩০. The Daily Star, Editorial –1-3-2000.

Dhaka University Institutional Repository

এই সংসদীয় সরকার নিয়ে পূর্বে অনেক গবেষনা হয়েছে এবং বর্তমানে হচ্ছে। এই সব গবেষনা থেকে একটি জিনিষ বেরিয়ে এসেছে তা হলো যতদিন রাজনৈতিক দল গুলি তাদের স্বার্থগত অবস্থান, দলীয় সংকীর্নতা , শ্রেণীগত আচরণ ও ক্ষমতার মোহ ত্যাগ না করবে ততদিন এখানে কোন সরকারই ভালভাবে কাজ করতে পারবে না । আমাদের আগে প্রয়োজন জনগনের ভোটের অধিকার , কথা বলার অধিকার এবং ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা কেননা অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। এই গবেষনায় এই বিষয় গুলিকে বিশেষ ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ।

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় সরকার বা রাজনীতি মূখ্য নয়, অর্থনীতিই নির্ধারণ করে রাজনীতিকে । সুস্থ ও সচল অর্থনীতি একটি গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত। দারিদ্রতা ও গনতান্ত্রিকতা পাশাপাশি থাকতে পারে না। দেশে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ভোট হবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের পূর্ব মেয়াদ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে । আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের জন্য এটাই সহজ ও কাম্য পদ্ধতি । ঘন ঘন নির্বাচন ও সরকার পরিবর্তনের ফলে প্রচুর টাকা অপচয় হয় ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বজায় থাকে।

যার ফলে দেশ উন্নয়নের পরিবর্তে অবউন্নয়নের দিকে যায় । নির্ভরশীলতার তত্ত্বের তাত্ত্বিক A.G. Frank, 'Devolopment of Underdevelopment' গ্রন্থে একে 'অবউন্নয়নের উন্নয়ন বলে উল্লেখ করেছেন ।[৩১] অর্থাৎ দেশে অবনতির উন্নতি হচ্ছে । এজন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার কাজে নেতাকে উঠে আসতে হবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের মূল থেকে । সরকার গঠন করা মানেই ক্ষমতা কুক্ষিগত করা নয় । সন্ত্রাস ও আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়া যায় কিন্তু একটি সত্যিকারের গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় । অসমাপ্ত গনঅভ্যুত্থান নয়, বুর্জোয়া শ্রেণীর কাঠামো ধ্বংস করে সত্যিকারের জনগনের সরকার গঠন করতে হবে।

৩১. Andre Gunder Frank,, *"Development of Underdevelopment"* in charles K.Illber, ed. "The Political Economy of Underdevelopment" (New York. Random House 1973)

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় সরকারকে কার্যকরী করার জন্য কিছু সুপারিশ ঃ

১। সংবিধানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির কেবল প্রতিফলন ঘটালেই হবে না। সেগুলি যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। এজন্য সরকারকে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের প্রাধান্য দিতে হবে এবং তাদের দাবীদাওয়া পূরণের ব্যাপারে সংবেদনশীল থাকতে হবে। "Government which are responsive follow as a matter of convention, the idea that they ought to listen and take note of the views of different groups with in society before divining and implementing policies.[৩২]

২। সংসদকে সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় পরিণত করতে হবে। এজন্য সরকারী ও বিরোধী উভয়কেই সহনশীল ও সংযম হতে হবে। রাজপথে হরতাল, ভাংচুর করে নয়, বরং সংসদের ভেতর থেকেই জনগণের কথা বলতে হবে। কোরাম সমস্যা দূর করতে হবে এবং ব্যক্তিগত বিষয় নয় বরং জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উচিত। সংসদে ফাইল পেটানো, স্পীকারের সাথে অশোভন আচরণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করে সংসদীয় সংস্কৃতির আচরণ গড়ে তুলতে হবে। প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, এমপি, প্রতিরক্ষাবাহিনী সকলের সম্পত্তি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য সংসদীয় কমিটি থাকবে এবং প্রতিটি দলের তহবিলের উৎস ও ব্যয় সম্পর্কীত তথ্য সংসদের নিয়মিত আলোচনায় করতে হবে। এছাড়া প্রতিরক্ষা সহ সকল বাজেট বরাদ্দ নিয়ে এবং উন্নয়ন বরাদ্দ, বিদেশী সাহায্য সম্পর্কীত বিভিন্ন চুক্তি, প্রকল্প ইত্যাদি বিষয়ে সংসদে খোলামেলা আলোচনা করা দরকার।

---

[৩২] Allan Ranwick and Lanswinburn, *Basic Political Concept*, P-96. Hutichin son and Co. 1983

Dhaka University Institutional Repository

৩। নিয়মিত ও সঠিক সময়ে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রার্থী মনোনয়নের মাপকাঠি অর্থ নয় বরং শিক্ষার সততা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও জনসেবা হতে হবে। এজন্য নির্বাচন কমিশনের সংস্কার করতে হবে, তারা যেন দলীয় ও সরকারী স্বার্থে ব্যবহৃত না হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রসংসনীয় উদ্যোগ হলো ভোটারদের পরিচয় পত্র, কার্ড ব্যবহার। এছাড়া একে কম্পিউটারাইজড্ করে প্রত্যেক ভোটারের নাম ঠিকানা, নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্তি ও পুরাতন ভোটার বাদ দেওয়া প্রভৃতি করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনের পরিবেশ তৈরী করলেও নির্বাচন পরিচালনা করবে নির্বাচন কমিশন। এই প্রসংগে বিচারপতি রউফ বলেছিলেন "নির্বাচন যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় তাই এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।" [৩৩]

৪। রাজনৈতিক দলগুলির অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা এবং জাতীয় ইস্যু ও সমস্যার ব্যাপারে ঐক্যমত থাকতে হবে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলিতে রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলের ঐক্যমত রয়েছে বলেই বৃটেনে সংসদীয় ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। " The Prime minister meets the convienience of the leader of the opposition and the leader of the opposition meets the convinience of the government"[৩৪] দলের নেতা বা নেত্রীর ক্যারিশমার উপর ভিত্তি করে নয়। বরং আদর্শ ও নীতির উপর দল গড়ে উঠবে এবং এই ব্যাপারে তাদের অটল থাকতে হবে। আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে ঘন ঘন দল পাল্টানো চলবে না। " *In fact the danger of personal leadership is that political institution* may not grow under such a personal system. It also leaves no scope or chance of orderly succession of authority. In such a situation for the lack of available charismatic national leaders political parties can not function and when the political parties fail to provide leadership, military takes over political power."[৩৫]

৫) কমিটি ব্যবস্থা ছাড়া সংসদীয় গনতন্ত্র অচল। এই কমিটি গুলির ভূমিকা নির্ভর করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সার্বিক গনতন্ত্র ও সংসদীয় রাজনীতির অবস্থান ও প্রকৃতির উপর । কমিটি গুলিকেকার্যকর করার জন্য প্রথমত, প্রয়োজন সাংসদের আগ্রহ ও বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জনের সদিচ্ছা।

৩৩. বিচিত্রা, ৫ই মে, ১৯৯৩.

---

[৩৪] Ivor Jennings *Cabinet Government*, P-500., Cambridge University press, 1969

[৩৫] C. H. Dodd, *Political development*,London 1972, P-15

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় বিষয় সমূহে সরকারী ও বিরোধী দলের ঐক্যমত সংসদীয় পদ্ধতি সমূহকে কার্যকর করার অন্যতম উপায় বলে অনেকে মনে করেন।[৩৬] সংসদীয় কমিটি গুলো কার্যকর করার জন্য সন্দীপ সাস্ত্রী দুটি প্রধান সুপারিশ করেছেন : - ক) সাংবাদিক ও বিভিন্ন পর্যায়ের জনগোষ্ঠির সম্মুখে সভা অনুষ্ঠান । (খ) সংসদীয় কমিটি গুলির রিপোর্ট বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও অন্তরায় নিয়ে সংসদে ফলোআপ আলোচনা করা।[৩৭] বাংলাদেশের কমিটি গুলির ভূমিকাকে জোরদার করার জন্য প্রয়োজন সরকার ও বিরোধী দল উভয় প্রকার সাংসদের সদিচ্ছা ও নিরবিছিন্ন প্রয়াস।

৬। প্রশাসনিক দুর্নীতি ও আমলাতন্ত্র বন্ধ করার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও যুগোপযোগী আইন প্রনয়ন করতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গোটা সিভিল সার্ভিসকে পেশার ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক স্থানীয় সরকার ভিত্তিক স্থানীয় প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে এবং বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য মনিটরিং ও বিশেষ ইউনিট থাকবে। আমলাদের কাছে রাজনৈতিক নেতা নেত্রীর অন্যায় তোষামোদ বন্ধ করতে হবে। "সকল প্রকার প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও আমলাদের আচরণবিধি সংশোধন ও প্রয়োজনে প্রনয়ন করা আবশ্যক, রাজনৈতিক নেতা- নেত্রীদেরকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও আমলাদের অপকর্মের প্রতিবাদী হওয়া উচিত। নতুবা গণতন্ত্র বিপন্ন ও দুর্বল হওয়া স্বাভাবিক। কোন সরকারকেই প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও আমলাদের দুর্নীতি ও বে-আইনি কর্মকান্ডকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন না করার বিধান থাকা জরুরী।" [৩৮]

৭। সামরিক বাহিনীর কাজ হয়ে কেবল রাষ্ট্র রক্ষা করা, রাষ্ট্র পরিচালনা করা নয়। অর্থাৎ রাজনীতির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। এছাড়া সামরিক খাতে ব্যয় কমিয়ে আনতে হবে এবং কি পরিমান ব্যয় হয় সেটি খোলাখুলি ভাবে সংসদে আলোচনা সুযোগ থাকতে হবে। জনগনের সরকার বলে যতই তারা দাবী করুক না কেন যতদিন সামরিক খাতে ব্যয় কমানো না হবে ততদিন কোন সরকারই গণতান্ত্রিক হবে না।

---

[৩৬] " Parliamentary Committees And Executive Power in Constitutional Term" . AM Khasru , The *Bangladesh Observer*, 7 June, 1999.

[৩৭] Sandeep Shastri, *in Indian Journal Of Public Admistration* , April , June 1998, Vol . XLIV, No-2

[৩৮] দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই এপ্রিল ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

৮। এনজিও গুলি যেহেতু জনসেবামূলক কাজে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে সেহেতু সরকারের উচিত এটিকে আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসাবে স্বীকার করে এর উপর জারিকৃত বিভিন্ন অধ্যাদেশ তুলে নেওয়া।

৯। '৯০ এর এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের একজন মন্ত্রী এবং ক্লিনটনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিল রিচার্ডসন বাংলাদেশে আসেন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবলোকন করে কিছু মন্তব্য করেন। ক) গণতন্ত্রমানে শুধু নির্বাচন নয় তার চাইতেও বেশী খ) রাজনৈতিক দলগুলির সংকীর্ণ নীতি ও রেষারেষির জন্য গণতন্ত্র নাজুক অবস্থায় আছে। গ) প্রতিটি গণতান্ত্রিক সমাজে সংঘাত নয় আপোষ রেষারেষি নয় সমাঝোতার অনুশীলন থাকতে হবে। ঘ) রাজনৈতিক মত পার্থক্য যেন এমন অবস্থার জন্ম না দেয় যেখানে প্রতিপক্ষের যে কোন বিরোধীতা নিয়মনীতি হয়ে দাঁড়ায় ঙ) স্বাধীন বিচার বিভাগ, একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন ও রেডিও টেলিভিশনের স্বায়ত্ব শাসণ দরকার।

১০। সংসদীয় সরকারকে অর্থবহ করে তোলার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সংসদীয় সংস্কৃতির চর্চা যেটি সরকার ও বিরোধী দল উভয়কেই পালন করতে হবে। এখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিরোধীতাই বেশী প্রাধান্য পায় যাকে *Oppositional potivism.* বলা হয়। এর মাধ্যম হলো হরতাল। যার প্রভাবে সামগ্রিক অর্থনীতি হয়ে পড়ছে পঙ্গু অর্থাৎ হরতালের রাজনীতি চলে বিরোধীতার নামে যা পরিহার করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। বিরোধীদল যদি শুধু বিরোধীতার খাতিরে বিরোধীতা না করে সরকারের গঠনমূলক সমলোচনা করে এবং ভালো দিকগুলির প্রশংসা করে তবে জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। পক্ষান্তরে সরকারী দলকে এই সংসদীয় সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হতে হবে। যে সংসদে সকল দল ও মতের প্রাধান্য দিতে হবে। এখানে কোন দলীয় কর্তৃত্ব খাটানো যাবেনা। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে দলগুলি এই সংসদীয় সংস্কৃতির চর্চা করে বলেই সেই দেশ সংসদীয় সরকারের মডেলে পরিনত হয়েছে। যেখানে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনে যদিও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত দূর্বল হয়ে পড়ে তথাপি এর ভাল দিক এই যে, তারা সংসদের সকল দলমতের প্রাধান্য দিচ্ছে। যার জন্য এপ্রিল '৯৯ এ বিজেপি সরকার মাত্র ১ ভোটের ব্যবধানে আস্থা ভোটে পরাজিত হয়ে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ায়। আমাদেরকেও এই সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের আর্থ-সামাজিক ভিত্তিমূল অর্থাৎ অবকাঠামোগত পরিবর্তন না করে কেবল অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করলেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না। কারণ জনগণের শোষন মুক্তি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতির নিশ্চয়তা ব্যতীত সংসদীয় বা প্রেসিডেন্সিয়াল কোন সরকারই প্রকৃত গণতান্ত্রিক হতে পারবেনা। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে সরকারই জনগণের উন্নয়নের কথা বলেই ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু দেখা গেছে যে, জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় নি। এখনও অসংখ্য দরিদ্র জনগণ তিনবেলা পেট পুরে খেতে পারে না। দারিদ্র বিমোচন ছাড়া রাজনৈতিক উন্নয়নের কোন অর্থ হয় না। তাই ভোটের অধিকারের পাশাপাশি সরকারকে ভাতের নিশ্চয়তা দিতে হবে। কথা বলার অধিকারের পাশাপাশি ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তা থাকলে জনগণ কখনই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যাবে না। '৯১ এর অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতায় এসে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করলেও এ সময় শ্রমিক, কৃষক ও পেশাজীবিদের আন্দোলন বন্ধ হয়নি। কারণ হলো বিএনপির শ্রেণী চরিত্র ও অন্যান্য দলের শ্রেণীর চরিত্রের সাথে কোন পার্থক্য নাই। এরা সবাই বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের স্বার্থকেই রক্ষা করে। জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এই কথাটি তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যম মাত্র। তাই সরকারের পরিবর্তন নয় বরং শাসক শ্রেণীর পরিবর্তন করে প্রকৃত জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আহমেদ আবুল মনসুর ঃ *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা , নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮।

আলম আলহাজ্ব বদিউল ঃ *রাজনীতির সেকাল একাল, প্রসঙ্গ ; বাংলাদেশের রাজনীতি*, প্রকাশক অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ, নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম, ১৯৯৬।

আজাদ লেলিন ঃ *উনসত্তরের গনঅভ্যুত্থান, রাষ্ট্র সমাজও রাজনীতি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ১৯৯৭।

উমর বদরউদ্দিন ঃ *বাংলাদেশে গনতান্ত্রিক সৈরতন্ত্র*, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৪ ।

খীসা প্রদীপ্ত ঃ *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ৯৯।

চাকমা জ্ঞানেদু বিকাশ ঃ *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় পরিষদ*, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা , ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ৪৬।

ফিরোজ জালাল ঃ *পার্লামেন্টারী শব্দকোষ*, প্রকাশক গোলাম মঈন উদ্দিন, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ, বাংলাএকাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।

মতিন আবদুল ঃ *খালেদা জিয়ার শাসনকাল, একটি পর্যালোচনা*, রেডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশনস্, ঢাকা, ১৯৯৭।

মিয়া এম এ ওয়াজেদ ঃ *বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৫।

রেহমান সোবাহান ঃ *বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংকট*, ঢাকা জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮২।

হোসেন আমজাদ ঃ *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, প্রকাশক কবির আহম্মদ, পড়ুয়া, ৪৬,আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, ১৯৯৬।

হোসেন আলহাজ্ব সৈয়দ আবদুল ঃ *গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সংকট*, প্রকাশক মোঃ আবদুল কাদের, ১৬, কবি জসিম উদ্দিন রোড, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ২২।

" ঃ *গনতন্ত্র নেতৃত্ব ও উন্নয়ন*, প্রকাশক মোঃ আবদুল কাদের, ১৬, কবি জসিম উদ্দিন রোড, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ৯১।

" ঃ *শেখ হাসিনার অমর কীর্তি, পার্বত্য শান্তি চুক্তি*, সাকো ইন্টারন্যাশনাল, আমিনকোর্ট, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ২০।

Dhaka University Institutional Repository

Allan RanWick & Lan Swinburn	:	*Basic Political Concept*, Hufichinmon & comcapny, 1983, Page- 96.
Ahmed Moudud	:	*Era of Sheikh Mujibur Rahman*, UPL.
"	:	*Bangladesh Contitutional Quest for Autonomy*, UPL-1979.
Ahmed Kamruddin	:	*A Socio Policatal History of Bengal and The Birth of Bangladesh.*
Azad Maulana Abul Kalam	:	*India Wins Freedom*, Orient Longman, New Delhi, 1989.
Ahmed Sirajuddin	:	*Sheikh Hasina Prime Minister of Bangladesh*, Golam Mustafa, Hakkani Publishers, 1999, Page 132.
Ahmed Imtiaz	:	*State & Foreign Policy: Indias Role in South Asia*, Academic Pulishers, 1993, P.P. 209-304
Birch H. Anthoney	:	*The British System of Government*, Allan Union, London, 1986.
Ball, Allan	:	*Modern Policitics & Government*, The Macmillan Press ltd. ed. 1977. Printed in Great Britain, By Richard Clay Limited, Beng way, Suffolk, p-56.
Bather and Harvey:	:	*The British Constitution.*
Chowdhury G.W.	:	*The Last Days of United Pakistan*, Churst,London, 1974.
CHowdhury Nazma	:	*The Legistative Process in Bangladesh, Politics & Functioning of The EastBengal Legislature, 1947-58*, UPL, Dhaka, 1980.
Can Bon Jules	:	*The Permanent Bases of Foreign Policy*, New York, (Council of Foreign Relations),1951, P2.
Emerson Rupert	:	*From empire to nation, Boston* ; Beacon Press. 1960, P-94.
Finer.H	:	*The Theory of practice of Modern Government*, London, Pal Mall Press, 1962. P-592.

Dhaka University Institutional Repository

Gettle , R.G : *Political Science*, World Press Calcutta, 1950, page-199.

Hakim A Mohammad : *Bangladesh Politics; The Shahabuddin Interregnum*; UPL, Dhaka, 1973.

Harun Shamsul Huda : *Bangladesh Voting Behaviour, A Psephologiacal Study1973*, UPL, April-1986, p-21

" : *Parliamentary Behaviour in a Multinatinational State 1947-58: Bangladesh Experience*, Asiatic Society of Bangladesh 1984.

Islam M Nazrul : *The politics of National Integration in newstates; A comparative study of Pakistan & Malaysia 1957-1970.* Ph.D dissertion, Griffith University, Australia 1981.

Jennings Ivor : *Cabinet Government* , Cambridge University Press, 1961, p-16.

" : *The British Consttation*, Cambridge University Press, New York, 1950, P-65.

Jahan Rounaq : *Bangladesh Politics Problems and Issues*.UPL ltd. 1980.

" : *Pakistan Failure in National Integration*, Columbia University Press, New York, 1972.

Khan Rahman Zillur : *Leadership Crisis In Bangladesh;* Dupl, 1984, Redcross Building, Motijheel c/a, P-167.

Laski , J Harold : *Democracy in crisis*, london, George Allenand & Union Ltd. 1933.

Maciver. R. M : *The Modern State*, London, Oxford University Press, 1964, Page-399.

Monirujjaman Talukder : *The Bangladesh Revolution and its aftermath*, UPL, Dhaka, 1983

: *Politics and Security of Bangladesh*, UPL, Red crescent Building , 114, Motijheel c/a, P.O Box-2011, Dhaka, 1994.

Dhaka University Institutional Repository

Mascarenras Anthony:	:	*Bangladesh a Legacy of Blood*, London.1986.
Narien Verendra	:	*Foreign Policy of Bangladesh(1979-81)*, Jaipur Halekh Publishers, 1987, P-207.
Pye Lucien	:	*Aspect of politied devolopment*, Little Brown and company, Boston, 1966.P-68.
Syeed K.B	:	*The political system of Pakistan*, Boston, Ltoughton, Miffin co, 1967, P-12.
"	:	*Pakistan The Formatine Phase, 1957-198*, London, Oxford University Press.
Yong Koland	:	*The British Parliament, 1967*, Page-22.

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধাবলী / সংকলন

আহম্মদ এমাজউদ্দিন : বাংলাদেশে গনতান্ত্রিক সরকারের স্বরুপ " *গনতন্ত্র*" সম্পাদনা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২৭।

আহমেদ কামাল উদ্দিন : সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভুমিকা "*গণতন্ত্র*" সম্পাদনা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৯০-৯৪।

কবির সৈয়দ আলী : সংসদীয় গনতন্ত্রর প্রক্রিয়া, "*গণতন্ত্র*" সম্পাদনা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৯০।

করিম সরদার ফজলুল : "*গনতন্ত্র এবং সহনশীলতা*" "*গনতন্ত্র*" সম্পাদনা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১৯৯৫।

খান মিজানুর রহমান : *সংবিধান ও তত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক*, সিটি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১৫৮।

খান নিয়াজ আহম্মদ, মোঃ মোস্তাফিজুর, আনম মুনির আহম্মদ : জবাবদিহিতা, নীতি নির্ধারন ও সংসদীয় কমিটিঃ বাংলাদেশ প্রসংগ, *উন্নয়ন বিতর্ক ত্রৈমাসিক জার্নাল*, অষ্টাদশ বর্ষ, জুন ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৪৫।

ছফা আহম্মদ : বাংলাদেশে গনতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারীতা "*গনতন্ত্র* "সম্পাদনা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৪৬।

জাহাঙ্গীর বোরহান উদ্দিন খান : খালেদা জিয়ার জেহাদ, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

সজল তারেক : তত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক: ফয়সালা জনতা থেকেই আসুক, *জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ৫ই মে, ১৯৯৪।

বালা হীরা লাল : বাংলাদেশের দারিদ্র অতীত ও বর্তমান, *বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর*, সম্পাদনা তারেক সামসুর রেহমান, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

মুহাম্মদ আলু : "শিল্পায়নে বিলম্বিত পদক্ষেপ আত্মঘাতি মুলক হতে পারে" *দৈনিক খবর*, ১৯৯৪।

" : "গনতন্ত্র, সংবিধান ও অর্থনীতি" *বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫বছর*, সম্পাদনা, তারেক সামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

রহমান শামসুর : "রাজনৈতিক দল যেন সন্ত্রাসীদের অভয় আশ্রয় না হয়", *বাংলার বানী*, ঢাকা, ১৯৯১, ৩রা নভেম্বর, পৃষ্ঠা ৪।

Dhaka University Institutional Repository

রহমান তারেক এসটি ঃ "সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ" *বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর*, সম্পাদনা, তারেক সামসুর রেহমান, মওলা ব্রাদার্স, ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৮।

রহমান এ এইচ এস আমিনুর ঃ বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার প্রকৃতি ও প্রত্যাশা, *সমাজ নিরীক্ষন*, ৪৯, ১৯৯৩।

রহমান আতাউর ঃ "উন্নয়ন ও গনতন্ত্রায়ন; ২৫ বছরের মূল্যায়ন " *বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর*, সম্পাদনা, তারেক সামসুর রেহমান, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

শহিদুল্লা এ.কে.এম. ঃ বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচন, *বাংলাদেশে সংসদীয় গনতন্ত্র ; প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা*, সম্পাদনা এমাজউদ্দিন আহমদ, করিম বুক করপোরেশন, ঢাকা, ১২০৭, ১৯৯২।

হোসেন মহনুল ঃ অনেক কিছুই ভুলতে হইবে, অনেক কিছুই শিখিতে হইবে, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৪ই মে, ১৯৯৪।

হাসানুজ্জামান আল মাসুদ ঃ পার্লামেন্টারী কমিটি সিস্টেম ইন বাংলাদেশ, *রিজিওনাল ষ্টাডিজ*, *১৩(১) ১৯৯৩-৯৪।*

" ঃ ওভার ডেভেলপ্‌ড ..... পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ, *বাংলাদেশ ক্রাইসিস অব পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট*, সম্পাদনা, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

Journal and Articles

Ahmed Mohiuddin : Two Decades of Forakka Diplomacy; How did we perform? *Daily Star*, May15,1996.

Ahmed Moudud : Crisis of Democracy in Bangladesh, *Holiday*, October 18, 1997, p-3.

Ahmed N : Committees in the Bangladesh Parliament. *Legislative Studies*, 1998, Vol-13, No-4, Page-19.

Bindra S.S. : *Indo Bangladesh Relations*, New Delhi, Deep and Deep Publications, 1982 , p-74.

Chakma Bhumitra and Syed Nazrul : "Problem of National Integration of Bangladesh, The Chittagong Hill Tracts" *Asian Survy*, Vol-29, No-1, October, 1948.

Epstein.D.Leon : Parliamantory Govenrment in David L sills,ed, *International Encyclopaedia of Social sciencs*, New Yourk, Mac Millen and Free Press, 1968, Page-474.

Esman, Milton J : The politics of Development Administratin in John D. Montgomery and William J. Siffin (eds) *Approaches to Development and Politics Administration and Change*, New York, 1966.

Foucalt, Michel : What are we Todays Techonologies of the self(ed). H. Gutman London; Tavsitock 1988. *Colonial Policy and Practice*. London combridge University press,1948.

Frank Andre gunder : Development of Under Development" in Charles K Illber(ed) *"the Political Econony of Underdevelopment"*, New York, Random House. 1973.

Haque Abul Fazal : "The problem of National Identity of Bangladesh" *Journal of Social Studies*, No-24, April 1984, P-230.

Haider Jaglul : Parliamentary Democracy in Bangladesh; From Crisis to Crisis. Page- 64, Vol.42, No.1, J, *Asiatic Soc, 1997.*

Dhaka University Institutional Repository

Haque Khandaker Abul : Parliamentary Committees in Bangladesh; Structurs and Function, *Congressionl Studies Journal*, Vol.2. No.1, January 1994.

Haider Jaglul : Ethnic Problem in Bangladesh; A Case Study Of Chakma Issu in The Chittagong Hill Tracts, *The Journal of The Institute of Bangladesh Studies*, No. ixv, 1982, pp-59-79.

Islam Nazrul : Parliamentary Democracy in Bangladesh ; An Assessment, *Perspective In Social Science Review*. Vol-5,No.1, 1997, Page-5.

Khasru A.M : "Parliamentary Committees and the Executive Power in constitutional term", *The Bangladesh Oveserver*, 17June,1999.

Mohammad Anu : "Econimics of the World Bank; Growing Resources, Increasing Deprivition" *Holidy*, December,1995.

Nazem Islam Nurul & Mohammad Humayan Kabir : "Indo Bangladesh common River and the Water Diplomacy" *BIISS Journal*, Dhaka, No-5, December,1986, Page-11.

Siddique LK MP & others : "Making Parliament Effective; A British Experience", *A Report Dhaka*, December, 1994.

Satish kumar : Problem of Federl Politics in Pakistan; Pakistan Society & Politics. *South Asian Studies*, Series-6, Pandab Nayak, New Delhi, South Asian Publishers, Pvt. Ltd, 1984,P-26.

Sabur AKM Abdus : Some Reflections on the Dynamics of Bangladesh India Relations in Iftekharujjaman & Imtiaz Ahmed (ed) *Bangladesh And SAARC Issues Perspective and out look*: Dhaka academic Publishers, 1992, P-150.

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

দৈনিক ইত্তেফাক	ঃ	ঢাকা	১২ই অক্টোবর ,১৯৯০
"	ঃ	"	১৪ই অক্টোবর ,১৯৯৪
"	ঃ	"	৫ই অক্টোবর ,১৯৭৫
"	ঃ	"	১০ই জুন .১৯৯৪
"	ঃ	"	২৫শে মে .১৯৯৪
"	ঃ	"	২০শে নভেম্বর. ১৯৯১
"	ঃ	"	২২ শে ডিসেম্বর. ১৯৯৯
"	ঃ	"	২৯শে জুলাই. ১৯৯৮
"	ঃ	"	১৯শে জুলাই. ১৯৯৩
"	ঃ	"	৬ই ফেব্রুয়ারী. ১৯৯৪
"	ঃ	"	৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫
"	ঃ	"	৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫
"	ঃ	"	২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪
"	ঃ	"	২৩শে নভেম্বর. ১৯৯৪
সংবাদ	ঃ	ঢাকা	৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩
"	ঃ	"	১০ই মে, ১৯৯৫
"	ঃ	"	৩১শে মার্চ, ১৯৯৫
"	ঃ	"	২৩শে ডিসেম্বর. ১৯৯৪
"	ঃ	"	১৩ই এপ্রিল, ১৯৯৬
"	ঃ	"	৪ঠা ফেব্রুয়ারী. ১৯৯৩
"	ঃ	"	১১ই এপ্রিল, ১৯৯৫
"	ঃ	"	১২ই ফেব্রুয়ারী. ১৯৯৪
"	ঃ	"	৫ই জুন, ১৯৯৪
"	ঃ	"	২৫শে ডিসেম্বর. ১৯৯৫
"	ঃ	"	২০শে এপ্রিল. ১৯৯২
"	ঃ	"	৭ই নভেম্বর, ১৯৯৫
"	ঃ	"	১৪ই মে, ১৯৯২
"	ঃ	"	২১শে এপ্রিল, ১৯৯৬
"	ঃ	"	১০ই জুলাই, ১৯৯২
"	ঃ	"	১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯২
"	ঃ	"	৭ই জুলাই, ১৯৯৪
"	ঃ	"	১১ই অক্টোবর, ১৯৯৪
"	ঃ	"	২৮শে জুন, ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

আজকের কাগজ	ঃ	ঢাকা	১২ই মে, ১৯৯১
"	ঃ	"	২১শে মার্চ, ১৯৯৪
"	ঃ	"	২০শে নভেম্বর ,১৯৯১
"	ঃ	"	৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫
"	ঃ	"	২৯শে জুলাই, ১৯৯৩
"	ঃ	"	২৭শে মার্চ, ১৯৯২
"	ঃ	"	৭ই মার্চ, ১৯৯৬
"	ঃ	"	২০শে মার্চ, ১৯৯৪
দৈনিক জনকণ্ঠ	ঃ	ঢাকা	৩রা এপ্রিল, ১৯৯৫
"	ঃ	"	১৬ই এপ্রিল, ১৯৯৬
"	ঃ	"	১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৯৬
"	ঃ	"	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৬
"	ঃ	"	১৩ই এপ্রিল, ১৯৯৬
"	ঃ	"	৩রা এপ্রিল, ১৯৯৫
"	ঃ	"	৯ই এপ্রিল, ১৯৯৬
"	ঃ	"	১৯ই এপ্রিল, ১৯৯৬
"	ঃ	"	৩রা এপ্রিল, ১৯৯৬
"	ঃ	"	৯ই এপ্রিল, ১৯৯৬
"	ঃ	"	২৯শে এপ্রিল, ১৯৯৬
"	ঃ	"	১৯শে এপ্রিল, ১৯৯৬
"	ঃ	"	১৮ই মে, ১৯৯৫
দৈনিক ভোরের কাগজ	ঃ	ঢাকা	১৫ই আগষ্ট, ১৯৯২
"	ঃ	"	৩রা জুলাই, ১৯৯২
"	ঃ	"	২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩
"	ঃ	"	৫ই এপ্রিল, ১৯৯৫
দৈনিক বাংলার বানী	ঃ	"	*৭ই মে, ১৯৯৬*
দৈনিক বাংলা বাজার	ঃ	"	*৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯২*
দৈনিক জনতা	ঃ	"	*৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩*
দৈনিক ভোর	ঃ	"	*২৪শে নভেম্বর, ১৯৯৫*
দৈনিক ইনকিলাব	ঃ	"	*২৫শে এপ্রিল, ১৯৯৪*
"	ঃ	"	*২৯শে জুলাই, ১৯৯৮*
দৈনিক খবর	ঃ	"	*১০শে মে, ১৯৯৬*
দৈনিক খবর	ঃ	"	*৩রা জানুয়ারী, ১৯৯২*

Dhaka University Institutional Repository

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সাপ্তাহিক বিচিত্রা	ঃ	ঢাকা	২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫
"	ঃ	"	৩০শে আগষ্ট, ১৯৯৫
"	ঃ	"	২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫
"	ঃ	"	১লা জানুয়ারী, ১৯৯২
"	ঃ	"	২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬
"	ঃ	"	১লা জানুয়ারী, ১৯৯৬
"	ঃ	"	" ১৯৯৪
সাপ্তাহিক খবরের কাগজ	ঃ	"	৪ঠা জুলাই, ১৯৯৪
সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা	ঃ	"	২০শে জানুয়ারী, ১৯৯৪
যার যার দিন	ঃ	"	২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪
"	ঃ	"	১৪ই জুলাই, ১৯৯৫
সাপ্তাহিক ২০০০	ঃ	"	৬ই আগষ্ট, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

Daily Papers

Daily Star	:	Dhaka	May 15, 1996
''	:	''	January 1, 1993
''	:	''	December 19, 1994
''	:	''	March 20-26, 1996
''	:	''	... 1-3, 2000
''	:	''	December 1, 1996
The Independent	:	''	February 8, 1998
Bangladesh Observer	:	''	February 20, 1979

Weekly Paper and Magazine

Holiday	:	Dhaka	November 23, 1990
''	:	''	December , 1996
''	:	''	January 11, 1997
''	:	''	January 18, 1996
''	:	''	February 15, 1997
Weekly Dhaka Courier	:	''	November 24, 1993
''	:	''	March 13, 1993
Fer Eastrn Economic Review	:	''	October 31, 1992

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ সংশোধনীর পূর্ণ বিবরণ

১২. সংশোধনী, দ্বাদশ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১/২ আশ্বিন, ১৩৯৮

জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১ - এ রাষ্ট্রপতির সম্মতিদানের পক্ষে গণভোটের ফলাফল নির্বাচন কমিশনের ১৮ই সেপ্টেম্বরর,১৯৯১ তারিখে ৪(১) /৯১- নিঃ-১/ গণভোট নং জ্ঞাপন মারফত ঘোষিত হওয়ায় সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের (১গ) (অ) দফাবলে নিম্নোক্ত আইনটি অদ্য ১৮ সেপ্টেম্বেবর, ১৯৯১ (২আশ্বিন, ১৩৯৮) তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন

গণপ্রজাতান্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের (অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন)

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ কল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তনঃ- (১) এই আইন সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের সকল বিধান, ধারা ১৪(খ) এর বিধানসমূহ ব্যতীত, অবিলম্বে বলবৎ হইবে এবং ধারা ১৪(খ) এর বিধানসমূহ ১ চৈত্র ১৩৯৭ মোতাবেক ১৯৯১ সালের ১৬ই মার্চ তারিখে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। সংবিধানের ১১ অনুচেছদের সংশোধনঃ- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের (অতঃপর সংবিধান বলিয়া অভিহিত)- এর ১১ অনুচেছদের "নিশ্চিত হইবে"শব্দগুলির পর "এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হইবে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

সংবিধানের চতুর্থ ভাগের সংশোধন। সংবিধানের চতুর্থ ভাগে ১ম ও ২য় পরিচেছদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১ম, ২য় ও ৩য় পরিচেছদগুলি প্রতিস্থাপতি হইবে, যথাঃ-

Dhaka University Institutional Repository

৪৮। রাষ্ট্রপতিঃ- (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

(২) রাষ্ট্রপ্রধান রূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে- স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদেব (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে,প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শ দান করিয়াছেন কিনা এবং না করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি

(ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন; অথবা

(খ) সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন অথবা

(গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।

(৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে - কোনো বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।

৪৯। ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকারঃ- কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃক পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে -কোন দন্ডের মার্জনা, বিলম্ব ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোনো দন্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রসা করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।

৫০। রাষ্ট্রপতির- পদের মর্যদাঃ- (১) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) একাধিক ক্রমে হউক বা না হউক দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

(৩) স্পীকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার কালে সংসদ- সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না এবং কোন সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

৫১। রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তিঃ- (১) এই সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদের হানি না ঘটাইয়া বিধান করা হইতেছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোন কায় করিয়া থাকিবে বা না করিয়া থাকিলে সেই জন্য তাঁহাকে কোন আদালতে জবাবদিহি করিতে হইবে না, তবে এই দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুন্ন করিবে না।

(২) রাষ্ট্রপতির কার্যভারকালে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকান ফৌজদারি কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাইবে না এবং তাঁহার গ্রেপ্তার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত হইতে পরোয়ানা জারি করা যাইবে না।

৫২। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন- (১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে, ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে, স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহবান করিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃকপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করিতে পারিবেন।

(৩) অভিযোগ বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকিবে।

(৪) অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্য- সংখ্যার অন্যূন দুই- তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া ঘোষনা করিয়া সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

(৫) এই সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদের অনুযায়ী স্পীকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকালে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী এই পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে যে, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় স্পীকারের উল্লেখ ডেপুটি স্পীকারের উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে এবং (৪) দফার রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবার উল্লেখ স্পীকারের পদ শূন্য হইবার উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে এবং (৪) দফায় বর্ণিত কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে বিরত হইবেন।

৫৩। অসামর্থের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণঃ- (১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষর কথিত অসামর্থের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে।

(২) সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে নোটিশ প্রাপ্তি মাত্র স্পীকার সংসদের অধিবেশন আহবান করিবেন এবং একটি চিকিৎসা পর্ষদ (অতঃপর এই অনুচ্ছেদের " পর্ষদ বলিয়া অভিহিত) গঠনের প্রস্তাব আহবান করিবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইবার পর স্পীকার তৎক্ষণাৎ উক্ত নোটিশের একটি প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাঁহার সহিত এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিবেন যে, অনুরূপ অনুরোধ জ্ঞাপনের তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যেন পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হন।

(৩) অপসারণের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদানের পর হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না, এবং অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য পুনরায় সংসদ আহবানের প্রয়োজন হইলে স্পীকার সংসদ আহবান করিবেন।

(৪) প্রস্তাবটি বিবেচিত হইবার কালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি উপস্থিত পর্ষদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত না হইয়া থাকিলে প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইতে পারিবে এবং সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তাহা গৃহীত হইলে প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

(৬) অপসারণের জন্য প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপিত হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকিলে সংসদের নিকট পর্ষদের মতামত পেশ করিবার সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না।

(৭) সংসদ কর্তৃক প্রস্তাবটি ও পর্ষদের রিপোর্ট (যাহা এ অনুচ্ছেদের(২) দফা অনুসারে পরীক্ষিত সাত দিনের মধ্যে দাখিল করা হইবে এবং অনুরূপ ভাবে দাখিল না করা হইলে তাহা বিবেচনার প্রয়োজন হইবে না) বিবেচিত হইবার পর সংসদের মোট সদস্য - সংখ্যার অন্যূন দুই- তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে তাহা গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

৫৪। অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি-পদে স্পীকার।- রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

২য় পরিচ্ছেদ- প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

৫৫। মন্ত্রিসভা- (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।

(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।

(৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ রায় হইবে।

(৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কীরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্টপতি তাহা বিধিসমূহ - দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।

৫৬। মন্ত্রীগণ :- (১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন; সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ- মন্ত্রী থাকিবেন।

(২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ- মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয় -দশমাংশ সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবে এবং অনধিক এক- দশমাংশ সংসদ- সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন।

(৩) যে সংসদ - সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভান বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।

(৪) সংসদ ভাঙ্গিয়া য়াওয়া এবং সংসদ- সদস্যদের অব্যবহিত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে এই অনুচ্ছেদের (২) বা (৩) দফার অধিক নিয়োগ দানের প্রয়োজন দেখা দিলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্বে যাঁহার সংসদ - সদস্য ছিলেন, এই দফার উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তাঁহার সদস্যরূপে বহাল রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫৭। প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদঃ- (১) প্রধানমন্ত্রী পদ শূন্য হইবে, যদি

(ক) তিনি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন; অথবা

(খ) তিনি সংসদ- সদস্য না থাকেন।

(২) সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সর্মথন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন কিংবা সংসদ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য লিখিভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করিবেন এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শ দান করিলে রাষ্ট্রপতি, অন্য কোন সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভান নহেন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাঙ্গিয়া দিবেন।

(৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না।

৫৮। অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদঃ- (১) প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি-

(ক) তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন, তবে ৫৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার শতাংশের অধীনে মনোনীত মন্ত্রীর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না;

(গ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে রাষ্ট্রপতি অনুরূপ নির্দেশ দান করেন; অথবা

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফায় যেরূপ বিধান করা হইয়াছে তাহা কার্যকর হয়।

(২) প্রধানমন্ত্রী যে কোন সময়ে কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত মন্ত্রী অনুরূপ অনুরোধ পালনে অসমর্থ হইতে তিনি রাষ্ট্রপতিকে উক্ত মন্ত্রীর নিয়োগের অবসান ঘটাইবার পরামর্শ দান করিতে পারিবেন।

(৩) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় যে কোন সময়ে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের (১) দফার (ক), (খ) ও (ঘ) উপ- দফার কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না।

(৪) প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে বা স্বীয় পদে বহাল না থাকিলে মন্ত্রীদের প্রত্যেক পদত্যাগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; তবে এই পরিচ্ছেদের বিধানবলী - সাপেক্ষে তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁহার স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন।

(৫) এই অনুচ্ছেদে "মন্ত্রী" বলিতে প্রতিমন্ত্রী ও উপ- মন্ত্রী অন্তর্ভূক্ত।

৩য় পরিচ্ছেদ স্থানীয় শাসন

৫৯। স্থানীয় শাসন।- (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিবে :

(ক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য;

(খ) জন শৃংখলা রক্ষা;

(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

৬০। স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা।- এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদেরঅবিধানাবলীতে পূর্ণ কার্যকরদাতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে বিধানবলীতে পূর্ণ কার্যকরদাতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত উল্লিখিত স্থঅনীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

৪। সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন।- সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২ক) দফায় ''উপ-রাষ্ট্রপতি'' এবং ''উপ-প্রধানমন্ত্রী,'' শব্দগুলি ও কমাগুলি বিলুপ্তি হইবে।

৫। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন- সংবিধানের ৭১০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

''৭০। **পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে আসন শূন্য হওয়া।**- (১) কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে। ব্যাখ্যা।- যদি কোন সংসদ-সদস্য, যে দল তাঁহাকে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত করিয়াছেন, সেই দলের নির্দেশ অমান্য করিয়া-

(ক) সংসদে উপস্থিত থাকিয়া ভোটদানে বিরত থাকেন, অথবা

(খ) সংসদের কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন,

তাহা হইলে, তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) যদি কোন সময় কোন রাজনৈতিক দলের সংসদীয় দলের নেতৃত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে তাহা হইলে সংসদে সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের নেতৃত্বের দাবিদার কোন সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিত হইবার সাত দিনের মধ্যে স্পীকার সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী উক্ত দলের সকল সংসদ সদস্যের সভা আহবান করিয়া বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে দ্বারা উক্ত দলের সংসদীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করিবেন এবঙ সংসদে ভোটদানের ব্যাপারে অনুরূপ নির্ধারিত নেতৃত্বের নির্দেশ যদি কোন সদস্য অমান্য করেন তাহা হইলে তিনি (১) দফার অধীন উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) যদি কোন ব্যক্তি নির্দলীয় প্রার্থীরূপে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার পর কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন, তাহা হইলে তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।''

৬। **সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**- সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদে-

(ক) (১) দফার শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

''তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না ঃ

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন তাঁহার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।''

(খ) (৪ক) দফা বিলুপ্ত হইবে।

৭। **সংবিধানের ৭৩ক অনুচ্ছেদের সংশোধন।**- সংবিধানের ৭৩ অনুচ্ছেদে-

(ক) (১) দফার শেষে ''পারিবেন না'' শব্দগুলির পর ''এবং তিনি কেবল তাঁহার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতে পারিবেন'' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) (২) দফায় ''উপ-প্রধান'' শব্দটি বিলুপ্ত হইবে।

৮। সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদের **সংশোধন।**- সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদের (ককক) দফা বিলুপ্ত হইবে।

৯। **সংবিধানের ৯২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**- সংবিধানের ৯২ অনুচ্ছেদের (২) দফার পর নিম্নরূপ নূতন দফা সংযোজিত হইবে, যথা ঃ

''(৩) এই পরিচ্ছেদের উপরি উক্ত বিধানবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যদি কোন অর্থ বৎসর প্রসঙ্গে সংসদ-

(ক) উক্ত বৎসর আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এই সংবিধানের ৮৯ অনুচ্ছেদের অধীন মঞ্জুরীদান এবং ৯০ অনুচ্ছেদের অধীন আইন গ্রহণে অসমর্থ হইয়া থাকে এবং এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অগ্রিম মঞ্জুরীদান না করিয়া থাকে; অথবা

Dhaka University Institutional Repository

(খ) কোন ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন মেয়াদের জন্য কোন অগ্রিম মঞ্জুরী দেওয়া হইয়া থাকিলে সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে ৮৯ অনুচ্ছেদের অদীন মঞ্জুরীদানে এবং ৯০ অনুচ্ছেদের অধীন আইন গ্রহণে অসমর্থ হইয়া থাকে,

তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে, আদেশের দ্বারা অনুরূপ মঞ্জুরী দান না করা এবং আইন গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত, ঐ বৎসরের অনধিক ষাট দিন মেয়াদ পর্যন্ত উক্ত বৎসরের আর্থিক বিবৃতিতে উল্লিখিত ব্যয় নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হইতে অর্থ প্রত্যাহারের কর্তৃত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।''

১০। সংবিধানের ৯২ক অনুচ্ছেদের বিলোপ।- সংবিধানের ৯২ক অনুচ্ছেদের বিলুপ্তি হইবে।

১১। সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদের সংশোধন।- সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদে ''আদালতের'' শব্দটির পরিবর্তে ''আদালত ও ট্রাইব্যুনালের'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের সংশোধন।- সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের (১) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ

''(১) রাষ্ট্রপতি পদের সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী-

(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

(খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

(গ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং

(ঘ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।''

১৩। সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।- সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদের

(ক) (১) দফায় ''রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি পদের ও'' শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) (৩) দফা বিলুপ্ত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭। সংবিধানের ১৪১ক অনুচ্ছেদের সংশোধন।- সংবিধানের ১৪১ক অনুচ্ছেদের (১) দফার শেষে দাড়ির পরিবর্তে একটি কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথাঃ

''তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ঘোষণার বৈধতার জন্য ঘোষণার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর প্রয়োজন হইবে।''

১৮। সংবিধানের ১৪১গ অনুচ্ছেদের সংশোধন।- সংবিধানের ১৪১গ অনুচ্ছেদের (১) দফায় ''কার্যকরতা কালে রাষ্ট্রপতি'' শব্দগুলির পরিবর্তে ''কার্যকরতা-কালে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

১৯। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।- সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে-

(ক) (১ক) দফায় ৫৬ সংখ্যাটির পূর্বে ''৫৮, ৮০ বা ৯২ক'' কমাগুলি, সংখ্যাগুলি ও শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) (১খ) দফায় ''রাষ্ট্রপতির পদে'' শব্দগুলির পরিবর্তে ''সংসদ'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) (গ) ১গ) দফার পর নিম্নরূপ নূতন (১ঘ) দফা সন্নিবেশিত হইবে, যথা

''(১ঘ) (১গ) দফার কোন কিছুই মন্ত্রিসভা বা সংসদের উপর আস্থা বা অনাস্থা বলিয়া গণ্য হইবে না।''

২০। সংবিধানের ১৪৫ক অনুচ্ছেদের সংশোধন।- সংবিধানের ১৪৫ক অনুচ্ছেদের- শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশটি প্রতিস্থাপিত হইবে যথা ঃ

Dhaka University Institutional Repository

২৪। **সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের সংশোধন।**- সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে,

(ক) ফরম ১ক বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) ফরম ২-এর শিরোনামায়, ''উপ-প্রধানমন্ত্রী'' কমাটি ও শব্দটি বিলুপ্ত হইবে।

২৫। **সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের সংশোধন।**- সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের-

(ক) ২০ অনুচ্ছেদের বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) ২১ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ ২২ অনুচ্ছেদ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ-

''২২। সংবিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (আন নং২৮, ১৯৯১) প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে সংসদ কর্মরত ছিল উহা সংবিধান ও আইন অনুযায়ী যথাযথভাবে নির্বাচিত ও গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী বহাল থাকিবে।''

খোন্দকার আবদুল হক

যুগ্ম-সচিব

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

ত্রয়োদশ সংশোধনীর পূর্ণ বিবরণ

ঢাকা, ২৮শে মার্চ ১৯৯৬/ ১৪ই চৈত্র, ১৪০২

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৮শে মার্চ, ১৯৯৬ (১৪ই চৈত্র, ১৪০২) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

১৯৯৬ সনের ১নং আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ঃ

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**- এই আইন সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংবিধানে নূতন ৫৮ক অনুচ্ছেদের সন্নিবেশ।**- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (অতঃপর সংবিধান বলিয়া উল্লেখিত) এর ৫৮ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নূতন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"৫৮ক। **পরিচ্ছেদের প্রয়োগ।**- এই পরিচ্ছেদের কোন কিছু ৫৫(৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী ব্যতীত, যে মেয়াদে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়া হয় বা ভংগ অবস্থায় থাকে সেই মেয়াদে প্রযুক্ত হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ২ক পরিচ্ছেদে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে ৭২(৪) অনুচ্ছেদের অধীন কোন ভংগ হইয়া যাওয়া সংসদকে পুনরাহ্বান করা হয় সেক্ষেত্রে এই পরিচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে।"

Dhaka University Institutional Repository

৩। সংবিধানে নূতন ২ক পরিচ্ছেদের সন্নিবেশ।- সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নূতন পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"২ক পরিচ্ছেদ-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

৫৮খ। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।-

(১) সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভংগ হইবার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নূতন প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৩) (১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা, ৫৮ঘ (১) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রযুক্ত হইবে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তৎ-কর্তৃক উহা প্রযুক্ত হইবে।

(৪) ৫৫(৪) (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী (প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে) (১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে একইরূপ বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে।

৫৮গ। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন, উপদেষ্টাগণের নিয়োগ দান ইত্যাদি।-

(১) প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হইবে, যাহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা বা ভংগ হয় সেই তারিখ হইতে যে তারিখে প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন সেই তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার অব্যবহিত পূর্বে দায়িত্ব পালনরত প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রিসভা তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সর্বশেষ অবরসপ্রাপ্ত প্রধান বিচাপতির অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচায়পতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৪) যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত ইহয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত অনুরূপ বিচারকের অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৫) যদি আপীল বিভাগের কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি, যতদুর সম্ভব, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে, বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যো্য তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৬) এই পরিচ্ছেদের যাহা কিছু থাকুক না কেন, যদি (৩), (৪) ও (৫) দফাসমূহের বিধানাবলীকে কার্যকর করা না যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই সংবিধানের অধীন তাঁহার স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

(৭) রাষ্ট্রপতি-

(ক) সংসদ-সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য,

(খ) কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত বা অংগীভূত কোন সংগঠনের সদস্য নহেন;

Dhaka University Institutional Repository

(গ) সংসদ-সদস্যের আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী নহেন, এবং প্রার্থী হইবেন না মর্মে লিখিতভাবে সম্মত হইয়াছেন;

(ঘ) বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন

এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৮) রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাগণের নিয়োগদান করিবেন।

(৯) রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা স্বীয় পদত্যাগ করতে পারিবে না।

(১০) প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা এই অনুচ্ছেদের অধীন উক্তরূপ নিয়োগের যোগ্যতা হারাইলে তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন না।

(১১) প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা লাভ করিবেন এবং উপদেষ্টা মন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা লাভ করিবেন।

(১২) নুতন সংসদ গঠন হইবার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাহার পদে কার্য্যভার গ্রহন করেন সেই তারিখে নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হইবে।

৫৮ঘ। নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকারের কার্যবলী।- (১) নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার হিসাবে ইহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগনের সাহায্য ও সহায়তার উক্তরূপ সরকারের দৈন্দিন কার্যবলী সম্পাদানের প্রয়োজন ব্যতীত কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহন করিবেন না।

(২) নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ , সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যগনের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হইবে নির্বাচন কমিশনকে সেই রূপ সকল সম্ভব ও সহায়তা প্রদান করিবেন।

৫৮ঙ। সংবিধানের কতিপয় বিধানের অকার্যকারীতা ।- এই সংবিধানের ৪৮(৩) ১৪১ক(১) এবং ১৪১গ(১) অনুচ্ছেদে যাহাই থাকুক না কেন ,৫৮খ অনুচ্ছেদের (১) দফার মেয়াদে নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বা তাহার প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণান্তে কার্য করার বিধান সমূহ অকার্যাকর হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের সংশোধন।- সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের ,নিয়ন্ত্রিত হইবে । শব্দগুলির পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং যে মেয়াদে ৫৮খ অনুচ্ছেদের অধীনে নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে সেই মেয়াদে উক্ত আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হইবে শব্দ গুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৫) সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের সংশোধন। সংবিধানের ৯৯ অনুচ্ছেদের (১) দফায় আধা -বিচার বিভাগীয় পদ শব্দগুলির পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং যে মেয়াদে ৫৮ অনুচ্ছেদের অধীনে নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে সেই মেয়াদে উক্ত আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হইবে , পরিস্থাপিত হইবে।

(৬) সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন।- সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফায়:-

"(৩) মেয়াদ অবসানের কারনে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারনে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ- সদসাদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

৭। সংবিধানের ১৪৭অনুচ্ছেদের সংশোধন ।-সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদের (৪) দফায়,-

(ক) (খ) উপ-দফার পরিবর্তে নিম্নরুপ উপ-দফা প্রতিস্থাপিত হইবে। , যথা :-

(খ) "প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা :" এবং

(খ) (ঘ) উপ-দফার পরিবর্তে নিম্নরুপ নিম্নরুপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে,যথা-

(ঘ) "মন্ত্রী, উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী।"

৮। সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।-সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের (১) দফায়:-

(ক)"অনুচ্ছেদ" অভিব্যক্তির সংজ্ঞার পর নিম্নরুপ সংজ্ঞা সন্নিবেসিত হইবে। , যথা:-

"উপদেষ্টার" অর্থ ৫৮গ অনুচ্ছেদে অধীনে উক্ত পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ।

(খ) "প্রজাতন্ত্রের মর্ক" অভিবাক্তির সংজ্ঞার পর নিম্নরুপ সংজ্ঞা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"প্রধান উপদেষ্টা" অর্থ ৫৮গ অনুচ্ছেদের অধীনে উক্ত পদে নিযুক্তকোন ব্যক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

''(২) **সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের ফরম ২এর পর নিম্নরূপ ফরম ২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা** :-

''২(ক) প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টাগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা) পাঠ পরিচালিত হইবে :

(ক) পদের শপথ (বা ঘোষণা) :-

''আমি, ---------- সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা (কিংবা উপদেষ্টা) পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব :

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব :

আমি সংবিধানের রক্ষণ সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব; এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ অনুরাগ বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।

(খ) গোপনতার শপথ (বা ঘোষণা) :-

''আমি, -------সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা (কিংবা উপদেষ্টা) রূপে যে সকল বিষয় আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা যে সকল বিষয় আমি অবগত হইব, তাহা প্রধান উপদেষ্টা (কিংবা উপদেষ্টা) রূপে যথাযথ ভাবে আমার কর্তব্য পালনের প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিব না বা কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব না।''

আবুল হাশেম

সচিব